আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস

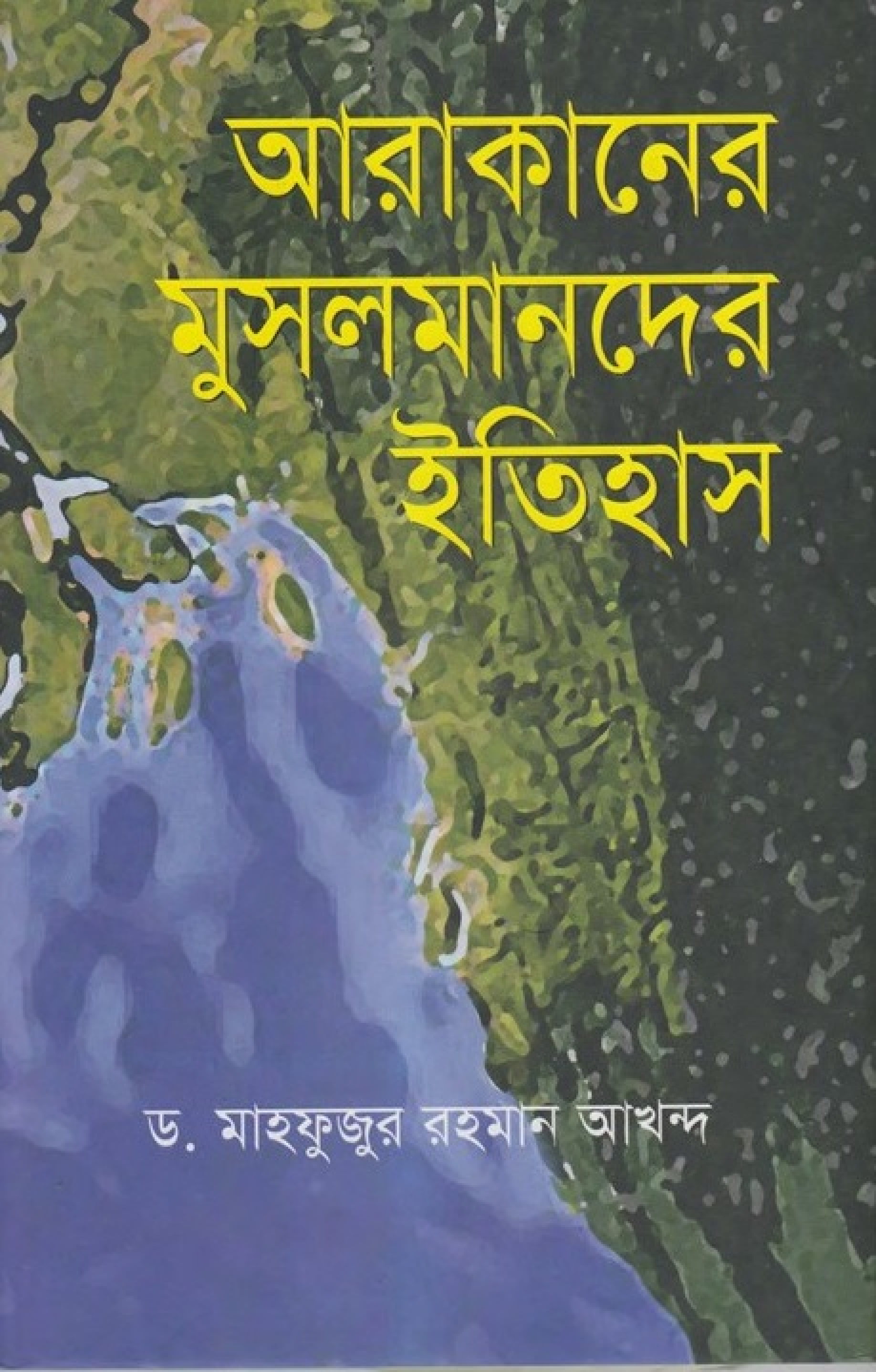

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। ফোন : ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল কার্যালয়
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর -২০১৩

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। পিএবিএক্স : ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

স্বত্ব
ডা. নাজমা আখন্দ

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মেকাপ
মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ

মূল্য ঃ ৩৫০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ARAKANER MUSALMANDER ITIHASH,
Written By Dr. Mahfuzur Rahman Akhanda, Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Niaz Manjil, 922 Jubilee Road, Chittagong and 125, Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000

Price : 350.00 Only. US$. 9.00   ISBN. 984-70241-0064-1

উৎসর্গ

মোজাফফর রহমান আখন্দ

এবং

মর্জিনা বেগম

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা-মা

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁদের হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন, আমীন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর মহাপরাক্রম ও বিপুল প্রতিপত্তি যেরূপ প্রশংসার যোগ্য তার প্রতি তেমন প্রশংসা, যিনি তার অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আমাদেরকে কিঞ্চিত সংগ্রহ করার সুযোগ দান করেছেন। দুরূদ ও সালাম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও আদর্শ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি, যিনি জ্ঞানার্জনকে অত্যাবশ্যকীয় বলে ঘোষণা করেছেন। মাগফিরাত কামনা করছি সে সমস্ত মহান ব্যক্তির জন্য, যাঁরা জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা করে মানব সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। যে সকল মহৎ প্রাণের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় আমি জীবনের এ পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছি. তন্মধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক যথাক্রমে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান এবং প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকীকে প্রথমেই আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের উদার সহযোগিতার ফলেই এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। তাঁদের অপরিসীম স্নেহ, নিরন্তর উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা আমার পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদেরকে শুধু কৃতজ্ঞতা জানালে তা হবে অতি সামান্য; বিশাল হৃদয়ের মহান শিক্ষকদের নিকট আমি চিরঋণী।

এ গ্রন্থ প্রণয়নে আরো যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মরহুম প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী, প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এ বি এম হোসেন, প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, প্রফেসর মিসেস কামরুন রহমান, প্রফেসর মিসেস শামসুন নাহার, প্রফেসর ড. এম.এ বারী, প্রফেসর ড. সুলতান আহমদ, প্রফেসর ড. এ বি এম শাহজাহান, প্রফেসর ড. কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ড. সৈয়দা নুরে কাছেদা খাতুন, প্রফেসর ড. মোঃ আজিজুল হক, প্রফেসর ড. মোঃ ফজলুল হক, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েকউজ্জামান, প্রফেসর ড. মুনসী মু. মুনজুরুল হক, প্রফেসর ড. ইমতিয়াজ আহমেদসহ আমার বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী ও সহকর্মীবৃন্দ। প্রফেসর ড. এম শমসের আলী, প্রফেসর ড. আবুল হাশেম, প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, প্রফেসর ড. এম আবদুল হক, অধ্যাপক আ ফ ম আবদুল ওয়াহেদ, প্রফেসর ড. এস এম আব্দুছ ছালাম, প্রফেসর ড. এ কে এম আবদুল লতিফ, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রফেসর ড. এম. নিজাম উদ্দিন, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবদুল হান্নানসহ নাম না বলা শিক্ষকমণ্ডলীর সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবো।

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহসান, প্রফেসর ইমেরিটাস মরহুম ড. আবদুল করিম, প্রফেসর ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, প্রফেসর ড. মঈন উদ্দীন আহমদ খান, প্রফেসর ড. আতাহার আলী, মরহুম প্রফেসর ড. আলী আহমদ, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, প্রফেসর ড. আখতারুজ্জামান, প্রফেসর আতাউর রহমান বিশ্বাস, মরহুম কবি মতিউর রহমান মল্লিক প্রমুখ গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান উপদেশ ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেছেন। সেইসাথে চট্টগ্রামের জনাব আশরাফ আলম এবং জনাব নূর কামাল গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও আরাকানী বইপত্র দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমি এঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা বন্ধনে আবদ্ধ। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আমার শিক্ষা জীবনের সকল স্তরের সম্মানিত শিক্ষকদের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। বন্ধুবর ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, ড. আবু নোমান মোঃ আসাদুল্লাহ, খাজা মোঃ জিয়াউল হক, ড. হারুন অর রশিদ সরকার, ড. আবুল কালাম আজাদ, শাহজাহান কবির, আবু সাহেদ, মোঃ আবদুল বারী, ড. সৈয়দ মোহাম্মদ হাদিউজ্জামান প্রমুখকে ধন্যবাদের সাথে স্মরণ করছি।

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা মো. মোজাফফর রহমান আখন্দ ও আম্মা মোছা. মর্জিনা বেগম, শ্বশুর মরহুম আলহাজ আকবর আলী সরকার ও শাশুড়ী রেজিয়া বেগম, বড় ভাই মো. মোস্তাফিজুর রহমান আখন্দ, ভায়রা ভাই রফিকুল ইসলাম বিশ্বাস, ড. মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান চৌধুরী এবং জনাব মোহাম্মদ মজিবুর রহমান; এঁদের আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। সর্বোপরি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী ডা. নাজমা আখন্দ এ গবেষণাকর্মের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে যে ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রদান করেছে এবং উৎসাহ যুগিয়েছে তা সত্যিই ভুলবার নয়। আমার ছোটবোন মাফরুহা সুলতানা ও মোরশেদা ছিদ্দীকা, ভগ্নীপতি ড. গোলাম কিবরিয়া ফেরদৌস এবং সৈয়দ মোস্তফা শহীদ জামান এবং প্রাণের স্পন্দন মুনতাসির মুবিন নাশিত, মুসাদ্দিক মুবিন নাবিল, ও মিশকাতুল মুযাইয়্যেনা নাজিফাসহ পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাই। ইনস্টিটিউট অব আরাকান স্টাডিজ কর্তৃপক্ষ আমাকে ফেলোশীপ প্রদান করায় আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের এ সহযোগিতার ফলেই গবেষণা কর্মটি যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণাকর্মের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি বিশেষভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ গ্রন্থাগার, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর গ্রন্থাগার, ঢাকাস্থ বীজ (BIISS) লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইবস এন্ড লাইব্রেরী, প্রেস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ লাইব্রেরী; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় গ্রন্থাগার; কলকাতাস্থ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ন্যাশনাল আর্কাইবস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীসহ কলকাতাস্থ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠাগার ব্যবহার

করেছি। প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট সকলেই আমাকে উপাত্ত সংগ্রহে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং ঋণী। বিশেষকরে কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান শেখ মজহারুল ইসলাম, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এর সিরিয়াল সেকশনের ইনচার্জ গায়ত্রী ঘোষ এবং কথাসাহিত্যিক মরহুম সৈয়দ মোস্তাফা সিরাজের সহযোগিতার কথা আজীবন স্মরণ রাখবো। পরিশেষে গ্রন্থটি যত্নসহকারে প্রকাশ করায় বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ আমাদের এ শ্রমকে কবুল করুন! আমিন!!

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

সেপ্টেম্বর - ২০১৩

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চল আরাকান। এটি বর্তমানে মিয়ানমারের রাখাইন স্টেট নামে পরিচিত একটি প্রদেশ। খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর ধরে এর স্বাধীন সত্তা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা, রাজনৈতিক ঐতিহ্য ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এর উত্তরে চীন ও ভারত, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তর ও পশ্চিমে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তবর্তী নাফ নদীর মধ্যসীমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম। যোগাযোগের সুবিধা ও ঐতিহ্যগত দিকদিয়ে মিয়ানমারের চেয়ে চট্টগ্রামই আরাকানের কাছাকাছি ও বন্ধুপ্রতীম অঞ্চল। প্রতিবেশী বাংলার সহায়তায় বিভিন্ন সময় এখানকার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে মিয়ানমার থেকে একটি অভিনব এবং স্বতন্ত্র অধ্যায় বিনির্মাণে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষকরে ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা নরমিখলা বার্মার রাজা মেঙ শো ওয়াই কর্তৃক স্বীয় পিতৃরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ চব্বিশ বছর বাংলায় অবস্থানের পর ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আরাকান পুনরুদ্ধার করেন। সেসময় আরাকানের তুলনায় বাংলার মুসলমানদের জীবনবোধ ও সংস্কৃতির মান উন্নততর ছিল বিধায় নরমিখলা স্বয়ং মুহাম্মদ সোলায়মান শাহ উপাধী ধারণ করে বাংলার মুসলমানদের অনুকরণে আরাকানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিবিধান চালু করেন। বাংলার অনুকরণে শাসকদের মুসলিম নাম গ্রহণ, অশ্লীলতা ও সুরামুক্ত রাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান পালন, বিচারব্যবস্থা কার্যকর করতে কাজী ও জল্লাদ প্রথার প্রচলনসহ মুসলিম রীতিনীতির বিভিন্ন অনুশাসনের প্রচলন করা হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম অমাত্যবর্গের অনন্য ভূমিকা ছাড়াও তাঁদের আর একটি বড় অবদান হলো, তাঁরা মুসলিম কবি সাহিত্যিকদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিমূল শক্ত করেছিলেন। মূলত খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলিম প্রভাবিত আরাকান অমাত্যসভায় মুসলমান কবিদের হাতেই বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্টি অর্জন করেছিল, যার ফলাফল বহুমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

আরাকান অঞ্চল হিন্দু-মুসলিম ও বৌদ্ধ জাতিগোষ্ঠীর মিলন কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হলেও ইসলাম তাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, এ বিচিত্র সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত হয়েও তারা সব রকমের দ্বন্দ্ব-কলহ ও জাতি বৈরিতাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতাউত্তর মিয়ানমারে বিশেষত বর্তমান সামরিক সরকার ইসলামের সেই ইতিহাস-ঐতিহ্য মুছে ফেলে মুসলিম জাতিসত্তাকে সমূলে বিনষ্ট করার

নিমিত্তে সার্বজনীন মানবাধিকারের প্রতি তোয়াক্কা না করে মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। ফলে মুসলমানরা তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে এবং বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমসমূহে রোহিঙ্গা নির্যাতন ও বাংলাদেশে অভিবাসনের খবরা-খবর প্রকাশিত হতে থাকে। বর্তমানে রোহিঙ্গা সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

আরাকানের মুসলমানদের নিয়ে দেশে বিদেশে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও এটি একটি ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতিসমৃদ্ধ ঐতিহ্যকেন্দ্রিক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। গবেষক ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ তাঁর অনুসন্ধিৎসু গবেষণার দ্বারা 'আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস' গ্রন্থটি রচনার মাধ্যমে আরাকানের মৌলিক ইতিহাস উপস্থাপনের চূড়ান্ত প্রয়াস চালিয়েছেন- এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে সহায়ক হবে। গবেষক এবং সুধী পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হলে আমাদের এ প্রচেষ্টা সফল হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন এবং আরাকানী মুসলমানদের নিজস্ব ভিটেমাটিতে নিরাপদে রাখুন; আমীন।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

শব্দ সংক্ষেপ

BSPP	=	Burma Socialist Program Party
BSR	=	Bangladesh Secretariat Records
CD	=	Chittagong District
JASB	=	Journal of the Asiatic Society of Bangladesh
JASP	=	Journal of the Asiatic Society of Pakistan
JBRS	=	Journal of the Burma Research Society
MS	=	Myanmar Section
MSKC	=	Mohammad Siddiquee Khan Collections
NDLHR	=	National Democracy League for Human Rights
NGO	=	Non Government Organization
NLD	=	National League for Democracy
NRC	=	National Registration Card
PC	=	Political Consultations
PP	=	Political Proceedings
SC	=	Secret Consultations
SEA	=	South-East Asia
UNHCR	=	United Nations High Commissioner for Refuges
WFP	=	World Food Program

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা	১৩
প্রাসঙ্গিক রচনাবলী পর্যালোচনা	১৬
গবেষণা পদ্ধতি	২০
অধ্যায় ১: আরাকান ও মুসলমান : সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	**২২-৮৭**
১.১ আরাকান পরিচিতি	২২
১.২ ইসলামপূর্ব আরাকান	২৮
১.৩ আরাকান ও ইসলাম	৩৩
১.৩.১ আরাকানে ইসলামের আগমন	৩৪
১.৩.২ ম্রাউক-উ রাজবংশ থেকে বর্তমান আরাকান	৩৭
অধ্যায় ২ : আরাকানী প্রশাসন ও মুসলিম সভাসদ	**৮৮-১৪১**
২.১ আরাকানী প্রশাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৮৮
২.২ আরাকান রাজসভায় মুসলিম অমাত্য	১১০
২.২.১ বুরহান উদ্দীন	১১০
২.২.২ আশরাফ খান	১১৩
২.২.৩ বড় ঠাকুর	১১৯
২.২.৪ কোরেশী-মাগন ঠাকুর	১২১
২.২.৫ সোলায়মান	১২৭
২.২.৬ অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ	১২৯
২.৩ বিচারব্যবস্থায় ইসলাম ও মুসলিম কাজী	১৩১
অধ্যায় ৩ : আরাকানী সমাজে মুসলমান	**১৫২-১৭৪**
৩.১ ইসলামপূর্ব আরাকানের সমাজ ব্যবস্থা	১৪২
৩.২ আরাকানী সমাজ ও ইসলাম : প্রাথমিক পর্ব	১৪৪
৩.৩ আরাকানী সমাজে মুসলমানদের গোত্রগত শ্রেণী বিন্যাস	১৪৫
৩.৩.১ থাম্ভইক্যা	১৪৬
৩.৩.২ জেরবাদী	১৪৮
৩.৩.৩ কামানচি	১৪৯
৩.৩.৪ রোহিঙ্গা	১৫২

৩.৪ আরাকানী মুসলমানদের অবস্থানগত বিন্যাস	১৫৮
৩.৪.১ অমাত্য শ্রেণী	১৫৯
৩.৪.২ উলামা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী	১৫৯
৩.৪.৩ সেনা ও সাধারণ শ্রেণী	১৬২
৩.৪.৪ বণিক ও ভূস্বামী	১৬২
৩.৪.৫ ক্রীতদাস ও সাধারণ শ্রেণী	১৬৩
৩.৫ আরাকানী মুসলমানদের সামাজিক উৎসব ও লোকাচার	১৬৫
৩.৫.১ নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত ঃ দ্বীনি অনুষ্ঠান	১৬৫
৩.৫.২ পার্বণিক উৎসব	১৬৬
৩.৫.৩ জন্ম, বিয়ে ও মৃত্যুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান	১৬৮
অধ্যায় ৪ : আরাকানের বাংলা সাহিত্যে ইসলামি উপাদান	**১৭৫-২১০**
৪.১ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও অমাত্যসভার পৃষ্ঠপোষকতা	১৭৫
৪.১.১ বাংলা সাহিত্যের কাল বিভাজন	১৭৬
৪.১.২ মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা	১৭৭
৪.১.৩ আরাকানে বাংলা সাহিত্য বিকাশের কারণ নির্ণয়	১৭৯
৪.২ আরাকানে বাংলা সাহিত্য চর্চা : ইসলামি উপাদান	১৮২
৪.২.১ দৌলতকাজী	১৮৩
৪.২.২ আলাওল	১৮৭
৪.২.২.১ পদ্মাবতী	১৮৮
৪.২.২.২ সতী ময়না-লোর চন্দ্রানী	১৯১
৪.২.২.৩ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল	১৯২
৪.২.২.৪ সপ্তপয়কর	১৯৩
৪.২.২.৫ তোহফা	১৯৪
৪.২.২.৬ সিকান্দরনামা	১৯৭
৪.২.৩ কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর	১৯৯
৪.২.৪ কবি মরদন	২০০
৪.২.৫ আরাকান অমাত্য সভার প্রভাবিত কবি	২১০
অধ্যায় ৫ : আরাকানের শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে মুসলিম প্রভাব	**২১১-২২৮**
৫.১ আরাকানের শিল্পকলা ও সংস্কৃতি : সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	২১১
৫.২ আরাকানে মুসলিম সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশ	২১৫
অধ্যায় ৬ : আরাকানে মুসলিম অমুসলিম সাংস্কৃতিক বিনিময়	**২২৯-২৪২**
৬.১ মুসলিম সংস্কৃতি ও আরাকানী অমুসলিম সম্প্রদায়	২২৯
৬.১.১ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	২৩০
৬.১.২ উন্নত রান্না পদ্ধতি	২৩০

৬.১.৩ সতীত্ববোধ ও পর্দা প্রথা ২৩১
৬.১.৪ পোষাক পদ্ধতি ২৩৩
৬.১.৫ বর্ণবৈষম্য লাঘব ২৩৪
৬.১.৬ দরবারী সংস্কৃতি ২৩৪
৬.২ মুসলিম সমাজে অমুসলিম সংস্কৃতি ২৩৫
৬.২.১ সামাজিক রীতিনীতি ২৩৬
৬.২.২ ধর্মীয় বিশ্বাস ও পূজা-পার্বণ ২৩৭
৬.৩ মুসলমানদের মধ্যে অমুসলিম সংস্কৃতি প্রবেশের কারণ ২৩৮

অধ্যায় ৭ : আরাকানী মুসলিম ইতিহাসের সার্বিক মূল্যায়ন ২৪৩-২৫৩

পরিশিষ্ট ২৫৪-২৬০

গ্রন্থপঞ্জি ২৬২-২৮০

উপক্রমণিকা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বার্মা বা মিয়ানমারের অন্তর্গত বর্তমানে 'রাখাইন স্টেট' নামে পরিচিত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী একটি রাজ্যের নাম আরাকান। খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর যাবৎ মোটামুটিভাবে এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বর্মীরাজ বোধপায়া (১৭৮২-১৮১১ খ্রি.) সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে আরাকানের শেষ রাজা থামাডাকে পরাজিত ও নিহত করে আরাকানকে বার্মার অন্তর্ভুক্ত করার পর থেকে অদ্যাবধি আরাকান সেখানকার প্রদেশ হিসেবে রয়েছে। আরাকানের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ ইসলামের অনুসারী; এদের মধ্যে থাম্ভইক্য জেরবাদী, কামানচি, রোহিঙ্গা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। উত্তর আরাকান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চন্দ্র বংশীয় রাজা মহৎ-ইঙ্গ-চন্দ্রের (৭৮৮-৮১০ খ্রি.) রাজত্বকালে আরব মুসলিম বণিকগণ নৌবহর নিয়ে আরাকানের আকিয়াবসহ দক্ষিণ-পূর্ব চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত ব্যবসায় বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচারের জন্য চলে আসে। এ সময় একটি আরব বাণিজ্যবহর রাহাম্বী দ্বীপের পাশে বিধ্বস্ত হয় এবং স্থানীয় জনগণ তাদের উদ্ধার করে। আরাকানরাজ বিপদগ্রস্তদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত আচরণ লক্ষ্য করে সেখানেই বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন।

দশম ও একাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম বণিকদের পাশাপাশি বদরুদ্দিনসহ (বদর শাহ) আউলিয়া-ই-কিরাম ইসলাম প্রচারের জন্য আরাকানে আসেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের ঔদার্য ও মহানুভবতা প্রচার করেন। এ সময়ে আরাকানে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং মুসলমানরা সেখানে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এছাড়াও জাহাজ মেরামত করার জন্য কিংবা মৌসুমী বায়ুর অপেক্ষায় ছয় মাসের অধিককাল মুসলিম বণিকদের এখানে অবস্থান করতে হতো। দূরবর্তী বাণিজ্যযাত্রায় তারা স্ত্রীদের সাথে আনতো না। পক্ষান্তরে ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে অবৈধভাবে যৌন প্রয়োজন মিটানোও সম্ভব ছিল না বলে তারা স্থানীয় মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো। স্বদেশে ফিরে যাবার সময় তৎকালীন বর্মী আইনে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বিধায় মুসলমান বণিকগণ এখানেই দ্বিতীয় আবাস হিসেবে বসতি স্থাপন করত এবং এ সূত্রে অনেকেই স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলতো। ফলে মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে সময় ইসলামের জীবন পদ্ধতি এতটা জনপ্রিয় ছিল যে, মুসলমানরা বাণিজ্য বিস্তারের

পাশাপাশি ইসলামের সুমহান ঔদার্য দ্বারা রাজশক্তি ব্যতীত বর্মী জনগোষ্ঠীর প্রায় সকল স্তরকেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে চন্দ্র-সূর্য বংশের রাজা অযুথুর পুত্র নরমিখলা স্বীয় চাচাকে উৎখাতের মাধ্যমে আরাকানের ক্ষমতা দখল করে। অতঃপর ক্ষমতাচ্যুত আরাকান রাজার আমন্ত্রণে বার্মার রাজা মেং শো আই (Meng Show Wai 1401-22) ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করলে নরমিখলা প্রাণ ভয়ে গৌড়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন। তিনি দীর্ঘ ২৪ বছর বাংলার শাসকের আশ্রয়ে থেকে ইসলামের সুমহান আদর্শ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সহযোগিতায় নরমিখলা (১৪৩০-১৪৩৪ খ্রি:) পিতৃভূমি উদ্ধারের পর লঙ্গিয়েত থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে লেম্রু নদীর তীরে ম্রোহং নামক শহরে স্থাপন পূর্বক রাজ্য শাসন করতে থাকেন। বাংলা থেকে আগত প্রায় ৫০ হাজার গৌড়ীয় সৈন্য আর স্বদেশে ফিরে না গিয়ে আরাকানেই স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে।

নরমিখলা প্রথমত স্বীয় রাজধানী সুরক্ষিত করার মানসে তার রাজধানীর পূর্ব-দক্ষিণে সেনা ছাউনি তৈরী করে সৈনিকদের অনেককেই পুনর্বাসন করেন এবং গৌড়ীয় স্থাপত্যরীতিতে সন্দিকান বা সিন্ধিখান মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে তাদের বংশ বিস্তারের ফলে সেখানে মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল। এ সব এলাকায় সাতটি পাকা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান।

সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার পর নরমিখলা চার বছর (১৪৩০-১৪৩৪ খ্রি.) রাজত্ব করেন। এ সময় থেকে আরাকানরাজ নরমিখলা বাংলার সুলতানদের মত তাঁদের মুদ্রার এক পীঠে ফারসি অক্ষরে কালেমা ও মুসলমানি নাম লেখার রীতি চালু করেন। তাঁর পরবর্তী রাজাগণ বাংলার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েও মুদ্রার এক পীঠে ফারসি অক্ষরে কালেমা ও বৌদ্ধ নামের সঙ্গে মুসলমানি নাম ব্যবহার করতেন।. ১৪৩০-১৬৪৫ সাল পর্যন্ত দু'শো পনের বছর যাবৎ স্বাধীন আরাকানের রাজাগণ তাঁদের মুদ্রায় মুসলমানি নাম ব্যবহার করলেও এ দীর্ঘ সময় বাংলার মুসলমান শাসকদের সাথে তাদের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। অথচ তারা দেশে মুসলমানি রীতিনীতি ও আচার পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে মেনে চলছিল। কারণ আরাকানের রাজাগণ তাঁদের নিজস্ব সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার ব্যবহারের চেয়ে মুসলমানদের সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার ব্যবহারকে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত বলে মনে করতো। বাংলার মুসলমান রাজশক্তির সাথে তাঁদের বিরোধ থাকলেও মুসলমান জাতির প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ ছিল না। তাই তাঁদের সৈন্যবিভাগের প্রধান সেনাপতি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক বিশিষ্ট বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পদ পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

ম্রাউক-উ-রাজবংশের রাজাগণ ১৪৩০-১৭৮৪ খ্রি. পর্যন্ত ৩৫৫ বছরকাল আরাকানে রাজত্ব করেন। এ রাজবংশ ছিল আরাকানের জন্য বিশেষত আরাকানী মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ম্রাউক-উ-রাজবংশ বিশেষ

করে ১৪৩০ থেকে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ অবধি দু'শো চুয়ান্ন বছর শাসনামলে শাসকদের যেমন ছিল বিজ্ঞতা, তেমনি ছিল ইসলাম প্রিয়তা। তাঁরা বাঙালী, আরবীয়, ইরানী, কিংবা আরাকানী মুসলমানদেরকে প্রধানমন্ত্রী, সৈন্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, কাজী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দান করে রাজ্যের উন্নতি বিধানে তৎপর ছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতি, সমরনীতি, দরবারের আদব কায়দা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলামি রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হতো। তাছাড়া তৎকালীন আরাকানী জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনেও ইসলামি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেখানে যে পর্দা প্রথার প্রচলন শুরু হয় তা খাঁটি আরব মুসলমানদের সংশ্রবের ফল। প্রাচীনকাল থেকেই আরব মুসলমান বণিকেরা নৌ-বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তাঁদের সহযোগিতায় আরাকানের মুসলমানরাও নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। এ এলাকার বিভিন্ন স্থানের আরবি নাম, কাব্যে আরবি ভাষার প্রয়োগ এ সবই ইসলামি প্রভাবজনিত।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম অমাত্যবর্গের অনন্য ভূমিকা ছাড়াও তাঁদের আর একটি বড় অবদান হলো, তাঁরা মুসলিম কবি সাহিত্যিকদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিমূল শক্ত করেছিলেন। মূলত খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলিম প্রভাবিত আরাকান অমাত্যসভায় মুসলমান কবিদের হাতেই বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্টি অর্জন করেছিল, যার ফলাফল বহুমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। প্রাচীন যুগের হিন্দু কবিরা সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আরাকান রাজদরবারে আশ্রিত মুসলমান কবিরা কেবল সংস্কৃত নয়- হিন্দি, আরবি, ফারসি প্রভৃতি উন্নত ভাষা-সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করেন, তেমনি তাঁরা নিজস্ব বিশ্বাস ও চেতনার উপর ভিত্তি করে পুঁথি সাহিত্য রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষার ভিত্তিকেও মজবুত করেছেন। তাঁরাই বাংলা সাহিত্যে মানবীয় প্রেমকে কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে কল্পনা করে সাহিত্য রচনার পথিকৃত। আরাকানের মুসলিম কবিগণ বাংলা সাহিত্যকে বিষয় বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ করে ভারতীয় উন্নততর হিন্দি ভাষার সাথে যুক্ত করে এবং নানা বৈচিত্রপূর্ণ ও সুমধুর ফারসি সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে নানাভাবে সম্প্রসারিত করেছেন। আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয় তার তুলনা আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত কবিরা যেমন ছিলেন ধার্মিক মুসলমান, তেমনি তাঁদের পৃষ্ঠপোষক, আশ্রয়দাতা ও আদেশদাতারাও (রাজার অমাত্যবর্গ) ছিলেন একই পথের পথিক। তাঁদের কার্যরীতির ভাষা ছিল আরবি ও ফারসি।

ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ অত্যন্ত প্রগাঢ়। তাই লক্ষ্য করা যায় যে, আরাকান অঞ্চল হিন্দু-মুসলিম ও বৌদ্ধ জাতিগোষ্ঠীর মিলন কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হলেও ইসলাম তাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, এ বিচিত্র সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় লালিত হয়েও তারা সব রকমের দ্বন্দ্ব-কলহ ও জাতি বৈরিতাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিল। মূলত ইসলামের শান্তির বাণীই তাদের এ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। ফলে আরাকানের মুসলিম

কবিগোষ্ঠীর কাব্যাদর্শ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। কিন্তু আরাকান রাজ্যের বিশৃংখলা ও মুসলমানদের ক্ষমতা হ্রাসের কারণে সপ্তদশ শতাব্দী শেষ না হতেই আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা কমে যায়।

মোগল সম্রাট শাহজাহানের (শাসনকাল ১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.) চার পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে বাংলার মোগল সুবেদার শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা (সুবেদারী আমল ১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি.) স্বীয় ভ্রাতা ও দাক্ষিণাত্যের সুবেদার শাহজাদা আওরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হয়ে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগষ্ট আরাকানের রাজধানী ম্রোহংয়ে পলায়ন করে আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মার দরবারে আশ্রয় নেন এবং এক পর্যায়ে সেখানেই সপরিবারে নিহত হন। তাঁর অনুচরবর্গ আরাকানেই থেকে যায়। সম্রাট আওরঙ্গজেব (শাসনকাল ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানকে (১৬৬৪-১৬৭৮; ১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রি.) নির্দেশ দেন। তিনি ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকানী বাহিনী ও মগ জলদস্যুদের পরাজিত করে সমগ্র চট্টগ্রাম দখল করেন। অতঃপর ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ সান্দা থু ধম্মার মৃত্যুর পর থেকে ক্রমশ আরাকানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বিশেষত ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে সান্দা উইজ্যা আরাকানের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সামান্তদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে আরাকানরাজ ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজ্যের স্থিতিশীলতাও বিনষ্ট হতে থাকে। সামন্তদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজ্যে স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবার সুযোগে বর্মীরাজ বোধপায়া (১৭৮২-১৮১১ খ্রি.) ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকান দখল করে। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের পর আরাকান ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে এলে সেখানে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে এবং আরাকান থেকে বাংলায় পালিয়ে আসা আরাকানীদের অধিকাংশই পুনরায় স্বদেশে ফিরে যায়।

এছাড়া ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বৃটিশ শাসনামলে আরাকান ও বার্মা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে এলে বাংলা এবং ভারতের অনেক মুসলমান ব্যবসা ও চাকরির উদ্দেশ্যে আকিয়াব ও রেঙ্গুনসহ বিভিন্ন শহরে গমন করে। অধিকাংশ লোক কাজ শেষে স্বদেশে ফিরলেও কেউ কেউ সেখানেই স্থায়ী আবাসন গড়ে বসবাস করতে থাকে। এভাবে অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে সময়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে আরাকানে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে এবং ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ অবধি এটি পুরোপুরিভাবে মুসলিম প্রভাবিত এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

প্রাসঙ্গিক রচনাবলী পর্যালোচনা

আরাকানে মুসলমানদের জীবন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে বাংলা, ইংরেজি এবং উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভ প্রণীত হয়েছে। স্বল্প পরিসরে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে তার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হলো-

ইংরেজি ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভসমূহ

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক Abdul Karim এর *The Rohingyas : A Short Account of Their Histroy and Culture*[১] গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রচনা। এ গ্রন্থে আরাকানে মুসলমানদের আগমন, রোহিঙ্গাদের ইতিহাস, আরাকানের রাজদরবারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তাদের বিবরণ, আরাকান অমাত্যসভায় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তুলে ধরার মাধ্যমে তৎকালীন আরাকানের সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থটি ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রণীত হলেও এটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এতে কাল বিভাজনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই।

Moshe Yegar এর *The Muslims of Burma : A Study of Minority Groups*[২] গ্রন্থটি বার্মার মুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনায় একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক রচনা। এতে বার্মাসহ আরাকানে মুসলমানদের আগমন, আরাকান রাজদরবারে মুসলিম প্রভাব ও স্বাধীনতা উত্তর বর্মী শাসক কর্তৃক মুসলিম নির্যাতনের খণ্ডিত চিত্রও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে গোটা বার্মার মুসলমানদের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে আরাকান ও মুসলমানদের ইতিহাস খুব কিঞ্চিতই বর্ণিত হয়েছে; ফলে এ গ্রন্থ পাঠে আরাকানে ইসলামের প্রভাব স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া সম্ভব হয়না। Mohammed Yunus এর *A History of Arakan : Past & Present*[৩] গ্রন্থে আরাকান ও মুসলমান বিশেষত রোহিঙ্গা মুসলমানদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আরাকান রাজদরবারে মুসলিম প্রভাবসহ বার্মা কর্তৃক আরাকান দখল এবং আরাকানের সামরিক শাসনের খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখার প্রয়াস চালানো হলেও ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি মোতাবেক প্রণীত হয়নি। তবে আরাকানের মুসলমানদের কেন্দ্র করে প্রণীত গ্রন্থের স্বল্পতায় এ বইটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার। তাছাড়া আরাকান ও বার্মার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র, মুদ্রা, শিলালিপি ও মসজিদের ছবি সংযোজন করায় গ্রন্থটির মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভের মধ্যে A.S. Bahar এর The Arakani Rohingyas in Burmese Society[৪] অন্যতম। এ অভিসন্দর্ভে রোহিঙ্গা মুসলমানদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সামাজিক মর্যাদা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা, বৃটিশ শাসনামলে রোহিঙ্গা মুসলমানদের অবস্থা, বর্মী ও রোহিঙ্গা সম্পর্কের মেরু বৈপরীত্য এবং বর্মী শাসক কর্তৃক মুসলমানদের উপর নির্যাতনের খণ্ডচিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে চিত্রিত করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতিতে প্রণীত এ অভিসন্দর্ভে আরাকানে ইসলামের প্রভাবকে কেন্দ্র করে কোন আলোচনা করা হয়নি।

বাংলা ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভসমূহ

কাব্যসাহিত্য হলেও সমসাময়িক রচনাবলী হিসেবে আলাউল বিরচিত *তোহফা*[৫] ও নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়তনামা*[৬] মধ্যযুগের সমসাময়িক আরাকানী মুসলমানদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের একটি আকর উৎস। এ দুটো

কাব্যের মাধ্যমে ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আরাকানী মুসলমানদের সামাজিক আচার আচরণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং ধর্মীয় অনুভূতি, স্বচ্ছতা ও কুসংস্কার প্রথা সম্পর্কে অতীব মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। পাঠোদ্ধারকালীন কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও এ গ্রন্থদ্বয় ইতিহাস গবেষণার সমসাময়িক তথা প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য,*[৭] গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে পদ্ধতিগত গবেষণার সুবলয়িত রূপ তৈরীর পূর্বে রচিত হলেও এর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা অত্যন্ত প্রশংসার দাবীদার। সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থখানিতে শুধু আরাকানের অজ্ঞাত কবিপরিচয়ই নয় বরং সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানী মুসলিম সমাজের পরিচয় ফুটে উঠেছে। এ গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সেখানকার রাজা ও রাজ অমাত্যদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। অতঃপর কবি দৌলতকাজী, আলাওল, মাগনঠাকুর প্রমুখের ব্যক্তি ও কবি পরিচয়সহ কাব্য সাধনার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সকল কবিদের কাব্যে দেশের ধর্ম, সমাজ ও পরিবেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকারদ্বয় বলেন, "১৬২২ হইতে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্র বাষট্টি বৎসরের মধ্যে রোসাঙ্গ রাজসভার বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের যে সর্বতোমুখীবিকাশ সাধিত হয় তাহার তুলনা বাঙালা ভাষার আপন গৃহে মিলে না।" আরাকান অমাত্যসভায় বাংলা সাহিত্য যে নতুন আদর্শ ও চেতনার জন্ম দেয় তার প্রভাবও হয়ে উঠেছিল বৈদ্যুতিক শক্তির মতই। কবি মরদন, শমসের আলী, মোহাম্মদ খান, মোহাম্মদ রাজা, আবদুল হাকীম প্রমুখ কবির কাব্যে এর আশু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে গ্রন্থখানি আবেগ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কবি দৌলতকাজী ও আলাওল আরাকানরাজ পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেখানকার মুসলিম মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ। সুতরাং আরাকান রাজসভায় নয় বরং আরাকান অমাত্যসভায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়েছে। সর্বোপরি এ গ্রন্থে আরাকানের রচিত বাংলা কাব্য থেকে মুসলমানদের সমকালীন জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরার ফলে গ্রন্থখানি গবেষণা উপাত্তের একটি মূল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

অমৃতলাল বালার *আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি*[৮] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। এটি ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতিতে প্রণীত একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাস গ্রন্থ। এতে মহাকবি আলাওলের কাব্য-কবিতা, মূল অনুবাদের তুলনা, জীবনপঞ্জি, কাব্য রচনার সময়কাল ও কবি কৃতিত্বের আলোচনাকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে মূলত আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। তদানিন্তন ইতিহাসের পটভূমিকায় আরাকানের সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরাকানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনুকূলে ইসলামের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে কবি আলাওলের কাব্য থেকে সে বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আলাওলের

সামগ্রিক সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব ও ঐক্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে কবির সামগ্রিক সাহিত্য-কর্মের বিচার বিশ্লেষণের বিভাজন দৈশিক, ভৌগোলিক ও বিষয়ভিত্তিক হলেও কালানুক্রমিক নয়। এটি বাংলা সাহিত্যের গবেষণাগ্রন্থ হলেও তৎকালীন আরাকানের সমাজ-সংস্কৃতির উন্মেষ, বিবর্তন প্রভৃতির বিবরণ দেয়ার জন্য ইতিহসের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বিধায় এটি আরাকানের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয়।

উর্দু ভাষায় প্রণীত গ্রন্থসমূহ

মুহাম্মদ আমিন নদভি রচিত *তারিখে আরকান কা এক গামসুদা বাব*[৯] আরাকানের প্রাচীন ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এতে আরব মুসলিম বণিকগণ কর্তৃক আরাকানে ইসলাম প্রচার, নরমিখলার সিংহাসন পুনরুদ্ধার এবং পরবর্তীতে মুসলিম নাম ধারণ, ফারসিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, শাহ সুজার আরাকান আগমন ও সপরিবারে হত্যাসহ রোহিঙ্গা মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামের অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে নরমিখলার পর থেকে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত শাসনামলকে মুসলিম সালতানাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি মোতাবেক প্রণীত নয়। এটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ এবং এতে কোন কাল বিভাজন নেই। মুহাম্মদ তাহের জামাল নদভির *সারজামিন আরকান কি তাহরিকে আজাদী : তারিখি পাস মানজার মে*[১০] গ্রন্থটি আরাকানের ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়ে উর্দু ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিস্তারিত ও পরিমার্জিত গ্রন্থ। ৪৪৩ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে ইসলাম প্রচার, নরমিখলা কর্তৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার ও ম্রোহংয়ে রাজধানী স্থাপন, আরাকান রাজ্যে মুসলিম প্রভাব, বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, বর্মী শাসক ও বৃটিশ কর্তৃক পর্যায়ক্রমভাবে আরাকান দখল, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের গণহত্যা, বার্মার স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা লাভ, নে উইনের শাসনকাল এবং মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটি ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি মোতাবেক প্রণীত নয়। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ খলিলুর রহমান এর *তারিখ-ই-ইসলাম : বার্মা ওয়া আরকান*[১১] এবং *কারবালা-ই-আরকান*[১২] প্রভৃতি গ্রন্থসমূহেও আরাকানের ইতিহাস, রোহিঙ্গা মুসলমানদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, মুসলিম নির্যাতন প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থ বা রচনাতেই আরাকানে মুসলিম ইতিহাসের সামগ্রিক কোন আলোচনা নেই। আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ইতিহাস কর্মই আংশিক অর্থাৎ গ্রন্থসমূহে আরাকান ও ইসলাম তথা মুসলমানদের এক একটি বিষয়কে নিয়ে লেখা হয়েছে। ফলে আরাকানে মুসলিম আগমন থেকে শুরু করে ইসলামের প্রভাবের শেষ পর্যায় পর্যন্ত কোন গ্রন্থেই আলোচিত হয়নি।

সুতরাং গবেষণার প্রেক্ষাপট হিসেবে আরাকানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মুসলিম আগমন থেকে শুরু করে ইসলামের প্রসার এবং আরাকানের অমাত্যসভা, সমাজ, সাহিত্য,

সংস্কৃতি, স্থাপত্য-শিল্পকলা প্রভৃতি সমন্বয়ে আরাকানের মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উপস্থাপন করাই এ গবেষণার লক্ষ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি মূলত একটি তথ্য উদ্‌ঘাটনকারী এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রক্রিয়া। এ গবেষণায় ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি (Historical Research Methods) ব্যবহার করা হয়েছে।

আরাকানে মুসলমানদের বিভিন্ন দিক ও বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলা, ইংরেজি এবং উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। প্রণীত গ্রন্থসমূহ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের রিপোর্ট হতে ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অতঃপর তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অভিমতসমূহ, সমসাময়িক গ্রন্থ হতে গৃহীত তথ্যাবলী দ্বারা সমর্থিত করার প্রয়াস চালিয়ে আরাকানের মুসলমানদের সঠিক ইতিহাস উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ গবেষণায় প্রাথমিক (Primary) ও মাধ্যমিক (Secondary) উভয় ধরনের উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস বলতে আরাকানের সমসাময়িক সাহিত্য ও রচনাবলী, সরকারি দলীল-দস্তাবেজ, মুদ্রা ও শিলালিপি এবং সমকালীন স্থাপত্য-শিল্পকলাকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়াও জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট, ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত "মুহাম্মদ সিদ্দিক খান সংগ্রহ" প্রভৃতিকে অন্যান্য প্রাথমিক উৎসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মাধ্যমিক উৎস বলতে আরাকানে ইসলামের প্রসার ও প্রভাবকে কেন্দ্র করে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় প্রণীত গ্রন্থ এবং বিভিন্ন গবেষণা সাময়িকীতে (Research Journal) প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধসমূহকে পরিগণিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ গবেষণায় বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম'কে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি সংগৃহীত উপাত্ত এবং তার সমর্থিত তথ্যাবলী দিয়ে ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরাকানে মুসলমানদের ইতিহাস প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জি

১ Abdul Karim, *The Rohingyas : A Short Account of Their Histroy and Culture,* Chittagong : Arakan Historical Society, 2000

২ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma : A Study of Minority Groups* Jerusalem : Hebrew University, 1981

৩ Mohammed Yunus, *A History of Arakan : Past & Present,* (Chittagong : Magenta Colour, 1994

৪ A.S. Bahar, "The Arakani Rohingyas in Burmese Society," M.A. Thesis, University of Windsor, Ontario, Canada, 1981.

৫ আলাউল, *তোহফা,* [আহমদ শরীফ সম্পাদিত] ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

৬ নসরুল্লাহ খোন্দকার, *শরীয়তনামা,* [আবদুল করিম সম্পাদিত] চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫।

৭ মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য,* মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

৮ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি* , ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

৯ মুহাম্মদ আমিন নদভি, *তারিখে আরকান কা এক গায়সুদা বাব* , আরাকান: আরাকান হিষ্ট্রি কনফারেন্স, ১৯৮৬।

১০ মুহাম্মদ তাহের জামাল নদভি, *সারজামিন আরকান কি তাহরিকে আজাদী : তারিখি পাস মানজার মে* , চট্টগ্রাম : আরাকান হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি, ১৯৯৯।

১১ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, *তারিখ-ই-ইসলাম : বার্মা ওয়া আরকান* , কলিকাতা : দি ষ্টার আর্ট প্রেস, ১৯৮৬।

১২ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, *কারবালা-ই-আরকান,* বিশেষ সংগ্রহ, আরাকান হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম।

+

অধ্যায় ১

আরাকান ও মুসলমান : সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

আরাকান অঞ্চলটি বর্তমানে মিয়ানমারের[১] একটি প্রদেশ। খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর ধরে এর স্বাধীন সত্তা, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা, রাজনৈতিক ঐতিহ্য প্রভৃতি ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সময়ের ধারাবাহিকতায় মুসলমানগণ এখানকার অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটি অভিনব এবং স্বতন্ত্র অধ্যায় বিনির্মাণে সক্ষম হয়েছিল। অদ্যাবধি এখানকার মোট জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ ইসলামের অনুসারী; এদের মধ্যে থাম্ভইক্যা,[২] জেরবাদী,[৩] কামানচি,[৪] রোহিঙ্গা[৫] প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। তবে রোহিঙ্গারা তাদের মধ্যে বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী। আরাকানে ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং আরাকান অঞ্চলের পরিচিতিমূলক ঐতিহাসিক পটভূমি হিসেবে অত্র অধ্যায়ে আরাকানের ভৌগোলিক পরিচিতি, সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস ও অত্রাঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

১.১ আরাকান পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল আরাকান। এটি উত্তর অক্ষাংশের ২১°২০″ ও ১৬°২২″ এর মধ্যে এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ৯২°২১″ ও ৯৫°২০″ এর মধ্যে অবস্থিত।[৬] এর উত্তরে চীন ও ভারত, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তর ও পশ্চিমে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তবর্তী নাফ নদীর মধ্যসীমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম। পূর্বে মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী ইয়োমা (Yoma) পর্বতমালা। এ সুদীর্ঘ, দুর্গম, সুউচ্চ ও বিশাল ইয়োমা পর্বতমালা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত আরাকানকে মিয়ানমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।[৭] যোগাযোগের সুবিধা ও ঐতিহ্যগত দিকদিয়ে মিয়ানমারের চেয়ে চট্টগ্রামই আরাকানের কাছাকাছি ও বন্ধুপ্রতীম অঞ্চল। প্রকৃতপক্ষে ছোটখাট পর্বতমালা ও নাফ নদীর ব্যবধান ব্যতীত উভয় অঞ্চলের (চট্টগ্রাম-আরাকান) অভিন্ন গোত্রীয় জনবসতির তেমন আর কোন অন্তরায় ছিলনা। তাই চট্টগ্রামে অস্টিকাদি জনগোষ্ঠী ও আরাকানে ভোট চীনা গোত্রীয় কিরাত জাতীয় লোকদের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।[৮] মিয়ানমারের সাথে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলেই সুদীর্ঘকালব্যাপী আরাকানের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়েছিল।

আরাকানের আয়তন নির্ণয় খুবই কষ্টসাধ্য। বাংলার সাথে আরাকানের সীমা প্রায়ই পরিবর্তন হতো। বাংলাদেশের কক্সবাজার, রামু ও চট্টগ্রামসহ একটি বিশাল অংশ দীর্ঘদিন যাবৎ আরাকানের শাসনাধীনে ছিল। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান (১৬৬৩-৭৭; ১৬৭৯-৮৮ খ্রি.) কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের পর থেকেই কেবল এর আয়তন সঠিক অর্থে নির্ধারিত হয়। এ হিসেবে বৃটিশ শাসন পর্যন্ত আরাকানের আয়তন ছিল ২০,০০০ (বিশ হাজার) বর্গমাইল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা উত্তর পার্বত্য আরাকান বার্মার চিন (Chin) প্রদেশে এবং দক্ষিণ আরাকানের কিছু অংশ লোয়ার বার্মার ইরাবতী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করায় বর্তমানে এখানকার আয়তন ১৪,২০০ বর্গ মাইল।[৯]

আরাকানের মানচিত্র অনেকটা বোয়াল মাছের মত। এর দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল কিন্তু প্রস্থে স্থান বিশেষে ভিন্নতা রয়েছে। উত্তর আরাকান অঞ্চলটি বেশ প্রশস্ত; যার প্রস্থ প্রায় ১০০ মাইল এবং আরাকানের দক্ষিণাংশে নিচের দিকে ক্রমশ সরু: যার প্রস্থ প্রায় ২০ মাইল। সমগ্র আরাকান অঞ্চল উত্তর-পশ্চিমে ১৭১ মাইলব্যাপী নৌ ও স্থল সীমারেখা সহকারে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

আরাকানে বেশকয়েকটি উল্লেখযোগ্য নদী আছে যথা: নাফ (Naf) মায়ু (Mayu) কালাদান (Kaladan) লেমব্রু (Lembru) অনন (Ann) তানগু (Tangup) ও স্যান্ডোয়ে (Sandoway) প্রভৃতি। এর মধ্যে নাফ, কালাদান, লেম্রু ও মায়ু আরাকানের প্রধান প্রধান নদী।

নাফ নদী প্রস্থে ছোট মনে হলেও বেশ খরস্রোতা। এটি বাংলাদেশ ও আরাকানের মধ্যকার আন্তর্জাতিক সীমারেখা হিসেবে কাজ করে। নাফ নদীর পূর্বতীরে আরাকানের মংডু টাউনশীপ এবং পশ্চিমতীরে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ অঞ্চল। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ মাইল এবং প্রস্থ ১ থেকে ১$^{১}/_{২}$ মাইল।[১০] নাফ নদীর সম্মুখভাগে বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র জিনজিরা বা সেন্টমার্টিন। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই আরাকানের হবিপাড়া থেকে এসে এ এলাকায় বসতি স্থাপন করেছে। পরমা (Purma) মায়ুথিট (Myothit), সাবিবিনিইন (Sabebinyin), উশিঙ্গা (Ushingya), মিংলাগুই (Minglagyi), পিনবায়ু (Pyinbyu), কাইন (Kayin), তাতমাগী (Tatmagyi), গদুছারা (Gawdusara), তুন (Tun) এবং ঘাকুনডু (Ngakungdo) প্রভৃতি ছোট ছোট প্রবাহ নালা ও হ্রদ মায়ু পাহাড়ে উৎপত্তি হয়ে মংডু টাউনশীপের মধ্য দিয়ে নাফ নদীতে এসে মিশেছে। অবশেষে নাফ নদী গিয়ে মিলিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের সাথে।

কালাদান (Kaladan) আরাকানের সবচেয়ে বড় ও প্রধান নদী। এটি ইয়াহু (Yahaw) স্টেটের চিন পাহাড় থেকে বইনু (Boinu) নামে উৎপত্তি হয়ে দক্ষিণের পার্বত্য আরাকানে প্রবেশের পর কালাদান নাম ধারণ করেছে। এটি প্রথমত দক্ষিণাভিমুখে অতঃপর উত্তরাভিমুখে এবং অবশেষে পূর্ব দিকে বাক নিয়ে সরাসরি লুসাই পাহাড় অঞ্চল অতিক্রম করে পুনরায় দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে উত্তর আরাকানের শেষভাগ হয়ে

আরাকানের পূর্বাংশে চলে গেছে। অবশেষে এটি আকিয়াব বন্দরের নিকটবর্তী স্থানে এসে বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। বর্মীভাষায় Kala শব্দের অর্থ বিদেশী, Dan শব্দের দ্বারা স্থান অর্থাৎ কালাদান বলতে বিদেশীদের স্থান বুঝানো হয়ে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সপ্তদশ শতক থেকে আরাকানীরা পর্তুগীজ জলদস্যুদের সহযোগিতায় দক্ষিণ ও পূর্ববাংলার নদী এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে মানুষ অপহরণ করে নাফ নদীর তীর থেকে কালাদান নদীর উত্তর তীরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাদেরকে ধান উৎপাদনের জন্য ভূমিদাস রূপে নিযুক্ত করেছিল। তাই এ নদীর নাম কালাদান হয়েছে।

লেম্রু (Lemro) আরাকানের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪৪ মাইল।[১১] এ নদীটি আরাকানের ইয়োমা পাহাড়ের পাদদেশীয় অঞ্চলের পানি গ্রহণপূর্বক উত্তর আরাকান হয়ে আকিয়াব শহরের ১০ মাইল উত্তর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। এ নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সভ্যনগরী বৈশালী, লংগিয়েত, পেরিন এবং ম্রাউক-উ রাজবংশের রাজধানী শহর ম্রোহং; যা বর্তমানে পাথুরেকেল্লা নামে প্রসিদ্ধ।

আরাকানের অন্যান্য প্রসিদ্ধতম নদীগুলোর অন্যতম হলো মায়ু (Mayu) নদী। এটি প্রায় ১০ মাইল দীর্ঘ; যা আরাকানের রাথিদং ও বুচিদং টাউনশীপের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এবং বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হবার পূর্বে কালাদান নদীর সাথে একত্রিত হয়েছে। মায়ু নদীর সম্মুখভাগে (upper portion) এসে এটি কালাপানজিন (Kalapanzin) নদী নামে পরিচিত হয়। পাহাড় থেকে নেমে আসা অসংখ্য ঝর্ণা-নালা, হ্রদ এর সাথে এসে মিলিত হয়েছে।

আধুনিক আরাকান অঞ্চলটি সুদূর অতীতে চারটি ভৌগোলিক সীমানায় বিভক্ত ছিল। সীমানাগুলো হচ্ছে - ধন্যাবতী (Dhannyawadi), রামাবতী (Ramawadi), মেখাবতী (Mekhawadi) এবং দারাবতী (Darawadi)। তৎকালীন ধন্যাবতী অঞ্চলটিই বর্তমান আরাকানের রাজধানী এলাকা। এছাড়া রামাবতী বর্তমান রাম্‌ব্রী দ্বীপ (Rambree Island), মেখাবতী বর্তমান চেদুবা এবং দারাবতী বলতে আধুনিক স্যাণ্ডোয়েকে বুঝানো হয়ে থাকে।[১২] এখানকার সমুদ্রতট সংলগ্ন দ্বীপসমূহের মধ্যে রাম্‌ব্রী ও চেদুবা সবচেয়ে বড়। রাম্‌ব্রী উপকূলে একটি গভীর প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় আছে যা চবপিউ শহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এ গভীর প্রাকৃতিক সামুদ্রিক পোতাশ্রয়ে সপ্তম নৌবহরের মত বড় জাহাজের সংকুলান হওয়া সম্ভব।

আরাকানে প্রায় ছোটবড় ১৭টি শহর আছে। শহরগুলো হলো আকিয়াব (Akyab), কিয়াউকপায়ু (Kyaukpayu), স্যান্ডোয়ে (Sandoway), কিয়াকতাউ (Kyauktaw), বুচিদং (Buthidaung), মংডু (Maundaw), মিনবিয়া (Minbya), ম্রাউক-উ (Mrauk-U), গোয়া (Gwa), টংগু (Tangup), পিউকতাউ (Pauktaw) পোন্নগিউ (Pannagun), মেবন (Maybon), মেনাং (Manaung), রাম্‌ব্রী (Rambree), রাথিদং

(Rathidaung) ও অন (Ann) প্রভৃতি। এ শহরগুলোর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব ব্যাপক থাকলেও মূলত স্যাণ্ডোয়ে, সিটওয়ে, মায়ু এবং কিয়াকপাউ- এ চারটিই আরাকানের প্রশাসনিক ইউনিট।

আকিয়াব শহরটি কালাদান নদীর মোহনায় অবস্থিত। বর্তমানে এটি উত্তর আরাকানের প্রধান সমুদ্র বন্দর। আরাকানের পরিবহন ও যোগাযোগের জন্য নদী পথই প্রধান। যাতায়াতের জন্য গোটা আরাকানে কোন রেলপথ নেই। পক্ষান্তরে সকল মৌসুমে গাড়ি চলাচলের উপযোগী মাত্র ২টি রাস্তা আছে। একটি আকিয়াব থেকে ইয়ানবিয়েন (Yeehanbyan) পর্যন্ত; যা মাত্র ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ। অন্যটি মংডু থেকে বুচিদং পর্যন্ত যা ২৪ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। কয়েকটি দুর্গম গিরিপথ আরাকান ও বার্মার মধ্যে একমাত্র স্থল পথ; যা সর্বসাধারণের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। জলপথে উভয় অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকলেও তা সব সময় নিরাপদ নয়। ফলে আরাকানের মূল জনগোষ্ঠী বার্মা থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন।

আরাকানের জমি খুব উর্বর। সমুদ্রের তীরবর্তী হবার কারণে এখানকার আবহাওয়া মধ্যম প্রকৃতির; যা কৃষি কাজের জন্য বেশ উপযোগী। অঞ্চল ভেদে আরাকানের একেক স্থানের মাটি একেক রকম। এর কিয়দাংশ এঁটেল মাটি এবং বাকী অধিকাংশ অঞ্চলের মাটিই দোআঁশ, পলি ও বেলে। আকিয়াবের রাথিদং ও মংডু অঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চলই বেলে মাটি। এছাড়া আরাকানের উপত্যকাসমূহের উঁচু অঞ্চলজুড়ে বর্ষার পাহাড়ী ঢল ও জল প্রবাহের কারণে উর্বর পলি মাটি সমৃদ্ধ। আরাকানের অধিবাসীরা মূলত কৃষিকে মূল পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, তবে আবাদযোগ্য সকল জমিই কৃষির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। সেখানকার ৯,৫৪,২৫৭ একর আবাদযোগ্য জমির মধ্যে প্রতিবছর প্রায় ৮,৫৪,৭২৪ একর জমি চাষ করা হয়।[১৩] বর্তমানে অনেক মুসলমান কৃষককে দেশ থেকে বিতাড়িত করে সেখানে মগদের পুনর্বাসন করাই এর অন্যতম কারণ।

ধান আরাকানের প্রধান উৎপাদিত ফসল। এছাড়াও এখানে ভুট্টা, আখ, তামাক, চীনাবাদাম, আলু, বেগুন, টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাঁজর, রসুন, পিঁয়াজ, আম, কাঁঠাল, পেঁপে, কলা, লিচু, বরই, কমলালেবু, বাতাবি লেবু, তরমুজ, জলপাই প্রভৃতি শস্য, শাকসবজি ও ফলমুল জন্মে।

আরাকানে কৃষি কাজের জন্য সাধারণত গরু-মহিষের লাঙ্গল ব্যবহার করা হয়। তবে বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রচালিত চাষ পদ্ধতিরও প্রয়োগ শুরু হয়েছে। গৃহপালিত পশু হিসেবে সেখানে গরু-মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতিই প্রধান। আরাকান গভীর জঙ্গলাপূর্ণ পাহাড়ী এলাকা হেতু সেখানে টাইগার, চিতাবাঘ, হরিণ, ভাল্লুক, বুনো শুকর এবং বুনো হাতিও রয়েছে। বিশেষ করে ইয়োমা পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে হাতি, গণ্ডার, বুনো মহিষ, বুনো বিড়াল, শেয়াল ও বানরের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া সর্বত্রই গোখরা সাপসহ বিভিন্ন প্রজাতির বিষধর সাপ এবং স্রোতস্বিনী নদীর মোহনায় কুমির বেশ লক্ষণীয়।

কৃষির পাশাপাশি আরাকানের একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী মাছ শিকারকে তাদের প্রধান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। আরাকানের মংডু থেকে শুরু করে ওয়াচং (Gwachaung) হয়ে ইরাবতি বিভাগের থাবাং সীমান্ত অঞ্চল কিয়াকচামচং (kyaukchamchaung) পর্যন্ত প্রায় ৩৬০ মাইলব্যাপী মনোরম সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চল। এসব অঞ্চলের বিভিন্ন মোহনায় পর্যাপ্ত সামুদ্রিক মাছ ধরা পড়ে। এছাড়া নদী মাতৃক আরাকানের নদীসমূহেও পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায়। বিশেষ করে নাফ নদী ও কালাদান নদীর উপকূলীয় চিংড়ি ঘের থেকে পর্যাপ্ত উন্নতমানের চিংড়ি উৎপন্ন হয়। আধুনিককালে পুকুর ডোবাতেও মাছ চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

আরাকানে পর্যটন শিল্প খুব সম্ভাবনাময়। সরকারিভাবে আরাকানকে পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে আকিয়াব, কিয়াকপাউ, স্যান্ডোয়ে, ঘাপালী (Ngapali) প্রভৃতি অঞ্চলে পর্যটকদের জন্য সমুদ্রবন্দর, সমুদ্র সৈকত ও প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় হিসেবে আকর্ষণ করতে পারবে।

আরাকানের মোট আয়তনের প্রায় ৭০% পাহাড় ও বনাঞ্চলসমৃদ্ধ। এখানকার বনাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত মানের কাঠ উৎপন্ন হয়। আরাকানের পাহাড়ী অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন সেগুনকাঠ মিয়ানমারের মোট উৎপাদিত কাঠের প্রায় ১৫ শতাংশ।[১৪] এছাড়া আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে পিনকেডু নামে পরিচিত আয়রন কাঠ, বাঁশ, দারুচিনি ও ওক (Oak) গাছসহ প্রচুর পরিমাণে বনজ ও ঔষুধী গাছ জন্মে। বনাঞ্চলের মধু আরাকানে খুব প্রসিদ্ধ।

খনিজ সম্পদের দিক থেকেও আরাকান অঞ্চল খুব সম্ভাবনাময়। এখানে পেট্রোল, কয়লা ও তেলসহ বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদের সন্ধান রয়েছে। এমনকি সেখানে সোনা ও রূপার খনিরও অস্তিত্ব বিদ্যমান।[১৫] কিন্তু খনন কাজের উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে তা উত্তোলন ও ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হচ্ছে না।

চাল আরাকানের প্রধান রপ্তানী পণ্য। অতীতে আরাকান থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাল রপ্তানী করা হতো বলে ঐতিহাসিকভাবে আরাকানকে *ধান্যবতী* (Granary of Rice) বলা হয়ে থাকে। চাল ছাড়াও মাছ, লবণ, মশলা, তামাক, কাঠ প্রভৃতি আরাকানের প্রধান রপ্তানীযোগ্য পণ্য। প্রধান আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে ঔষধ, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কাপড় এবং প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বিলাস সামগ্রীই প্রধান।

আরাকানের জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান প্রদান করা খুবই কষ্টসাধ্য। সামরিক জান্তা শাসিত রুদ্ধদ্বার দেশ হিসেবে সেখানকার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিস্থিতি এবং জনসংখ্যার বিন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই অস্পষ্টতা রয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনতা উত্তর মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলে কোন আদমশুমারীও হয়নি। ফলে এ বিষয়ে মতপার্থক্যের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

এক. বাংলাদেশের পত্র/পত্রিকার ভাষ্য ও আরাকানের মুসলিম লেখকদের মতানুসারে আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ। তন্মধ্যে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ মুসলমান; যা প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৬০%।[১৬]

দুই. ড. আবদুল করিম এর মতে, আরাকানের মোট জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ, তন্মধ্যে ২০ লক্ষ মগ-বৌদ্ধ, ১৪ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান, ৪ লক্ষ সর্বপ্রাণবাদী (Animist) এবং ২ লক্ষ হিন্দু ও খ্রিস্টান।[১৭]

তিন. U.S. Committee for Refugees এর ভাষ্য "Arakans Population is estimated to be 3 to 3.5 million persons of whom approximately 1.4 million are Rohingya."[১৮]

আরাকানী মুসলিম লেখকদের মতানুসারে প্রায় ১২ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলমান বিভিন্ন সময় নির্যাতনের মুখে আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এর মধ্যে সৌদি আরবে ৫ লক্ষ, পাকিস্তানে ২ লক্ষ ৫০ হাজার, বাংলাদেশে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার, গালফ স্টেটসমূহে ৫৫ হাজার, মালয়েশিয়া ও থাইল্যাণ্ডে ৪৩ হাজার এবং অন্যান্য দেশে ১০ হাজারেরও বেশী মুসলমান আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়েছে।[১৯] এছাড়া ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের গণহত্যার সময় লক্ষাধিক মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং ৫ লক্ষাধিক মুসলমান দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। তৎকালীন বৃটিশ প্রশাসন বর্তমান গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার সুবিরনগরে এবং কক্সবাজারের সমুদ্রোপকূলে শরণার্থী ক্যাম্প তৈরী করে এদের পুনর্বাসনের চেষ্টা চালায়।[২০] এভাবে বিভিন্ন সময় হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও বিতাড়নের ফলে মুসলমানদের সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তদুপরি আরাকানী মুসলিম লেখকদের পরিসংখ্যানটি উত্তর আরাকান বিশেষত বুচিদং ও মংডু এলাকার পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেইসাথে দুই ও তিন নম্বরের পরিসংখ্যানের সাথে বিতাড়িত ও নিহত মুসলমানদের সংখ্যা যোগ করলে আরাকানী মুসলিম লেখকদের পরিসংখ্যানের সাথে মিলে যায়। কেননা ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী মোতাবেক আকিয়াবের মুসলমান ছিল ৩৩%।[২১] অনুরূপভবে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী আরাকানের লোকসংখ্যা হচ্ছে ১২,৯৯,৪১২ জন। এর মধ্যে বৌদ্ধ ৮,৭৮,২৪৪ জন, মুসলমান ৩,৮৮,২৫৪ জন, হিন্দু ৩,২৮১ জন, খ্রিস্টান ২,৭৫৩ জন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছিল ২৫,৮৮০ জন।[২২] সুতরাং মোটামুটিভাবে বলা যায়, বর্তমানে আরাকানের মোট জনসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। এর মধ্যকার ৪০% লোক মুসলমান।

আরাকান নামটি অনেক পুরাতন হলেও বর্তমানে সরকারি নথিপত্রে এ নামটি বিলুপ্ত প্রায়। মিয়ানমারের সামরিক শাসক নে উইন ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের নাম পরিবর্তন করে 'রাখাইন স্টেট' নামকরণপূর্বক এটিকে একটি অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দিয়েছে।[২৩] সে অবধি সরকারিভাবে আরাকানকে 'রাখাইন স্টেট' নামে অভিহিত করা হয়। ঠিক কখন থেকে এ রাজ্যটি আরাকান নামে পরিচিত তাও সঠিকভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রাচীনকালে আরাকানীরা তাদের জন্মভূমিকে রখইঙ্গ (Rakhaing) নামে অভিহিত করত।[২৪] এ রখইঙ্গ শব্দটি সংস্কৃত 'রক্ষ' (Raksha) এবং পালি 'যক্খো' (Yokkho)

অর্থাৎ রক্ষ ও যক্ষ শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়। কেননা বৌদ্ধরা লঙ্কা বা সিংহল অর্থাৎ আধুনিক শ্রীলংকা জয় করার পূর্বে আরাকানের আদিম অধিবাসীদের রক্ষ বা যক্ষ নামেই অভিহিত করত। অনুরূপভাবে ভারতীয় আর্যরা আরাকানের দ্রাবিড় ও মঙ্গলীয়দের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পূর্বে এ নামে অভিহিত করতেন।

রাখাইং শব্দের অর্থ হলো দৈত্য বা রাক্ষস।[২৫] রাখাইংরা তাদের জন্মভূমিকে রাখাইংপে (Rakhaingpyi) বা রাখাইং ভূমি (Land of the Rakhaing) বলত।[২৬] রাখাইন বলতে আরাকানের অধিবাসী আর পে (Phi) বলতে দেশ বুঝানো হতো। ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদদের বর্ণনায় আরাকানের বিভিন্ন[২৭] নাম পাওয়া যায়। তবে রোহিঙ্গা মুসলমানদের মতে আরাকান নামটি অনেক পুরনো। এ নামের বিকৃতিতেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উচ্চারণ হয়েছে। আরাকান শব্দটি মূলত আরকান; যা আরবী আররেকন বা আররুকন শব্দের অপভ্রংশ।[28] রুকন শব্দের অর্থ হলো স্তম্ভ বা খুঁটি। ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদকে রুকন বলা হয়। তাই তাদের ধারণা, সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে তৎকালীন মুসলমানরা আরাকানকে ইসলামের বুনিয়াদের দিকে খেয়াল রেখে *আরকান* নামকরণ করেছেন।

১.২ ইসলাম পূর্ব আরাকান

মিয়ানমারের প্রাচীন রাজাদের কিংবদন্তীমূলক ইতিকাহিনী মহারাজোয়াং (Maha Rajaweng) এর উদ্ধৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক এ.পি. ফেয়ার উল্লেখ করেন যে, প্রাচীন আরাকানের রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো মারুবংশীয় (Marayu) রাজাগণ। তারা খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দে আরাকানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।[২৯] অতি প্রাচীনকালে ভারতের কাশীধামের বেনারস (Banaras) অঞ্চলের এক রাজা আরাকানে এসে একটি রাজ্যস্থাপন করে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন। দক্ষিণ আরাকানের স্যাণ্ডোয়ে[৩০] শহরের নিকটবর্তী রামাবতী বা রামব্রীতে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। তার মৃত্যুর পর রাজপুত্রদের মধ্যে কুমিসিংহ নামক এক যুবরাজ আরাকানের রাজা হন এবং তারই বংশধরগণ দীর্ঘদিন যাবৎ আরাকান শাসন করেন। তাদের শাসনের শেষ পর্যায়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে আরাকান দশভাগে বিভক্ত হয় এবং রাজ্যে অশান্তির এক পর্যায়ে প্রজা বিদ্রোহের ফলে রাজাগণ বিতাড়িত হন এবং তাদের একমাত্র কন্যাকে ক্ষমতায় বসানো হয়। কিন্তু তিনি এক ব্রাহ্মণ যুবকের সাথে রামাবতী ত্যাগ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মধ্য আরাকানে এসে রাজধানী স্থাপন করেন। ধন্যাবতী নামক তাদের এক কন্যা সন্তান জন্মে। উক্ত কন্যাকে কালাদান নদীর তীরবর্তী মারুবংশীয় জনৈক রাজপুত্র বিবাহ করেন এবং তার নামানুসারে *ধান্যবতী নগরী* নাম দিয়ে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এ বংশের রাজাগণ বংশ পরম্পরায় ১৮৩০ বছর আরাকানে রাজত্ব করেন। এ বংশের শেষ রাজার আমলে আরাকানের প্রজাগণ বিদ্রোহী হয়ে রাজাকে হত্যা করে। তখন রানী দুই কন্যাসহ কাউকপান্ডায়ং (Kyaukpandaung) পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৩১]

মহারাজোয়াংয়ের আর একটি কাহিনী সূত্রে জানা যায় যে, কাপিলাবস্তুর শাক্য বংশে গৌতম বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করার বহুপূর্বে অভিরাজ নামক একজন রাজার রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি রাজ্য ত্যাগ করে বার্মার ইরাবতি নদীর তীরবর্তী 'টাগাউন' নামক স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করে সেখানকার রাজা হন। তার মৃত্যুর পর দুই পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অবশেষে উভয়ের মধ্যে চুক্তি হয় যে, যে ব্যক্তি এক রাত্রির মধ্যে ধর্মমন্দির নির্মাণ করে দিতে সামর্থ্য হবে সেই হবে রাজা। সুচতুর কনিষ্ট ভ্রাতা কানরাঞ্জি কৌশলে এক রাত্রির মধ্যে মন্দির নির্মাণ করে দিয়ে রাজা হন। এতে তার বড় ভাই কানরাজগ্যী পুত্রসহ আপন অনুগত সৈন্য নিয়ে ইরাবতী নদীর ভাটির দিকে গিয়ে একটি রাজ্য স্থাপন করে সেটি তার পুত্রকে দান করেন। অতঃপর কানরাজগ্যী উত্তর আরাকানের কাউকপাওায়ু পর্বতে গিয়ে নিজের জন্য আর একটি রাজ্য স্থাপন করেন এবং আশ্রিত রাজবংশীয় এক রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। এ কানরাজগ্যী বংশের ৬২ জন রাজা বংশ পরম্পরায় ১৭'শ ৩২ বছর ধরে আরাকানে রাজত্ব করেন।[৩২] এ বংশের পতনের পরই ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকানে চন্দ্রসূর্য বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

আরাকানের খ্রিস্টপূর্ব ইতিহাস পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস ২৬৬৬ অব্দ থেকে পাওয়া গেলেও তা ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মোতাবেক নির্ভুল নয়। কারণ তৎকালীন সময়ে ইতিহাস সংরক্ষণের কোন পদ্ধতি ছিলনা। ঐতিহাসিক এপি ফেয়ার মহারাজোয়াং সূত্র বর্ণনা করলেও এ ইতিহাসের সত্যায়ন প্রসঙ্গে সংশয়ের প্রচুর অবকাশ রয়েছে। তবে তিনি যে রাজাদের ধারাবাহিক নাম[৩৩] উল্লেখ করেছেন তাদের শাসনকাল ও বিবরণী বিবেচনা করলে প্রাথমিকভাবে এ ইতিহাসকেই আপাতত গ্রহণ করা যেতে পারে। যদিও শাসনকার্য পরিচালনার সময়কালের মধ্যে হিসাবের অনেক গরমিল বিদ্যমান।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চল বর্তমানে ভিন্নমুখী দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র বলে বিবেচিত হলেও সুপ্রাচীন কাল থেকে এ দুটি অঞ্চল একটি দেশরূপে পরিগণিত ছিল। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৪৬ কিংবা ১৫১ খ্রিস্টাব্দে মগধ থেকে আগত চন্দ্রসূর্য নামক এক সামন্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে আরাকান ও চট্টগ্রাম অধিকার করে তিনি সেখানকার রাজা হন। আরাকানের পূর্ব রাজধানী ধান্যবতীতেই তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি নিজে ছিলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত এবং তার অনুচরবর্গের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্মেরই অনুসারী ছিল। তারা আরাকান ও চট্টগ্রামের জড়োপাসক অধিবাসীদেরকে সর্বপ্রথম আর্যধর্ম, ভাষা, দর্শন, লিপি ও সংস্কৃতিতে শিক্ষিত করে তোলে। রাজা চন্দ্রসূর্য আরাকানে সর্বপ্রথম মহামুনী বুদ্ধমূর্তি তৈরী করে রাজধানী ধান্যবতীতে মহামুনী প্যাগোডা নির্মাণপূর্বক মূর্তিটি স্থাপন করেন। কালক্রমে চট্টগ্রামে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি এবং আরাকানে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত চট্টগ্রাম-আরাকান একটি অখণ্ড রাজ্য হিসেবে চন্দ্রসূর্য বংশ কর্তৃক শসিত হয়।[৩৪] চন্দ্রসূর্য বংশের মোট ২৫ জন রাজা[৩৫] ধারাবাহিকভাবে ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন। তন্মধ্যে প্রথম এগারজনের সময় চট্টগ্রাম

আরাকানভুক্ত ছিল; অতঃপর ষষ্ঠশতকে চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমতটের খড়্গ রাজবংশের শাসনাধীনে চলে যায়।[৩৬]

ধান্যবতীতে চন্দ্রসূর্য বংশের শাসনামলে বৈশালাতে রাজধানী স্থাপন করে আরও একটি চন্দ্রবংশীয় শাসনের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বাধীন আরাকান রাজ্যের শেষ রাজধানী ম্রোহং এর সিত্তাউং প্যাগোডায় সংরক্ষিত আনন্দ চন্দ্রের স্তম্ভলিপি[৩৭] মারফত এ তথ্য জানা যায়। উক্ত স্তম্ভলিপিতে সংস্কৃত ভাষায় আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের প্রশস্তিমূলক ৬৯টি পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। তাতে চন্দ্রবংশীয় রাজা পরম্পরায় ৩৭০-৭২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী রাজাদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। সে হিসেবে অনুমান করা যায় যে, ধন্যাবতীর রাজবংশের ২৫ জন রাজার মধ্যে পঞ্চম রাজা সূর্যমণ্ডলের (৩১৩-৩৭৫) রাজত্বকালে বৈশালীতে আরাকানের চন্দ্ররাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা ধন্যাবতীর চন্দ্রসূর্য বংশের ২৩তম রাজা সূর্যক্ষিতির (৭১৪-৭২৩) রাজত্বকাল পর্যন্ত বৈশালীতে রাজত্ব করেন। তাদের রৌপ্যমুদ্রা, তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধন্যাবতীতে চন্দ্রসূর্য বংশের রাজত্বকালে বৈশালীতে চন্দ্রবংশের রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। সে সময় আনন্দমাধব, আনন্দেশ্বর প্রভৃতি নামে বহু মঠ, মন্দির ও বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং তারা যে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এটা সহজে অনুমান করা যায়। ধন্যবতীর চন্দ্রসূর্য বংশের পর বৈশালীতে রাজধানী স্থাপন করে মহতইঙ্গ চন্দ্র (Mahataing Tsnddra) ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে চন্দ্র বংশের রাজত্বের সূচনা করেন। এ বংশের ১২ জন শাসক ছিলেন। যথা[৩৮] (Dynasty of the city We-tha-li).

১. মহতইঙ্গচন্দ্র (Mahataing-tsandra) ৭৮৮-৮১০ খ্রি.

২. সূর্যতইঙ্গচন্দ্র (Thu-ri-ya-taing tsandra) পুত্র - ৮১০-৮৩০ খ্রি.

৩. মৌলতইঙ্গচন্দ্র (Mau-la-taing tsandra) পুত্র - ৮৩০-৮৪৯ খ্রি.

৪. পৌলইতঙ্গচন্দ্র (Pau-la-taing tsandra) পুত্র - ৮৪৯-৮৭৫ খ্রি.

৫. কালাইতঙ্গচন্দ্র (Kala-taing-tsandra) পুত্র - ৮৭৫-৮৮৪ খ্রি.

৬. দৌলাতইঙ্গচন্দ্র (Dula-taing-tsandra) পুত্র - ৮৮৪-৯০৩ খ্রি.

৭. থিরিতইঙ্গচন্দ্র (Thi-ri-taing tsandra) পুত্র - ৯০৩-৯৩৫ খ্রি.

৮. থিনঘাতইঙ্গচন্দ্র (Thing-gha-tha tsandra) পুত্র - ৯৩৫-৯৫১ খ্রি.

৯. সুলাতাইঙ্গচন্দ্র (Tsu-la-taing-tsandra) পুত্র - ৯৫৩-৯৫৭ খ্রি.

১০. অমাথু (Amya thu) মিউ গোত্র প্রধান - ৯৫৭-৯৬৪ খ্রি.

১১. পাইফেয়ু (Pai-phyu) ভ্রাতুস্পুত্র - ৯৬৪-৯৯৫ খ্রি.

১২. ঘামিংঘাতুম (Nga-Meng-ngu-tum) সুলাইত ইঙ্গ চন্দ্রের পুত্র - ৯৫৫-১০১৮ খ্রি.

উপরোক্ত ১২জন শাসকের মধ্যে প্রথম নয়জন শাসক বংশ পরম্পরায় ১৬৯ বছর

আরাকান শাসন করেন। অতঃপর ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মিউ (Myu) গোত্রের প্রধান *অমাথু* আরাকানের সিংহাসন দখল করেন। তিনি ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র পাইফিউ (৯৫৭ -৯৬৪ এবং ৯৬৪-৯৯৫ খ্রি.) প্রায় ৩৭ বছর রাজত্ব করেন। অতঃপর ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের ভূতপূর্ব রাজা সুলইতঙ্গচন্দ্রের পুত্র ঘামিংঘাতুম পুনরায় আরাকানের সিংহাসন দখল করেন।

ঘামিংঘাতুম দখলদার পাইফেয়ুর নিকট থেকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করলেও খুব নিরাপদে শাসনকার্য চালাতে পারেননি। রাজ্য পুনর্গঠনের কাজে তিনি যখন খানিকটা সফল হয়েছিলেন ঠিক তখনই বার্মার উপজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হন। তারা ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে ইয়োমা পর্বত অতিক্রম করে বৈশালী আক্রমণপূর্বক রাজা ঘামিংঘাতুমকে হত্যা করে।[৩৯] আক্রমণকারী বার্মীজ উপজাতিরা ঘামিংঘাতুমকে হত্যা করলেও রাজধানী দখল করতে সক্ষম হয়নি। তদুপরি ঘামিংঘাতুমের পুত্র খেত্তাথিং (khettathing) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে উপজাতি আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পিনসা (Pyintsa) বা চাম্পাওয়াত (Sambawat) নগরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।[৪০] উল্লেখ্য, চাম্পাওয়াত গ্রামটি আধুনিক ভারতের বিহার রাজ্যের অন্তর্গত প্রাচীন মগধ রাজ্যের চম্পাবতী নগরের ঐতিহ্য ধারণ করেছে।

এ রাজবংশে খেত্তাথিং থেকে পরবর্তী পর্যন্ত মোট ১৫ জন রাজা ধারাবাহিকভাবে আরাকান শাসন করেন। এর মধ্যে নিম্নোক্ত পাঁচজন রাজা স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। Dynasty of Ping-tsa City[৪১]

১. খেত্তাথিং (Khettatheng) সুলাতইঙ্গচন্দ্রের প্রপৌত্র ১০১৮-১০২৮ খ্রি.

২. চান্দাথেং (Tsanda theng) খেত্তাথিংয়ের ভাই - ১০২৮-১০৩৯ খ্রি.

৩. মেং রেংফু (Meng-reng-phyu) চান্দাথেংয়ের পুত্র ১০৩৯-১০৪৯ খ্রি.

৪. নাগসূর্য (Naga Thuriya) মেং রেংফুর পুত্র ১০৪৯-১০৫২ খ্রি.

৫. সূর্যরাজা (Thuriya Radza) নাগসূর্য এর পুত্র ১০৫২-১০৫৪ খ্রি.

প্রাচীনকালে বার্মায় বেশকিছু স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। থেটন (Thaton) পেগু (Pegu) পঁগা (Pagan) আভা (Ava) প্রোম (Pram) প্রভৃতি রাজ্যসমূহের মধ্যে পঁগা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য। ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের পিনসা বা চাম্বাওয়াত রাজবংশের ৬ষ্ঠ রাজা পুন্নাকা (Pun-na-ka) এর শাসনামলে ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দে পঁগারাজ আনওয়ারাথা (Anwaratha- 1044-1077) আরাকান জয় করে পঁগারাজ্যভুক্ত করেন এবং স্বীয় কৌলীন্য বৃদ্ধির জন্য তিনি আরাকানের বৈশালী রাজকন্যা পঞ্চকল্যানীকে (Pancha Kalyani) বিয়ে করেন।[৪২] পঁগারাজ আনওয়ারাথা ১০৫৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ও পাট্টিকারা (বৃহত্তর কুমিল্লাসহ) জয় করে পঁগা সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১০৫৭ সাল থেকে আরাকানের শাসকগণ ধারাবাহিকভাবে ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পঁগার অধীনস্থ করদরাজা হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

পঁগা সাম্রাজ্যভুক্ত আরাকানের করদরাজা হিসেবে পিনসা রাজবংশ পিনসাতে মোট দশজন রাজা ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ বংশের শেষ করদরাজা মিনপতির (Min-pati- 1100-1130) মৃত্যুর পর পিনসার ভূতপূর্ব সপ্তম করদরাজা মিনবিলুর পুত্র লেতিয়া মেংগাং ১১০৩ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পিনসা থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে পেরিন (Parin) এ নিয়ে যান। এ বংশের মোট আটজন রাজা ১১০৩ থেকে ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৬৪ বছরকাল রাজধানী পেরিনে বংশ পরম্পরায় পঁগা রাজ্যের করদরাজা হিসেবে আরাকান শাসন করেন।[৪৩]

পেরিন রাজবংশের ভিত্তির উপরই পরবর্তী কিরিত (Hkrit) রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পেরিন রাজবংশের ৮ম ও শেষ রাজা অনানথিরির (Ananthiri- 1165-1167) ভাই মেংফুন্‌সা (Meng-Phun-tsa-1167-1174) আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি পেরিন থেকে রাজধানী স্থানান্তর করে কিরিত নামক স্থানে নিয়ে যান।[৪৪] এ বংশে মাত্র ৪ জন শাসক তেরো বছর রাজ্য পরিচালনা করেছেন।

কিরিত রাজবংশ খুব বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। কারণ, করদরাজা হিসেবে শাসন করলেও তাদের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে সালিংকাবু (১১৭৯-৮০) নামক জনৈক ব্যক্তি রাজক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। অবশ্য সেও বেশী দিন রাজত্ব পরিচালনা করার সুযোগ পায়নি। সে বছরই অর্থাৎ ১১৮০ খ্রিস্টাব্দে কিরিত রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা পিনসাকওয়া এর পুত্র মিসুথিন (১১৮০-৯১) রাজক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি কিরিতকে রাজধানী হিসেবে নিরাপদ মনে না করে তা পুনরায় পিনসায় স্থানান্তর করেন। এ বংশের ১৬ জন রাজা (১১৮০-১২৩৭) মোট ৫৭ বছর আরাকানে পঁগার করদরাজা হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৪৫]

শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পিনসা রাজবংশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলেও রাজধানী লংগিয়েতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ১২৩৭ খ্রিস্টাব্দে পিনসার দ্বিতীয় রাজবংশের ষোলতম রাজা ঘানালুম (Nganalum-1234-1237) এর পুত্র লাংমা ফিউ (H-Lan-ma-Phyu- 1237-1243) ১২৩৭ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের শাসনভার গ্রহণপূর্বক পিনসা থেকে রাজধানী লংগিয়েতে স্থানান্তর করেন। এ বংশের মোট ১৮ জন রাজা আরাকান শাসন করেছেন তন্মধ্যে ৮ জন ১২৩৭ সাল থেকে ১২৭৯ পর্যন্ত পঁগার করদরাজা হিসেবে এবং ১২৭৯ সাল থেকে ১৪০৬ সাল পর্যন্ত মোট দশজন রাজা আরাকানের স্বাধীনরাজা হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৪৬] ১২৭৭ ও ১২৮৩ খ্রিস্টাব্দে পরপর দুবার মোঙ্গল আক্রমণের ফলে পঁগারাজা অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। সে সুযোগে লংগিয়েত রাজবংশের নবম রাজা মেংদী (Mengdi-1279-1285) ১২৮৩ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পঁগারাজ স্বাধীনচেতা মেংদীর প্রতিরোধে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি।

রাজা মেংদী স্বাধীন আরাকানের শক্তি বৃদ্ধি করতে অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে এবং ঐ বছরই স্যান্ডেয়ে নামে খ্যাত দক্ষিণ আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ঘেঁষে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আরাকান রাজ্যের বিস্তার ঘটায়। ফলে ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২২৬ বছর বার্মার পঁগা সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে আরাকান স্বাধীন হয়। পরবর্তীতে লংগীয়েতের স্বাধীনরাজা হিসেবে নিম্নোক্ত দশজন শাসক আরাকান শাসন করেন। [৪৭]

১. মেংদী (Mengdi) মিনবিলুর পুত্র ১২৭৯-১৩৮৫ খ্রি.

২. উসানাগ্যা (Uts-Tsanangay) মেংদীর পুত্র ১৩৮৫-১৩৮৭ খ্রি.

৩. থিওয়ারিত (Thiwarit) বড় ভাই ১৩৮৭-১৩৯০ খ্রি.

৪. থিনচি (Thintse) বড় ভাই ১৩৯০-১৩৯৪ খ্রি.

৫. রাজা থু (Radzathu) পুত্র ১৩৯৪-১৩৯৫ খ্রি.

৬. সিথাবিং (Tsithabeng) জবর দখলকারী ১৩৯৫-১৩৯৭ খ্রি.

৭. মিংসোয়েংকি (Myintsoingky) জবর দখলকারী ১৩৯৭-১৩৯৭ খ্রি.

৮. রাজাথু (Radzathu) সিংহাসন পুনরুদ্ধারকারী ১৩৯৭-১৪০১ খ্রি.

৯. থিংগাথু (Thinggathu) রাজাথুর ভাই ১৪০১-১৪০৪ খ্রি.

১০. মিনসুয়ামুন (Mengtsaumwn) রাজাথুর পুত্র ১৪০৪-১৪০৬ খ্রি.

উল্লেখ্য যে, আরাকানরাজ মেংদী ১০৬ বছরকাল সফলতার সাথে রাজ্য শাসন করেন। তার পরে কোন রাজাই পুরোপুরি সফলতার সাথে প্রশাসন চালাতে সক্ষম হননি। রাজ্যে বিভিন্ন কোন্দলের সুযোগে সিথাবিং নামক জনৈক আরাকানী নেতা রাজাথুকে সিংহাসনচ্যুত করে জবরদখলকারী হিসেবে ক্ষমতায় বসেন। কিন্তু মাত্র দু'বছরের মধ্যে রাজাথু পুনরায় সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন। লংগিয়েতের দশম রাজা মিনসুয়ামুন এর সময়েই আরাকানের ইতিহাস পাল্টে যায়। মূলত আরাকানের পরবর্তী ইতিহাস ইসলামের উত্থান, সম্প্রসারণ, প্রভাব বিস্তার ও প্রভাব হ্রাসের ইতিহাস।

১.৩ আরাকান ও ইসলাম

বাংলা ও আরাকান সীমান্তগত দিক থেকে শুধু প্রতিবেশীই নয় বরং চট্টগ্রাম অঞ্চল বিচ্ছিন্নভাবে প্রায় ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যেমন চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারকে আলোচনা করা হয় তেমনি আরাকানে ইসলামের আগমন আলোচনা করতে হলেও চট্টগ্রামের আলোচনা অপরিহার্য। কেননা তৎকালীন সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চল মূলত আরাকানেরই অংশ ছিল। সে হিসেবে চট্টগ্রামে ইসলামের আগমন অর্থই হল আরাকানে ইসলাম প্রচারের সূচনা।

১.৩.১ আরাকানে ইসলামের আগমন

হিজরী প্রথম শতকের শেষ দিকে (৯৬ হি.) ৭১২ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া শাসনামলে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু অঞ্চলে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত হবার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিকভাবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা শুরু হলেও মূলত পবিত্র মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসাময়িক কালে মহানবি (সা.) এর জীবদ্দশাতেই ভারতীয় উপমহাদেশসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিশেষত আরাকান অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে। কেননা খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব থেকে আরব বণিকেরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যিক পথে[৪৮] ভারত, বার্মা ও চীনের ক্যান্টন বন্দরে বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। সে সূত্রেই আরবের কুরাইশরাও ইসলাম পূর্ব যুগেই এ বাণিজ্যিক পথে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। বিশেষত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য (ইরান) ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে আরবদের স্থল বাণিজ্যিক পথ মারাত্মকভাবে বিপদ সংকুল হয়ে পড়েছিল। ইয়ামান ও হাজরা মাউতের আরব বণিকদের নৌবাণিজ্যের পূর্ব অভিজ্ঞতার সুবাদে আরবের কুরাইশরাও নৌবাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে পড়ে। সে সূত্রেই মহানবি (স.) এর আগমনের পূর্বেই তারা ভারতীয় উপমহাদেশ, বার্মা, কম্বোডিয়া ও চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করেছিল এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর সূচনালগ্নেই তারা দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেররবন্দর, তৎকালীন আরাকানের চট্টগ্রাম ও আকিয়ারের সামুদ্রোপকূলে স্থায়ী বাণিজ্যিক উপনিবেশও গড়ে তোলে।[৪৯] পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক কালের মুসলমানরাও বাণিজ্যিক কারণে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য করতে আসে এবং সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চীনা বাণিজ্যে মুসলিম প্রভাব অব্যাহত রাখে। তৎকালীন সময়ে দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন বন্দর 'খানফু' নামে পরিচিত ছিল। মুসলিম বণিকগণ এ সময় ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিশেষত মালাবার এবং চট্টগ্রাম থেকে কাঠ, মসলা, সুগন্ধীদ্রব্য ও ঔষধি গাছগাছড়া সংগ্রহ করত।[৫০] বাণিজ্যিক কারণে মুসলমানরা এ সব অঞ্চল সফর করলেও মূলত ইসলাম প্রচার তাদের মুখ্য বিষয় ছিল। কেননা দীনের দাওয়াত দান ও দীন প্রতিষ্ঠার কাজকে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করে দেয়া হয়েছে।[৫১] দীন প্রচারের এ অনুভূতির প্রেক্ষিতে তারা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ইসলাম প্রচারকে অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করার কারণে মহানবির (স.) জীবদ্দশাতেই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। মহানবি (স.) এর নবুয়াতের পঞ্চম বছরে অর্থাৎ ৬১৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে মক্কার প্রতিকূল পরিবেশে মুসলমানদের ঈমান-আকিদা নিয়ে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় মহানবি (স.) সাহাবিদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। মহানবি (স.) এর নির্দেশের প্রেক্ষিতে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) সহ প্রায় ৮৩ জন সাহাবি হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর[৫২] দরবারে আশ্রয় নেন।[৫৩] মূলত মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানের পাশাপশি ইসলামের সুমহান আদর্শ মক্কার বাইরে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টির

উদ্দেশেই মহানবি (স.) এ সকল বিজ্ঞ সাহাবিকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। কারণ আবিসিনিয়া ছিল লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত একটি উল্লেখযোগ্য অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র। পশ্চিমে মিশর এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রপথে চলাচলকারী বাণিজ্যিক নৌবহরসমূহ আবিসিনিয়ায় এসে যাত্রা বিরতি করত। পূর্ব পশ্চিম উভয় দিকের বণিকরাই এখানকার বাজারে বিপুল পরিমাণে পণ্য বিনিময় করত। এ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিকেন্দ্র হতে বিশ্বের খবর আদান-প্রদানের বিশাল সুযোগ মুসলমানদের হাতে আসে। এটা ছিল আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানসহ মহানবি (স.) এর জন্য ইসলাম প্রচারের সুবর্ণ সুযোগ।

মহানবি (স.) মদীনায় হিজরতের পরবর্তী সময়ে আবিসিনিয়ায় প্রায় সকল মুসলিম মুহাজির মক্কা-মদীনায় ফিরে এলেও আবু ওয়াক্কাস (রা.) [৫৪] আর ফিরে আসেননি। তিনি মহানবি (স.) এর নবুয়তের সপ্তম বছরে হযরত কায়স ইবনে হুযায়ফা (রা.) হযরত ওরওয়াহ ইবনে আছাছা (রা.) এবং হযরত আবু কায়স ইবনে হারেছ (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে নাজ্জাশীর দেয়া একখানা সমুদ্র জাহাজে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক পথে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন।[৫৫] তারা উক্ত জাহাজে প্রথমত ভারতের মালাবারে এসে উপস্থিত হন এবং সেখানকার রাজা চেরুমল পেরুমলসহ বহুসংখ্যক লোককে ইসলামে দীক্ষিত করে চট্টগ্রামে এসে যাত্রা বিরতি করেন। অতঃপর তিনি ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে চীনের ক্যান্টন বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হন।[৫৬] আবু ওয়াক্কাস (রা.) এর দলটি ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে রওয়ানা দিয়ে প্রায় নয় বছর পর চীনে পৌঁছেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এ নয় বছর তারা পথিমধ্যে বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করেছেন। কারণ চীনে আগমনের জন্য আরব দেশ থেকে রওনা করলে বাতাসের গতিবেগের কারণে বিভিন্ন স্থানে নোংগোর করতে হতো। বিশেষত বণিকেরা এক্ষেত্রে মালাবার, চেরর, চট্টগ্রাম, আকিয়াব, চীনের ক্যান্টন প্রভৃতি স্থানে জাহাজ নোঙ্গর করত। অতএব অনুমান করা যায় যে, তিনি মালাবারের পর চট্টগ্রাম ও আকিয়াবেও জাহাজ নোঙ্গর করে ইসলাম প্রচারের কাজ করেছেন এবং সে সূত্রেই হিন্দের (বৃহত্তর ভারতের কোন অঞ্চলের) জনৈক রাজা কর্তৃক মহানবি (স.) এর নিকট হাদিয়া তোহফা প্রেরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবু সাইদ খুদরি (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিন্দের জনৈক শাসক মহানবি (স.) এর কাছে এক পোটলা হাদিয়া প্রেরণ করেছিলেন; যার মধ্যে আদাও ছিল। মহানবি (স.) সাহাবিদেরকে তার (আদার) এক টুকরা করে খেতে দিয়েছিলেন এবং (রাবি বলেন) আমাকেও এক টুকরা খেতে দেয়া হয়েছিল।[৫৭] হিন্দের কোন শাসক মহানবি (স.) এর নিকট হাদিয়া প্রেরণ করেছিলেন সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জান যায়না। তবে রুহমী রাজ্যের[৫৮] শাসকগণ বহুকাল পূর্ব থেকেই ইরানের শাসকের কাছে মূল্যবান হাদিয়া তোহফা প্রেরণ করত। সম্ভবত এ রুহমী রাজাদেরই কোন রাজা মহানবি (স.) এর নিকট হাদিয়া প্রেরণ করেছিল।[৫৯]

নাইম বিন হাম্মাদ এর উদ্ধৃতিতে রুহমী রাজা কর্তৃক খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজকে (৭১৭-৭২০ খ্রি.) চিঠি প্রেরণের তথ্য পাওয়া যায়। সে চিঠিতে বলা হয়েছে রুহমী শাহেন

শাহের পক্ষ থেকে যিনি হাজার বাদশাহর অধস্তন পুরুষ, যার স্ত্রীও হাজার বাদশাহের অধস্তন কন্যা এবং যার হাতিশালায় সহস্র হাতি ও যার রাজ্যে দুটি নহর রয়েছে সেগুলোতে উদ উৎপন্ন হয়। এছাড়া কর্পুর, করমচা ও বাদাম গাছও রয়েছে এবং যার প্রতিপত্তি ১২ শত মাইল দূর থেকেও পাওয়া যায়। এর পক্ষ থেকে আরবের বাদশাহ যিনি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেন না তার প্রতি। অতঃপর আমি আপনার নিকট কিছু হাদিয়া প্রেরণ করছি। বস্তুত এটি হাদিয়া নয় বরং কৃতজ্ঞতা। আমি আশাকরি আপনি আমার নিকট এমন একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যিনি ইসলাম বুঝাবেন ও শুনাবেন। আস সালাম।[৬০] অনুরূপভাবে রুহমীর বাদশাহ কর্তৃক বাগদাদের খলিফা আবু আবদুল্লাহ আল মামুনের নিকট লিখিত চিঠি ও খলিফা মামুন কর্তৃক তার প্রতিউত্তরের বিবরণও পাওয়া যায়।[৬১] এসব বিবরণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবি (স.) এর নবুয়তের পূর্ব থেকেই আরাকানের সাথে আরব বণিকদের যোগাযোগ অব্যাহত ছিল এবং সেই সুবাদেই মহানবির (স.) জীবদ্দশাতেই এ অঞ্চলে ইসলামের সুমহান আদর্শের দাওয়াত পৌঁছে।

আরাকানের চন্দ্র-সূর্য বংশের প্রথম রাজা মহৎ ইঙ্গ চন্দ্র (৭৮৮-৮১০ খ্রি.) ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে বৈশালীতে রাজধানী স্থাপন করে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন। তার উদারনীতির কারণে মুসলমানরা ইসলাম প্রচারের ব্যাপক সুযোগ পায় এবং সে সূত্রেই আরব মুসলিম বণিকগণ রাহাম্বী বন্দরসহ আরাকানের নৌবন্দরসমূহে ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক ও ইসলাম প্রচার মিশন পরিচালনা করতে থাকে।[৬২] এ রাজার শাসনামলেই কয়েকটি আরব মুসলিম বাণিজ্যবহর রামব্রী দ্বীপের পাশে বিধ্বস্ত হলে জাহাজের আরোহীরা রহম বলে চিৎকার করতে থাকে। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাদেরকে উদ্ধার করে রাজার কাছে নিয়ে যায়। রাজা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত আচরণে মুগ্ধ হয়ে আরাকানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দান করেন।[৬৩] আরব বণিকগণ কেউই স্ত্রী-পুত্রসমেত সপরিবারে বাণিজ্য করতে আসেননি। তারা স্থানীয়ভাবে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহিলাদেরকে বিয়ে করে। ফলে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এভাবে অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানের উপকূলীয় অঞ্চল হতে শুরু করে মেঘনা নদীর পূর্ব তীরবর্তী বিস্তীর্ণ বন্দরসমূহ আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এমনকি মুসলমানদের সুমহান আদর্শের প্রতিও শাসকগণ মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। কেননা দ্বিতীয় উমার নামে খ্যাত উমাইয়া খলিফা উমার বিন আবদুল আজিজ (৭১৭-৭২০ খ্রি.) এবং আব্বাসীয় খলিফা মামুনকে (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) রুহমীর রাজা পত্র লিখেছিল। যদি রুহমী বলতে আরাকান বুঝানো হয়ে থাকে তবে তখন আরাকানের শাসক যথাক্রমে রাজা সূর্যক্ষিতি (৭১৪-৭২৩ খ্রি.) এবং সূর্য ইঙ্গ চন্দ্র (৮১০-৮৩০ খ্রি.) কর্তৃক এ পত্রগুলো লেখা হয়েছিল। তাঁদের পত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও মুসলমানদের প্রতি নমনীয়তার প্রমাণ মেলে।

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরব বণিক ও সুফি দরবেশদের মধ্যে বদরুদ্দিন (বদর শাহ)[৬৪] নামে ইসলাম প্রচারক এ অঞ্চলে আসেন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক

আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তার নামানুসারে আসামের সীমা থেকে শুরু করে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে 'বদর মোকাম' নামে মসজিদও নির্মিত হয়েছে।[৬৫] অদ্যাবধি মাঝি মাল্লা ও নাবিকরা বদরকে মাঝি মাল্লার রক্ষাকর্তা বা দরিয়াপির বলে স্মরণ করে থাকে। এভাবে চট্টগ্রাম এবং আরাকানে আগত ও বসতি স্থাপনকারী আরব বণিক সম্প্রদায়, নাবিক, সূফি, দরবেশ শ্রেণী এবং ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে তুর্কী, পাঠান ও মোগলদের শাসনামলে বাংলা থেকে আগত মুসলমানদের সাথে এ অঞ্চলের (চট্টগ্রাম-আরাকান) নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংমিশ্রণ ঘটে এবং তারা ব্যাপকহারে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে। সেইসাথে চট্টগ্রাম অঞ্চল ছিল বাংলা, আরাকান, ত্রিপুরা ও বার্মার লক্ষ্যস্থল এবং আরাকান রাজ্যের অধীনে চট্টগ্রাম দীর্ঘদিন শাসিত হবার ফলে চট্টগ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠী, নবদীক্ষিত মুসলমান, বহিরাগত ইসলাম প্রচারক-বণিক, সুফি-দরবেশ, উলামা সম্প্রদায় অবাধে আরাকানে ইসলাম প্রচারের জন্য যাতায়াত করতেন। ফলে চট্টগ্রামের মতো আরাকানেও একটি ইসলামি পরিবেশ সম্বলিত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। পর্দা প্রথা, খাদ্যাভ্যাস, রান্না পদ্ধতি, এমনকি মানবীয় আচরণেও ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। পরবর্তীতে বরেণ্য পীরদরবেশগণের মধ্যে চকপিউ এর মুন্সী আবদুন নবী, আকিয়াবের শাহ মোনায়েম (বাবাজী), হায়দার আলী শাহ (কাহারু শাহ), নূরুল্লাহ শাহ (কৈলা শাহ), আজল উদ্দীন শাহ (আজলা শাহ) এবং সিরিয়মের পাঁচপির ও কাইয়েমর সরদার পাড়ার সৈয়দ ভ্রাতৃদয়সহ অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য।[৬৬] বদরুদ্দীন বদরে আলম যাহিদী নামক একজন অলী তিন/চারশত অনুগামী ইসলাম প্রচারক নিয়ে ভারতের মিরাঠাবাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তিনি ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে বিহারে চলে যান এবং ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।[৬৭] তারা নানারূপ বিকৃত বৌদ্ধ-হিন্দুয়ানী আচরণ ও প্রথা রহিত করে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সত্যিকারের ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে গড়ে তোলার জন্য আমরণ চেষ্টা করেছেন। এভাবে আরাকানের সামাজিক অবকাঠামোগত ভিত্তিতে ইসলামের সম্পৃক্ততা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১.৩.২ ম্রাউক-উ রাজবংশ থেকে বর্তমান আরাকান

লংগিয়েত রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন রাজাথুর পুত্র মিনসুয়ামুন ওরফে নরমিখলা। তিনি ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় চাচা থিংগাথুকে (১৪০১-১৪০৪) উচ্ছেদ করে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। যুবক নরমিখলা সেখানকার এক সামন্তরাজা অননথিউ (Anan-Thiu) এর বোন সাউবোংগি (Tsau-Bongyo) কে জোরপূর্বক বিয়ে করেন। সামন্তরাজ অননথিউ এ অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে বর্মীরাজ মেঙ শো ওয়াই (Meng-Tshwai 1401-1422) এর সাহায্য কামনা করেন। মেঙ শো ওয়াই রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের নিমিত্তে অননথিউর সাহায্যের নামে ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করেন। এতে আরাকান রাজা নরমিখলা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে বাংলায় নির্বাসিত হন।[৬৮] বর্মীরাজ মেঙ শো ওয়াই আরাকানরাজ নরমিখলাকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে স্বীয় জামাতাকে অনুরথ উপাধি দিয়ে আরাকানের সিংহাসনে বসান।

পেগুরাজ আরাকানকে হাতছাড়া করার পক্ষে ছিলেন না, তাই তিনি আরাকান আক্রমণ করে আরাকানের নতুন রাজা অনুরথকে প্রথমে বন্দী ও পরে হত্যা করেন। এতে বর্মীরাজ ক্ষুব্ধ হয়ে আরাকান আক্রমণ করেন। যুদ্ধে আরাকানের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয় এবং বর্মীরাজ পেগুরাজকে পরাজিত ও আরাকান থেকে বিতাড়িত করে আরাকানের রাজধানী দখল পূর্বক সেখানে একজন নতুন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এই শাসনকর্তা ১৪২৩ সাল পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন।[৬৯] পরবর্তী শাসক সম্বন্ধে সত্যাসত্য তেমন কোন ইতিহাস না পাওয়া গেলেও অনেকে আরাকানী সর্দার চেংকাকে আরাকানের শাসনকর্তা হিসেবে মনে করেন।[৭০] নরমিখলা সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার পূর্ব পর্যন্ত তিনিই আরাকানের শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।

বাংলা আরাকানের প্রতিবেশী রাজ্য হবার সুবাদে নরমিখলা আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়ে খুব সহজেই বাংলার রাজধানী গৌড়ে এসে আশ্রয় প্রার্থী হন। তখন বাংলার শাসক ছিলেন ইলিয়াছ শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১৪ খ্রি.)। তিনি অত্যন্ত নরম ও বিশাল হৃদয়ের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক ছিলেন। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আলিম ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ, সুফী সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, ইসলামি সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে মাদ্রাসা স্থাপন এবং চীন সম্রাটের সাথে দূত বিনিময়ের মাধ্যমে তিনি যেমন প্রজা সাধারণের কাছে প্রিয় ছিলেন তেমনী বৈদেশিকনীতির দিক থেকেও বলিষ্ঠশক্তির অধিকারী ছিলেন।[৭১] তিনি আশ্রয় প্রার্থী রাজা নরমিখলাকে রাজকীয় মর্যাদায় আশ্রয় প্রদান করেন।[৭২] সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ ছিলেন শান্তিকামী শাসক। রাজ্য বিস্তারের প্রতি তার তেমন কোন ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ফলে তিনি নরমিখলাকে তাৎক্ষণিক কোন সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেননি। নরমিখলার জন্য সহযোগিতার অনুকূল পরিবেশ আসতে না আসতেই বাংলার শাসন ক্ষমতা নিয়ে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং মন্ত্রী গণেশের ষড়যন্ত্রে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ নিহত হন।[৭৩]

সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের শাহাদাতের পর রাজা গনেশের বহুমুখী ষড়যন্ত্রের[৭৪] মধ্য দিয়ে প্রায় বিশ বছর অতিবাহিত হয়। এ সময়ে নরমিখলা বাংলার পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতার পরিবেশ পাননি। রাজা গণেশ ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলে তার অপর পুত্র মহেন্দ্রদেব বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মন্ত্রীরা অল্পদিনের মধ্যে তাকে সিংহাসনচ্যুত করে জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ শাহকে পুনরায় সিংহাসনে বসান। সুলতান জালাল উদ্দীন শাহ ইসলামি অনুশাসন .মোতাবেক রাজ্য পরিচালনা করলেও জৌনপুরের সুলতান ইবরাহিম শর্কী বাংলার উপর থেকে ক্রোধকে দমিয়ে রাখতে পারেননি। তাই তিনি ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে আশ্রিত রাজা নরমিখলা বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে জালাল উদ্দীন মুহম্মদ শাহকে সহযোগিতা করেন।

ঐতিহাসিক এপি ফেয়ার নরমিখলার যুদ্ধ কৌশলকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বাংলার সুলতানকে আক্রমণকারী হস্তীবাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী ও শিকারী কুকুর বাহিনীতে সুসজ্জিত ছিল। রাজা নরমিখলা বাংলার প্রতিপক্ষ বাহিনীর অগ্রাভিযানকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বাংলার সেনাবাহিনীকে নানা প্রকার রণকৌশল প্রশিক্ষণ দেন। হস্তী ও অশ্বারোহী বাহিনীর অগ্রাভিযানকে রোধ করার জন্য অভিযান পথে গভীর গর্ত খনন করে তাতে লোহার সুতীক্ষ্ণ নাল পুতে উপরে হালকা কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে তার উপর খড়ের আচ্ছাদনে ঢেকে রাখেন। পরে দেখা গেল যে, হস্তী ও অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণের উদ্দেশ্যে গমন কালেই খাদে পড়ে লোহার নালে বিদ্ধ হয়ে আহত হয় এবং মারা যায়। কুকুর বাহিনীর প্রতিরোধের জন্য কাঁচা মাংশের টুকরোর মধ্যে বড়শীর মত বাঁকানো লোহার সুতীক্ষ্ণ হুইল বা হুক গেঁথে দিয়ে অভিযান পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়। ফলে পথযাত্রী ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো সে মাংস পাওয়া মাত্রই খাওয়া শুরু করে এবং বড়শীর মত সূচ বিদ্ধ হয়ে মারা যায়। রাজা নরমিখলার এ রণকৌশলে জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীর বাহিনী সহজেই পরাজিত হয়। বাংলার সুলতান এতে সন্তুষ্ট হয়ে নরমিখলাকে আরাকান রাজ্য পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।"[৭৫] জৌনপুরের সুলতান নিজ অধিকৃত রাজ্যের কিয়দংশ হারিয়ে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন।[৭৬] নরমিখলা অন্তর্বর্তীকালীন দীর্ঘ ২৪ বছরে আল্লাহর একত্ববাদসহ অংকশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক জ্ঞান অর্জন করেন।[৭৭]

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, নরমিখলা এত উন্নতমানের রণকুশলী হবার পরও কেন বার্মার কাছে পরাজিত হয়েছিল? উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমত; তৎকালীন আরাকানের চেয়ে বার্মা ভূখণ্ডগত দিক থেকে যেমন একটি বৃহত্তম রাজ্য তেমনি সামরিক দিক থেকেও আরাকানের চেয়ে উন্নত ছিল।

দ্বিতীয়ত; রাজা মেংদীর (১২৭৯-১৩৮৫ খ্রি.) পর আরাকানে দক্ষ শাসক কর্তৃক আরাকান শাসিত হয়নি। এ সুযোগে অনেকে জবরদখলকারী হিসেবে আরাকানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। জবরদখলকারী ও উত্তরাধীকারী শাসকদের মধ্যে অবিরাম বহুমুখী দ্বন্দ্বের কারণে রাজ্যের সামরিক শক্তিও লোপ পেয়েছিল। ফলে বার্মারাজ সহজেই সফল হতে পেরেছিল।

তৃতীয়ত; নরমিখলা স্বীয় চাচাকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে নিজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার ফলে চাচা থিংগাথু (১৪০১-১৪০৪ খ্রি.) নরমিখলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এ ধরনের উত্তরাধিকারী দ্বন্দ্ব সামাল দিতে গিয়ে তিনি বার্মার বিরুদ্ধে কোন রণকৌশল প্রয়োগ করতে পারেননি। কিংবা বর্মী রাজা সে ধরনের কোন সুযোগই নরমিখলাকে দেননি। ফলে তিনি রণকুশলী হলেও তা প্রয়োগ করতে পারেন নি।

এদিকে বর্মীরাজ মেঙ শো ওয়াই স্বীয় জামাতা কমারুকে অন'রাটা বা অনুরোধ উপাধি দিয়ে আরাকানের সিংহাসনে বসান।[৭৮] কিন্তু পেগুঁরাজ আরাকান আক্রমণ করে নতুন

রাজা অনুরোথকে প্রথমে বন্দী ও পরে হত্যা করেন। বর্মীরাজ পুনরায় আরাকান আক্রমণ করে বিজয়ী হন এবং আরাকানী সরদার চেংকাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।[৭৯]

বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৫-১৬; ১৪১৮-১৪৩৩ খ্রি.) ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালী খাঁ (বর্মী ইতিহাসে উলু-খেঙ=Ulu-Kheng) কে নরমিখলার সাথে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) সৈন্যসহ প্রেরণ করলে ওয়ালী খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে চেংকা (Tsenka) নামক জনৈক সামন্তের সাথে যোগসাজসে নরমিখলাকে বন্দী করে নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন।[৪০] তবে ওয়ালী খাঁ কোথাকার সুলতান বলে দাবী করেছিলেন এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। সেনাপতি ওয়ালী খাঁ আরাকানের সামন্ত চেংকার সাথে যুক্ত হয়ে আরাকানের ক্ষমতা দখলের বিবরণ পাওয়া গেলেও তার কোন সত্যতার প্রমাণ নেই। কেননা এক রাজ্যে দু'জন রাজা হওয়া যায় না। তাছাড়া শক্তিশালী বার্মারাজাকে পরাজিত করে একজন সেনাপতির পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে একটি রাজ্য বিজয় করা সত্যই কষ্টসাধ্য। মূলত ওয়ালী খাঁ কর্তৃক রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল চট্টগ্রামে। তার প্রবর্তিত মুদ্রার পাঠোদ্ধার সঠিকভাবে করতে না পারায় কেউ কেউ এগুলোকে আরাকানী শাসক মিনবিন বা জবৌকশাহ কর্তৃক প্রচারিত বলে অনুমান করেন। এ মুদ্রাগুলোর প্রথম পিঠে (Obverse) আরাকানী এবং দ্বিতীয় পিঠে (Reverse) ফারসি ভাষায় লিপি উৎকীর্ণ ছিল। মোট প্রকাশিত নয়টি মুদ্রার মধ্যে পাঁচটি এম. রবিনসন (M. Rabinson) এবং এল. এ. শ (L.A. Shaw); একটি মুদ্রা এ.পি. ফেয়ার এবং তিনটি মুদ্রা সান খা আউঙ্গ প্রকাশ করেছেন। মুদ্রাগুলির ওজনে পার্থক্য থাকলেও লিপি অভিন্ন। আকার ১৮ মিলিমিটার এবং ওজন ২.৪০ গ্রাম থেকে ২.৪৭ গ্রাম। মুদ্রার প্রথম পিঠে আরাকানী ভাষায় মিন বি (ন), তিন খ্যা য়্যা; দ্বিতীয় পিঠে ফারসি ভাষায় সুলতান চিত্তাকানু মুবারিজ শাহ (অর্থাৎ চট্টগ্রামের সুলতান মুবারিজ শাহ)। মুদ্রাগুলিতে টাকশালের নাম নাই। তবে এম. রবিনসন এবং এল. এ. শ মুদ্রাগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেন-

> Several coins are known bearing the Arakanese inscription 'Min Bin Tin Khaya' on obverse and a Persian inscription on the reverse. These can be ascribed to the King Min Bin, who acceded to the throne in 1531 A.D. (893 B.E) and reigned for 22 years. Phayre suggested that these coin were struck and issued in Chittagong, shown in the Persian inscription on the coins as Chatiganu, 'which had a large Muslim population.
>
> On of the coins, phyre's Plate 1, No. 25, possibly shown a date 792 or 762, in the Persian legend, which if in the Burmese Era would be 1430 or 1400 A.D., And if it were in the Hizre Era (AH) it would be 1390 or 1361 A.D. none of which are consistent with Arakanese history."[৮১]

অর্থাৎ তাদের মতে এ মুদ্রাগুলি আরাকানের রাজা মিনবিন বা জবৌক শাহ জারী করেছেন। জবৌক শাহ ১৫৩১ থেকে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানের শাসন

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফেয়ারের একটি মুদ্রার সাল পড়া হয়েছে ৭৬২ বা ৭৯২। এ তারিখ মঘী সন হলে ১৪০০ (৭৬২+৬৩৮) বা ১৪৩০ (৭৯২+৬৩৮) খ্রিস্টাব্দ হয় এবং হিজরি সন হলে ১৩৬১ বা ১৩৯০ খ্রিস্টাব্দ হয়। অন্যদিকে যারা মিনবিন পাঠ ধরেছেন তাদের মতকে গ্রহণ করা যায় না। কারণ মুদ্রায় 'মিন' শব্দটি পরিষ্কার হলেও 'বিন' শব্দটি পরিষ্কার নয়। এ 'বিন' শব্দটি 'ন' দিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এছাড়া 'মিন' অর্থ রাজা। সুতরাং মুদ্রায় রাজা বলা হলেও তার নামের উল্লেখ নেই। এ বিতর্কিত মুদ্রা ছাড়া মিনবিনের আর কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নি। তাছাড়া মিনবিন এর মুসলিম নাম ছিল জবৌক শাহ কিন্তু এ মুদ্রাগুলিতে রাজার নাম আছে মুবারিজ শাহ। অতএব মিনবিন একই সঙ্গে মুবারিজ শাহ ও জবৌক শাহ উপাধি গ্রহণ করবেন তা বিশ্বাসযোগ্য হবার কোন কারণ নেই। সুতরাং এ মুদ্রাগুলি মিনবিনের নয় এটা সুস্পষ্টভাবে বলা যায়।

প্রফেসর আবদুল করিম বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মুবারিজ শাহ সুলতান চতকঁও - এর নয়টি মুদ্রার পাঠ নতুন করে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণপূর্বক সেনাপতি ওয়ালী খাঁ ও মুবারিজ শাহকে এক ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ করেন। তাঁর মতে সেনাপতি ওয়ালী খাঁ ও নরমিখলা বাংলার সুলতান অধিকৃত চট্টগ্রামে পৌছেন। আরাকানের সামন্ত চেংকা আরাকানকে বাংলার সুলতানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ওয়ালী খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারপূর্বক সেনাপতি ওয়ালী খাঁকে চট্টগ্রামে একটি রাজ্য স্থাপন করতে প্রলোভন দেয়। সেই সাথে ওয়ালি খাঁকে আশ্বস্ত করে যে, বাংলার সুলতানকে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনে বার্মা রাজার সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। সে সূত্রে ওয়ালী খাঁ নরমিখলাকে বন্দী করে এবং নিজে মুবারিজ শাহ সুলতানে চতকঁও উপাধী গ্রহণপূর্বক চট্টগ্রামে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত সে উপলক্ষেই উক্ত মুদ্রাগুলো উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।[৮২] এছাড়া ওয়ালী খাঁ ছিলেন সুলতানের প্রতিনিধি। তিনি রাজ্য স্থাপন করে নিজেকে সুলতানে চতকঁও বলে ঘোষণা করেন। তাঁর স্বাধীন চট্টগ্রাম রাজ্যের স্থায়িত্বকাল ছিল এক বছরেরও কম।

নরমিখলা কৌশলে গৌড়ে পালিয়ে এলে সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ'র সেনাপতি সিন্ধি খানের নেতৃত্বে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) সৈন্য দিয়ে ওয়ালী খাঁনকে শায়েস্তা করে স্বদেশভূমি উদ্ধারের জন্য নরমিখলার সাহায্যে প্রেরণ করেন। তিনি বিশ্বাসঘাতক ওয়ালী খাঁকে পরাজিত ও হত্যা করে তার মাথা কেটে, গায়ের চামড়া খুলে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেন।[৮৩] নরমিখলা সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে লঙ্গিয়েত থেকে ম্রোহং এ রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং ম্রাউক-উ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার করদরাজা হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন।[৮৪] সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার পর নরমিখলা চার বছর (১৪৩০-১৪৩৪ খ্রি:) আরাকানে রাজত্ব করেন। এ সময় থেকে আরাকানরাজ নরমিখলা বাংলার সুলতানদের মত তাঁদের মুদ্রার এক পীঠে ফারসি অক্ষরে কালেমা ও মুসলমানি নাম লেখার রীতি চালু করেন। তাঁর পরবর্তী রাজাগণ বাংলার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়েও

মুদ্রার এক পীঠে ফারসি অক্ষরে কালেমা ও বৌদ্ধ নামের সঙ্গে মুসলমানি নাম ব্যবহার করতেন।[৮৫]

আরাকানের জন্য বিশেষত আরাকানী মুসলমানদের জন্য ম্রাউক-উ-রাজবংশ ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ম্রাউক-উ-রাজবংশ বিশেষ করে ১৪৩০ থেকে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ অবধি দু'শো চুয়ান্ন বছর শাসনামলে শাসকদের বিজ্ঞতাও যেমন ছিল, তেমনি ছিল ইসলাম প্রিয়তা। তাঁরা বাঙালী, আরব, ইরানী কিংবা আরাকানী সব ধরনের মুসলমানকে প্রধানমন্ত্রী, সৈন্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, কাজী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দান করেছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম অমাত্যবর্গের অনন্য ভূমিকা ছাড়াও তাদের আরও একটি বড় অবদান হলো, তারা মুসলিম কবি সাহিত্যিকদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিমূল শক্ত করেছিলেন। মূলত খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলিম প্রভাবে ভরপুর আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবিদের হাতেই বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশ শুরু হয়; যার ফলাফল বহুমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।[৮৬]

শাহাজাদা মুহাম্মদ সুজার আরাকান আশ্রয়কে কেন্দ্র করে ইতিহাসের আরেক অধ্যায়ের সূচনা হয়। মোগল সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.) অসুস্থতার সংবাদ শুনে বাংলার সুবেদার শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি.) রাজমহলে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সিংহাসনের দাবি ঘোষণা করে দিল্লীর মসনদ অধিকারের উদ্দেশ্যে প্রায় ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ বাংলা হতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। আওরঙ্গজেব ও মুরাদ যথাক্রমে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট থেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা দিয়ে স্বসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে রওনা হন। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেনাপতি মীর জুমলার সহায়তায় ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি খাজওয়ার যুদ্ধে সুজাকে পরাজিত করলে তিনি বাংলার দিকে অগ্রসর হন। বিক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করে শাহ সুজা ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল ঢাকায় আগমন করেন। অতঃপর আরাকানরাজ সান্দা থু ধম্মার সাথে যোগাযোগ করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে পরিবার পরিজন ও দেহরক্ষী ছাড়া পাঁচ শতাধিক[৮৭] অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি ও সেনানায়কদের নিয়ে ৬ মে ঢাকা থেকে ভুলুয়ায় যান এবং ৬ দিন পরে ১২ মে আরাকানের রাজার পাঠানো জাহাজে তিনি ৩ জুন কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে দেয়াং পৌঁছেন এবং সেখান থেকে সড়ক পথে যাত্রা করে ২৬ আগষ্ট আরাকানের রাজধানী ম্রোহং পৌঁছেন।[৮৮] মূলত শাহ সুজা আরাকান থেকে মক্কা অথবা তুরস্কে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন।[৮৯] কিন্তু বর্ষাকালে যাত্রা বিপদ সংকুল হেতু শীতকালে তিনি মক্কা যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং আরাকানরাজও তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনুচরসহ তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। আরাকানরাজের সাথে কিছু দিন ভাল সম্পর্ক থাকলেও আরাকানরাজ শাহ সুজার মূল্যবান সম্পদ ও অপূর্ব সুন্দরী কন্যা আমেনা বেগমকে দেখে তার মক্কা পাঠানোর অঙ্গীকার ভুলে আমেনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। মুহাম্মদ সুজা এ প্রস্তাব অস্বীকার করলে আরাকানরাজ বিশ্বাস ভংগ করে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি শাহ সুজা ও পরবর্তীতে তাঁর পরিবার-পরিজনকে হত্যা

করে। অতঃপর তাঁর অনুচরসহ ম্রোহংয়ে বসবাসকারী রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অমানষিক নির্যাতন নেমে আসে; অনেককে হত্যা করে এবং অনেককে কারাগারে নিক্ষেপ করে;[১০] কবি আলাওলও এ সময় কারা বরণ করেছিলেন।[১১]

বাণিজ্য তরীর নাবিকের মাধ্যমে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগষ্ট মীর জুমলা সুজা হত্যার খবর সংগ্রহ করে আওরঙ্গজেব এর নিকট পৌছান। তিনি ভ্রাতৃহত্যার খবর শুনে প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে বাংলার সুবেদার শায়েস্তাখাঁকে আদেশ করেন। তিনি ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি আরাকানী বাহিনী ও জলদস্যুদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম দখল করেন।[১২] এভাবে ম্রাউক-উ-বংশের শাসনকালের সূচনা থেকে শাহ সুজার হত্যাকাণ্ডের সময় পর্যন্ত বাংলাসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের লোক আরাকানে পাড়ি জমায়।

রাজা সান্দা থু ধম্মার মৃত্যুর পর ১৬৮৪ খ্রিঃ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ বোধপয়া কর্তৃক আরাকান দখল পর্যন্ত সেখানকার শাসন ব্যবস্থা মোটেই স্থিতিশীল ছিল না। ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে সান্দাউইজ্যা আরাকানের ক্ষমতায় আসার পর ক্রমশ সামন্তদের ক্ষমতা বেড়ে যেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সামন্তদের নেতৃত্বে গোটা আরাকান ছয়টি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোন সামন্ত শক্তি সঞ্চয় করে রাজধানী ম্রোহং এর ক্ষমতা দখলে উদ্যোগী হলে অন্য সামন্তগণ জোট বেঁধে সে উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়।[১৩] সেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা এত চরমে ওঠে যে, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও কোন্দলের কারণে ইংরেজ কালেক্টর নাথিয়াল বেইটম্যানের আমলে (১৭৭৫-৭৭ খ্রি.) আরাকান থেকে ২,০০০ (দু'হাজার) শরণার্থী চট্টগ্রাম জেলার বারপালং এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কালেক্টর বেইটম্যান তাদেরকে পরগণা, আনন্দপুর, মৌজাচম্বল, পুঁইছড়ি, সোনাছড়ি, লালকোটা ও মানিকপুরে বসতি স্থাপন করার সুযোগ দেন। এ সকল শরণার্থীর মধ্যে ছিলেন তাজ মোহাম্মদ, আতিকুল্লাহ, ঠাকুর চাঁদ, সাদুল্লাহ, আজিজুল্লাহ, ফকির মোহাম্মদ ও রৌশন প্রমুখ।[১৪] তাঁরা নিজেদেরকে আরাকান রাজ্যের জমিদার ও তালুকদার বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। বেইটম্যান তাঁদেরকে চট্টগ্রাম শহরে ডেকে কোম্পানির এলাকায় আশ্রয় গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রত্যুত্তরে তাঁরা বলেন, আরাকানে রাজনৈতিক গোলযোগ শুরু হবার কারণে অনুচরদের নিয়ে কোম্পানির রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন এবং কোম্পানির এলাকায় জমি আবাদ করে বসবাস করতে ইচ্ছুক।[১৫] বেইটম্যান তাঁদেরকে কোম্পানির রাজ্যে বসবাস করার অনুমতি দেন এবং নির্দেশ দেন যে, তারা জয়নগর মহালের অধস্তন জমিদাররূপে পরিগণিত হবে।[১৬] কালেক্টরের এ নির্দেশ তাঁদের মনপুত হয়নি, কেননা তাঁরা গোড়াতেই বলেছিলেন যে, আরাকানে তাঁদের যে পদমর্যাদা ছিল কোম্পানির এলাকায় অধস্তন ভূমিকা গ্রহণ করে তা ক্ষুণ্ন করতে তারা প্রস্তুত নন। এ সময় সদর আদালতের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে চট্টগ্রাম ভ্রমণে এসেছিলেন; তাজ মোহাম্মদ ও অন্যান্য শরণার্থীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি তৎকালীন ফ্রান্সিস ল'কে একখানি দলীল দিয়ে তাঁদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। কিন্তু অচিরেই তাঁদের অনেকেই মৃত্যু মুখে

পতিত হয় এবং তাজ মোহাম্মদ ব্যতীত অন্য সবাই আরাকানে প্রত্যাবর্তন করেন। এমনকি কিছুদিন পর তাজ মোহাম্মদও আরাকানে ফিরে যেতে বাধ্য হন।[৯৭] জমি আবাদে আরাকানীদের এ ব্যর্থতা সম্পর্কে কালেক্টর পাইরাডের ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর এক রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়; মাটি এরূপ জঙ্গলাবৃত শক্ত ঘাসে আচ্ছাদিত ছিল যে, আবাদ করা ছিল খুব কঠিন এবং আরাকানীদের পক্ষে স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য পাওয়া ছিল খুবই কষ্টকর।[৯৮]

বিদ্রোহ, হত্যা ও ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে আরাকানে জনজীবন বিপন্ন ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল অশান্তি ও অনিশ্চয়তা আরাকানীদের মনে শান্তি ও স্থায়িত্বের চেতনা জাগিয়ে তোলে। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে থামাডা (Thamada) নামক রাখ্রীর জনৈক সামন্ত আরাকানের ক্ষমতা দখল করলে অন্যান্য সামন্তগণ হারি (ঘা-থীন ডা)[৯৯] নামক জনৈক সামন্তের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়। হারি তৎকালীন আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজা থামাডাকে অপসারণের মাধ্যমে আরাকানের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে বার্মার করদরাজা হিসেবে রাজ্য শাসনের আশায় বার্মার আলাংপায়া বংশের সাম্রাজ্যবাদী শাসক বোধপায়ার সাথে চুক্তি করে এবং আরাকান আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়।[১০০] আরাকানের রাজনৈতিক বিশৃংখলা ইংরেজ বা ফরাসী শক্তিকে হস্তক্ষেপে উৎসাহিত করতে পারে এবং এতে বার্মার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকায় রাজা বোধপায়া এ আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করে[১০১] ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করে এবং আরাকানীরা সামন্ত রাজাদের অনুপ্রেরণায় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নৃত্যের মাধ্যমে বর্মীদের স্বাগত জানায়।[১০২] আরাকানী রাজা তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরণপণ যুদ্ধ করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যুদ্ধে বর্মী রাজা জয়ী হয় এবং আরাকানকে বার্মার সাথে সংযুক্ত করে। থামাডা পরাজিত হয়ে সপরিবারে নৌকাযোগে চট্টগ্রামে পালিয়ে যাবার সময় বর্মী সেনাদের হাতে ধরা পড়ে এবং তাকে শিরচ্ছেদ করা হয়।[১০৩] বোধপায়া আরাকান বিজয় শেষে হারির সাথে সম্পাদিত চুক্তি অস্বীকার করে আরাকানকে বার্মার অংশ হিসেবে নিয়ে তাকে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পরিবর্তে আরাকানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দান করে।[১০৪] এ পর্যায়ে বোধপায়া আরাকানকে রামরী, স্যান্ডুয়ে, ম্রোহং এবং আরাকান এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত করে স্বমনোনীত চারজন প্রতিনিধির হাতে আরাকানের শাসনভার অর্পণ করেন। এ প্রতিনিধিগণের রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে যে কোন নীতি, ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বর্মীরাজের অনুমোদন ছিল অত্যাবশ্যকীয়।[১০৫]

ক্ষমতা লোভী সামন্তদের অনুপ্রেরণায় আরাকানীরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে পরম আনন্দে বর্মী সৈন্যদের স্বাগত জানালেও এক মাস না যেতেই আনন্দের পরিবর্তে বর্মী সৈন্যদের বর্বরতা, নির্মম উন্মত্ততা ও পাশবিকতার হিংস্র থাবা নেমে আসে। মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ, অনুন্নত বর্মী সৈন্যরা আরাকানের মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে লুন্টন, হত্যা, নির্দোষ মানুষকে বন্দী করে মুক্তিপণ আদায়, এমনকি চরম

নির্যাতনের পর আগুনে পুড়িয়ে মানুষকে হত্যা করত।[১০৬] ত্রাণকর্তা হিসেবে এসে বোধপায়া কয়েক বছরেই আরাকানকে দেউলিয়া করে ফেলে।

বোধপায়ার আরাকান দখল ছিল নিঃসন্দেহে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। তাঁর সৈন্যবাহিনী এত নিষ্ঠুরতা ও জঘন্য চাতুরী করেছিল যে, পরাজিত পলাতক আরাকানী সৈন্যদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে এবং সবাইকে অস্ত্র ফেলে সেনানিবাসে এসে আত্মসমর্পণ করে নিরাপদে নিজ নিজ ঘরবাড়ীতে থাকার সুযোগ লাভের উপদেশ দেয়। কিন্তু সৈন্যরা সেনানিবাসে এসে আত্মসমর্পণ করলে বর্মী সেনারা সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এছাড়াও বর্মীরাজ ব্যাপক হারে আরাকানীদের গ্রেফতার করে স্ত্রী লোকদের বার্মায় পাঠিয়ে দেয় এবং পুরুষদেরকে হত্যা করে।[১০৭] শুধু ১৭৮৫ সালে আরাকান দখল করার সময়ই বর্মী শাসকশ্রেণী প্রায় বিশ হাজার আরাকানীকে হত্যা করে এবং কয়েক লক্ষ আরাকানী প্রাণ ভয়ে চট্টগ্রাম জেলায় পালিয়ে আসে।[১০৮]

আরাকান বিজয় সাম্রাজ্যবাদী বোধপায়াকে দিগ্বীজয়ে উৎসাহিত করে এবং ১৭৮৬ সালে বার্মার দক্ষিণ পশ্চিম প্রতিবেশী রাজ্য শ্যাম (বর্তমানে থাইল্যান্ড) দখলের মনোভাব পোষণ করে।[১০৯] এরই পরিপ্রেক্ষিতে বোধপায়া আরাকান থেকে প্রচুর লোক, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ দাবি করে।[১১০] দাবীর অর্ধেক পূরণের অঙ্গীকার করলে হারির বড় ছেলেকে সপরিবারে রাজদরবারে ডেকে হত্যা করে। তাছাড়া এ দাবি আদায়ের জন্য আরাকানীদেরকে একত্রিত করে মরিচ পুড়িয়ে ধুঁয়া দেয়াসহ বিভিন্নভাবে দৈহিক নির্যাতন চালায়।[১১১]

মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব আদায় ছাড়াও শিশুদের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হত। কখন কখনও তিনশ' যুবক একত্র করে রাজস্ব হিসেবে বার্মায় প্রেরণ করা হত।[১১২] বস্তুত আরাকানে ধর্মের নামে জনসাধারণকে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করার যে প্রক্রিয়া বোধপায়া চালু করেছিল সেটা রীতিমত একটি আতংক ও ঘৃণার বিষয়। বর্মীরাজ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রাণদণ্ড দিতেন, বৌদ্ধ সন্যাসীরা এ ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করলে রাজা পাল্টা হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুশাসনের অনেক ধারা সংশোধন করেন এবং সন্যাসীদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করেন।[১১৩] মেইক্‌টিলা হ্রদ পুনঃনির্মাণে ছ'হাজার আরাকানীকে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কেউ ফিরে আসেনি। এছাড়া বার্মার মিনগুনে অবস্থিত পাঁচশ ফুট উঁচু প্যাগোডা নির্মাণে বর্মীরাজ আরাকানীদের বলপূর্বক কাজে নিয়োগ করেন।[১১৪]

নিরীহ আরাকানীদের উপর বর্মী রাজা ও সৈন্যবাহিনীর বহুবিধ অত্যাচার তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলে এবং এ প্রেক্ষিতে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে অত্যাচারিত আরাকানীরা তাদের প্রাক্তন রাজবংশের 'ওয়োমা' নামে জনৈক বংশধরকে রাজা হিসেবে মনোনীত করে বর্মী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যুদ্ধে বহু বর্মীসেনা নিহত হলেও শেষ পর্যন্ত বর্মী সেনাপতি বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হন। এরপর আরাকানীদের উপর অত্যাচার বহুগুণে বেড়ে যায়।[১১৫] প্রত্যক্ষদর্শী এ্যাপোলং নামক জনৈক আরাকানী সর্দার বর্ণনা করেন, বর্মী সেনারা স্ত্রী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে প্রায় দু'লাখ আরকানীকে হত্যা করে এবং

সমসংখ্যককে দাস হিসেবে বার্মায় প্রেরণ করে। যারা এ হত্যাযজ্ঞ হতে বাঁচার আশায় জংগলে পালিয়ে ছিল, তাদেরও অনেককে হয় বর্মী সেনার হাতে নয়তো বাঘের মুখে প্রাণ বির্সজন দিতে হয়েছিল।[১১৬] লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইরাস্কিন বর্মী অত্যাচার সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "বর্মীরা বিজীত ও নিরীহদের উপর অত্যাচারের জন্য দায়ী। আমার আদৌ সন্দেহ নেই যে, তারা হাজার হাজার নর-নারী ও শিশুকে সুস্থ মস্তিকে হত্যা করে তাদের বাড়ীঘর জালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে খাদ্য শস্যসহ সম্পদ লুণ্ঠন করেছে।"[১১৭] বর্মীদের হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচার জন্য ১৭৯৮ সালে আরাকানের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক চট্টগ্রাম জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[১১৮] ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালটার হেমিলটন রামুর বার মাইলের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ আরাকানী শরণার্থী দেখে ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[119] আরাকানী উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে প্রত্যুত্তরে তাদের এক সর্দার বলেছিলেন- We will never return to Arakan if you choose to slaughter us here; We are ready to die; if by force to drive away we will go and dwell in the jungle of the mountain which offerds shelter for wild beasts.[১২০]

মূলত বোধপায়ার আরাকান দখলের পর বর্মী সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের শোষণ, অত্যাচার ও হয়রানীর হাত থেকে বেঁচে এক সুস্থ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শান্তিপূর্ণ নিরাপদ পরিবেশে বসবাস করার উদ্দেশ্যে আরাকানী শরণার্থীদের বৃটিশ শাসিত চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।[১২১] বর্মী সেনার অত্যাচারে বিপর্যস্ত ও নিগৃহীত অসংখ্য আরাকানী উদ্বাস্তু নিজেদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে আশ্রয় নেবার পেছনে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান ঃ

প্রথমত, ভৌগোলিক দিক থেকে চট্টগ্রাম আরাকানের সবচেয়ে নিকটতম অঞ্চল। অন্যদিকে বার্মা নিকটতম এলাকা হলেও তা ছিল মূলত একটি শত্রুরাজ্য এবং ভৌগোলিকভাবে আরাকান থেকে বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামের সাথে রয়েছে আরাকানের ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক।

তৃতীয়ত, তুলনামূলকভাবে তৎকালীন পরিস্থিতি আরাকান অপেক্ষা চট্টগ্রামে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা উদ্বাস্তুদের প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা যোগায়।[১২২]

চতুর্থত, আরাকানে ব্যাপক অরাজকতার ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়; অন্যদিকে কোম্পানির রাজ্যে জীবন ধারণের নিশ্চয়তা আরাকানীদের প্রলুব্ধ করে।[১২৩]

আরাকানী উদ্বাস্তুদের মধ্যে সর্দার শ্রেণী চট্টগ্রামকে একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করে আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু করে। সর্দারিদের এ বৈপ্লবিক তৎপরতা তাদের পূর্বের স্বভাবগত প্রবণতার প্রতিশ্রুতি ছিলনা, বরং এটা ছিল বর্মী বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।[১২৪] চট্টগ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তের পাহাড় ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নিয়ে তারা বর্মী অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের

অভিপ্রায়ে আরাকানে অবস্থানরত বর্মীদের উপর আক্রমণ চালাতো।[১২৫] আরাকানরাজ ওয়েমো, চট্টগ্রামের লাহোমরাং, আরাকানী সর্দার এ্যাপোলং এবং সিন পিয়ানের তৎপরতা রাজদ্রোহী মনে হলেও তা ছিল মূলত বর্মীদের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ।[১২৬]

আরাকানের নিহত গভর্নর হারি (ঘা খিন ডা) এর একমাত্র জীবিত পুত্র সিন পিয়ান (Nga Chin Pyan) বর্মীরাজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে রুখে দাঁড়ান। ইংরেজদের নিকট তিনি কিং বেরিং নামে পরিচিত।[১২৭] ১৮১১ সালের প্রথম দিকে বাংলা-বার্মা সীমান্তের মুরুসুগিরি[১২৮] নামক একটি ছোট ভূখণ্ড অধিকারের মধ্য দিয়ে সিন পিয়ানের প্রতিরোধ বা স্বাধিকার আন্দোলন শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহের সূচনা করে।[১২৯] মুরুসুগিরি দখলের প্রেক্ষিতে আরাকান গভর্নর কোম্পানির নিকট তার ভূখণ্ড লুণ্ঠন ও জবর দখলের অভিযোগ করেন।[১৩০] এর ফলে বাংলা-বার্মার মধ্যে ভূমি সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং কোম্পানী চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট পি.ডব্লিউ পিচেলকে এ সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেন। সিন পিয়ান দখলকৃত স্থানটি বাংলার ভূখণ্ড হলেও চট্টগ্রামের স্থানীয় কর্মচারীগণ কর্তৃক ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে পিচেল প্রাথমিকভাবে স্থানটি বর্মীদের বলে স্বীকার করে এবং তিনি বাংলা-বার্মা সম্পর্কের অবনতির আশংকায় সিন পিয়ানকে সীমান্ত এলাকা থেকে বিতাড়িত করার সুপারিশ করেন। কিন্তু পিচেলের এ সুপারিশ কার্যকর হয়নি।[১৩১]

আঠারশ এগার সালের মে মাসের মাঝামাঝি প্রায় রোহিঙ্গাসহ তিন সহস্রাধিক সহযোদ্ধা নিয়ে সিন পিয়ান অতর্কিতভাবে আরাকান আক্রমণ করে মংডু দখল করেন এবং কোম্পানি এলাকায় বসবাসরত জুম চাষিসহ সকল অধিবাসীকে বর্মী ভাষায় লিখিত এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন।[১৩২] কোম্পানি সিন পিয়ানের গ্রেফতারের ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহী না হলেও চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট পিচেল এ ব্যাপারে তৎপর ছিলেন এবং তাঁকে গ্রেফতারের জন্য চাপরাসীও প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু কর্মোদ্যোগ বিলম্বিত হবার কারণে তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[১৩৩] সিন পিয়ানের তৎপরতা বৃদ্ধিতে কোম্পানি বাংলা-বার্মা সম্পর্কের অবনতির আশঙ্কায় অবেশেষে সীমান্তে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে।[১৩৪]

সিন পিয়ানের আহ্বানে আরাকানী উদ্বাস্তুরা স্বাধীন স্বদেশের আশায় তাঁর দলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য আরাকান অভিমুখে যাত্রা করে। পিচেল তাদের যাত্রার কারণ জিজ্ঞেস করলে উদ্বাস্তুরা উত্তর দেয় "আমাদের রাজা আরাকানের কয়েকটা থানা দখল করে ফেলেছেন। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে (২১শে মে ১৮১১) রাজধানী ম্রোহং দখল করে ফেলবেন। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে স্বাধীনতাকামীদের সাথে যোগ দান না করলে আমাদের রাজা আমাদেরকে হত্যা করবেন।"[১৩৫]

সিন পিয়ানের প্রবল আক্রমণে ১৮১১ সালের জুন মাসের মধ্যেই আরাকানের রাজধানী ম্রোহং ছাড়া সমগ্র অঞ্চল বিজয় হয়। অতিবৃষ্টিতে যুদ্ধের তীব্রতা কমে এলে ম্রোহং

অবরোধ করে তাঁরা শহরের বাইরে যুদ্ধ চালাতে থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ সময় সিন পিয়ান বাহিনীর গোলাবারুদ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তিনি কোম্পানির নিকট রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারসহ জন্মভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র পাঠান। কিন্তু গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো সিন পিয়ানের প্রস্তাব দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে তিনি পরাজিত হয়ে বৃটিশ ভূখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১৩৬] সিন পিয়ানের ব্যাপক তৎপরতা ও সফলতায় বর্মী সরকারের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তারা কোম্পানিকে সিন পিয়ানের পরিকল্পনার উদ্যোক্তা হিসেবে সন্দেহ করে।[১৩৭] বর্মীদের এ সন্দেহের অবসানকল্পে গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো বার্মায় ক্যাপ্টেন ক্যানিং এর নেতৃত্বে একটি মিশন প্রেরণ করলে ক্যানিং সিন পিয়ানের তৎপরতায় কোম্পানির নিরপেক্ষ ভূমিকা প্রমাণের সবিশেষ চেষ্টা করেন।[১৩৮]

বিপর্যয়ের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ এক বৎসর প্রস্তুতির পর সিন পিয়ান ১৮১২ সালের জুন মাসে ৬ হাজার সৈন্য নিয়ে নাফ নদী অতিক্রম করে অনায়াসে মংডু ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা জয় করেন।[১৩৯] কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট পিচেল প্রেরিত পূর্বাভাস অনুযায়ী একদল বর্মী সেনার আগমনের ফলে সিন পিয়ানের বাহিনী মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়। সমুদ্র উপকূলে রক্ষিত নৌকাগুলো নিমজ্জিত হবার ফলে সিন পিয়ানের অধিকাংশ সৈন্য পালাতে না পেরে বর্মী সৈন্যের হাতে হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। সিন পিয়ানসহ কিছু অনুসারী পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও তাদের গ্রেফতারের জন্য প্রত্যেককে গ্রেফতারের বিনিময়ে ন্যূনতম এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে পক্ষান্তরে তাদেরকে সাহায্য করলে শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়।[১৪০] কিন্তু আরাকানী রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা কোম্পানির আদেশ অমান্য করেই পলাতক সর্দারদের সাহায্য করে।[১৪১] জন্মভূমির প্রতি অগাধ ভালবাসা ও দরদ নিয়ে সিন পিয়ান পুনরায় বিপর্যস্ত সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করেন। ১৮১২ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে তিনি কক্সবাজার দখল করে সেখানে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন।[১৪২] কোম্পানি পুনরায় কক্সবাজার দখল করে নেয় এবং ১৮১৪ সালে সিন পিয়ান আরাকানে পালিয়ে গিয়ে মংডুর নিকটে ঘাঁটি নির্মাণ করে তাঁর অনুসারীদেরকে সেখানে সমবেত করেন। অতঃপর স্থানীয় আরাকানীদের সহায়তায় মংডু, বুচিদং, রাথিদং দখল করে কালাদান নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে শেষবারের মত যুদ্ধ করে পারজিত হয়ে চট্টগ্রামে আশ্রয় নেন।[১৪৩] বর্মীসেনারা তাদের পিছু ধাওয়া করে চট্টগ্রাম সীমান্ত অতিক্রম করে কোম্পানি এলাকায় চলে আসে। তারা সিন পিয়ানের সাথে কোম্পানির সম্পৃক্ততার অভিযোগে রত্মগিরি ও গর্জানিয়ার গ্রামগুলোতে লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং কয়েকজন আরাকানী উদ্বাস্তুকে অপহরণ করে সীমান্ত হতে পালিয়ে যায়।[১৪৪]

কোম্পানি নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণের সার্বিক প্রক্রিয়া চালু রাখে এবং অবশেষে সিন পিয়ান কর্তৃক কোম্পানিকে প্রদত্ত চিঠি পত্রগুলো ও তৎসংশ্লিষ্ট নথি-পত্রের প্রদর্শনীর মাধ্যমে নিজেদের নিরপেক্ষতা প্রমাণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।[১৪৫] কোম্পানি

নিরপেক্ষতা বজায়ের লক্ষ্যে সিন পিয়ান বাহিনীর উপর নির্যাতনসহ কড়া নজর রাখে অন্যদিকে সিন পিয়ান বাহিনীর মনোবলও ভেঙ্গে যায়। দীর্ঘদিন বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর ফলে সিন পিয়ান শারিরিক ও মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি ১৮১৫ সালের ২৫ জানুয়ারি পোলং চরানের পাহাড়ী এলাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১৪৬]

সিন পিয়ানের মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতার অভাবে তাদের তৎপরতা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং আরাকানী উদ্বাস্তুদের অনেকেই নিজ এলাকায় বিভিন্ন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ বসবাস করতে আগ্রহী হয়। কোম্পানি বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার প্রতি উৎসাহী হবার আশংকায় চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমান্তের পূর্বেকার আশ্রয়ে বসতি স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা জারী করে অন্য যে কোন স্থানে তাদেরকে পুনর্বাসন করার জন্য চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিলেও সেখানে শান্তি স্থাপন সম্ভব হয়নি। কেননা সিন পিয়ানের মৃত্যুর পর ১৮১৬ সালের মে মাসে তার প্রধানসহচর রেইংমিনের নেতৃত্বে আবার আরাকানীদের দল গঠিত হয়। কিন্তু দারিদ্র্য ও প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবে তিনি কোম্পানির নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হন।[১৪৭] ১৮১৬ সালের জুলাই মাসে সিন পিয়ানের জামাতা ও রেইংমিনের প্রধানসহচর চারিপোর তৎপরতা শুরু হয়। ফলে কোম্পানি কিছু সংখ্যক স্বাধীনতাকামীকে গ্রেফতারপূর্বক হত্যা ও ডাকাতির অভিযোগে অনেককে কোর্ট অব সার্কিটে প্রেরণ করে এবং কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে কোম্পানির সমর্থনকারী আরাকানী সর্দারদের অধীনে পুনর্বাসন করে চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।[১৪৮] ১৮১৭ সালের মে মাসে কোম্পানি চারিপোরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় এবং বিদ্রোহীদের বিচার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে সীমান্ত অবস্থা আয়ত্তে আনে।[১৪৯] সিন পিয়ানের সীমিত সামরিক শক্তি, কোম্পানি ও বর্মী দ্বি-শক্তির মোকাবেলা করা এবং এ সময় সীমান্তের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আরাকানীদের জন্মভূমি পুনরুদ্ধারের স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দেয়। সর্বোপরি সিন পিয়ানের মৃত্যুর পর আরাকানীদের মধ্যে সুযোগ্য নেতার অভাব আরাকানীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১৫০]

আরাকানী শরণার্থী সমস্যা সংক্রান্ত সীমান্ত উত্তেজনা কিছুটা প্রশমনের পর ভারতের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বার্মার সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা চালায়। এ সমস্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনামলের শেষের দিকে বার্মার রাজদরবারে বৃটিশ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। এ সকল প্রতিনিধির মধ্যে ১৭৯৪ সালের ৩০শে মার্চ ক্যাপ্টেন জর্জ সোরেলের মিশন ছিল আধাসরকারি পর্যায়ের। অন্যদিকে সরকারি পর্যায়ে ১৭৯৫ ও ১৮০২ সালের ক্যাপ্টেন মাইকেল সাইমস্ দু'বার বার্মায় গমন করেন। ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স ১৭৯৬ সালে, ক্যাপ্টেন টমাস হিল ১৭৯৯ সালে এবং সবশেষে ক্যাপ্টেন ক্যানিংকে ১৮০৩, ১৮০৯ ও ১৮১১ সালে বার্মায় বৃটিশ প্রতিনিধি দলের নেতারূপে প্রেরণ করা হয়। এতে সাময়িক সফলতা মনে হলেও স্থায়ী সুসম্পর্কের পথ নির্মিত হয়নি।[১৫১]

ক্যানিং মিশনের শেষ পর্যায়ে আরাকান সীমান্তে পুনরায় ইংরেজ ও বর্মীদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বর্মীরাজ কর্তৃক আরাকান দখলের পর আশ্রিত উদ্বাস্তুদের মধ্যকার স্বাধীনতাকামীদের গ্রেফতার করার অজুহাতে সশস্ত্র বর্মীরা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই বৃটিশ ভারতীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে ঘন ঘন অভিযান চালাতে থাকে। তারা আরাকান সীমান্তে বিশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে এবং রত্নাপালং (Ratnapalong) নামকস্থানে একটি অনুসন্ধান ফাঁড়িও প্রতিষ্ঠা করে। বর্মীদের এ সমস্ত উস্কানিমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে বৃটিশ প্রশাসন কর্নেল এরস্কিনের নেতৃত্বে পুনরায় বর্মীদের বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করে। তবে বর্মী সেনাপতির সতর্কতা অবলম্বনের ফলে আপাতত সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়। অতঃপর এ সময় অতিবৃষ্টির কারণে বর্মী বাহিনীকে আরাকানের ম্রাউক উ (Mrauk-U) তে প্রত্যাহার করা হয় এবং ইংরেজ বাহিনীকে রামুতে অপসারণ করা হয়।[১৫২]

বৃটিশ-বার্মা সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অবনতি লক্ষ্য করা যায় ১৮১১ সালের পর থেকে আরাকানে সিন পিয়ানের ব্যাপক বৈপ্লবিক তৎপরতাকে কেন্দ্র করে। কেননা সিন পিয়ানের তৎপরতায় কোম্পানির সহযোগিতা রয়েছে বলে বর্মী কর্তৃপক্ষ মনে করে। সিন পিয়ানের মৃত্যুর পর এ অস্বস্তিকর অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটলেও তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং বৃটিশ শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অবমূল্যায়ন করে নিজেদেরকে শক্তিশালী মনে করতে থাকে। মারাঠা যুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ অসুবিধার কারণেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এ সময় চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্তে দৃঢ়নীতি গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিল এ কথা বর্মীরা অনুধাবন করতে পারেনি।[১৫৩]

ক্যাপ্টেন ক্যানিং এর ১৮১১-১২ সালে প্রেরিত তৃতীয় মিশনের পর বার্মায় ইংরেজরা আর কোন মিশন পাঠায়নি। কেবলমাত্র চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় ছিল।[১৫৪] উভয় পক্ষ একে অপরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীরভাবে সন্দিহান ছিল। বহুদিন পর্যন্ত চট্টগ্রামে বর্মীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপক গুজব শোনা যেতে থাকে। এ সময় চট্টগ্রামে বৃটিশ প্রশাসনের নিকট আশ্রিত আরাকানী উদ্বাস্তুদের প্রত্যার্পণ এবং চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার এলাকাকে সাবেক আরাকানী ভূ-খণ্ডের অধীনস্থ ছিল বলে উদ্ধৃতি দিয়ে এ সমস্ত অঞ্চলের উপর বর্মীদের দাবী সংক্রান্ত চিঠি আসতে থাকে।[১৫৫] এমনকি এক সময় উল্লেখিত জেলাগুলোর রাজস্ব বর্মী কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেবার আদেশ দান করেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কোলকাতায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বার্মার সাথে সব সময় শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌছার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। অধিকন্তু কোম্পানি এ কথা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, বার্মার রাজদরবার বৃটিশ সামরিক ও নৌশক্তি সম্পর্কে এত বেশি অজ্ঞ যে তারা কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। ভারতে মারাঠাদের ভয় দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়াই ছিল কোম্পানির এ সময়ের নীতি। এ নীতি বোধপায়ার জীবিত কালে কার্যকর থাকলেও ১৮১৯ সালে বোধপায়ার মৃত্যুর পর তার দৌহিত্র বা'জীদের যুদ্ধবাজ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের উদ্ধতপূর্ণ যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের কারণে উভয়

পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।[১৫৬] এদিকে ১৮২১ সালের প্রথম দিক থেকে চট্টগ্রাম সীমান্তের বিভিন্ন ঘটনা কোম্পানিকে উত্তেজিত করে তোলে। বিশেষ করে বর্মী সৈন্যরা ১৮২১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলার ভূখণ্ড হতে ২৫ জন হাতি শিকারীকে অপহরণ করে কারারুদ্ধ করে এবং মুরসী নদী ও গর্জানিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা নিজেদের হিসেবে দাবী করে।[১৫৭] একদল বর্মীসেনা ১৮২১ সালের ৪ঠা নভেম্বর আসাম সীমান্তে বাংলার হাবরাঘাট পরগণা আক্রমণ করলে জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এলাকা ত্যাগ করে। এর প্রেক্ষিতে ডেভিট স্কট বর্মী কমান্ডিং অফিসারের নিকট দোষী ব্যক্তিদের প্রত্যার্পণ দাবী করেন। কিন্তু বর্মী কমান্ডিং অফিসার এ কথার গুরুত্ব দেয়নি বরং বর্মী বাহিনী পুনরায় আসাম সীমান্তবর্তী বাংলার কয়েকটি গ্রাম আক্রমণ করে লুটতরাজ চালায়।[১৫৮]

পরবর্তী পর্যায়ে নাফ এলাকায় বর্মীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৮২৩ সালের জানুয়ারি মাসে কোম্পানির কতিপয় নাগরিকসহ চালবোঝাই নৌকা নীলার নিকটবর্তী স্থান অতিক্রম করার সময় বর্মীরা উপশুল্ক দাবী করে এবং এ দাবী প্রত্যাখ্যাত হলে তারা নৌকার উপর গুলি চালিয়ে একজন মাঝিকে হত্যা করে।[১৫৯] এ ঘটনার পর পরই বর্মীরা আরাকান সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে। কোম্পানি টেকনাফের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য টেকনাফে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে শাহপুরীতে সৈন্যদল প্রেরণ করলে আরাকানের গভর্নর কোম্পানির গভর্নর জেনারেলের কাছে একখানা পত্রে শাহপুরীকে তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড 'মেইন-মা-বু' হিসেবে দাবী করেন এবং ঐ অঞ্চল হতে কোম্পানির সৈন্য অপসারণের দাবী জানান। কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড আর্মহার্স্ট এ দাবীকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং অনুকূল পরিবেশে বাংলার দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনার জন্য কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের নিশ্চয়তা দান করেন। এ পর্যায়ে একজন পদস্থ আরাকানী এজেন্ট নিয়োগের জন্য তিনি আরাকানের গভর্নরের নিকট প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু এ প্রস্তাব তার নিকট পৌঁছার পূর্বেই ঐ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এক হাজার বর্মী সৈন্য অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে কোম্পানির কতিপয় সৈন্যকে নিহত ও আহত করে শাহপুরী দখল করে।[১৬০] কোম্পানি পুনরায় ঐ সালের ২১ নভেম্বর এক অভিযান পরিচালনা করে শাহপুরী পুনরুদ্ধার করে[১৬১] এবং সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে রবার্টসনকে নিয়োগ দান করে। সেখানে প্রতিকূল পরিবেশে সৈন্যগণ জ্বরে আক্রান্ত হলে ১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ম্যাজিস্ট্রেটের সুপারিশে কোম্পানি শাহপুরী হতে সৈন্য অপসারণ করে।[১৬২] এ সুযোগে বর্মী বাহিনী সুকৌশলে শাহপুরী পুনরাধিকার করে। কোম্পানি এ বিষয়ে বার্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বর্মী কর্তৃপক্ষ একজন দোভাষীর মাধ্যমে কোম্পানির সামরিক ও নৌবাহিনীর কর্মচারীদের এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আরাকানের মংডুতে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার আমন্ত্রণ জানায়। কোম্পানির সামরিক কর্মচারীগণ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও নৌবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারী এবং কমান্ডার চিউ ও রয়েস প্রস্তাবে রাজী হন। আটজন লস্কর ও কোম্পানির

জাহাজ 'সোফিয়া'কে নিয়ে মংডু পৌঁছলে বর্মী সৈন্যরা জাহাজ আটকপূর্বক তাদেরকে গ্রেফতার করে লংদু'র প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠায়।[১৬৩]

এ ইস্যুতে ক্রমশ সীমান্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আত্মগর্বী বর্মী সেনানায়ক মহাবান্দুলা চট্টগ্রামে একটি আক্রমণ পরিচালনা করেন। ফলে গভর্নর জেনারেল লর্ড আর্মহার্ষ্ট অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, বর্মীরা প্রত্যক্ষভাবেই কোম্পানির সাথে যুদ্ধরত। এ প্রেক্ষিতে ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ফোর্ট উইলিয়াম হতে ১৮২৪ সালের ৫ মার্চ বার্মার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কোম্পানির সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ লিপ্সা ও বার্মার জংগী মনোভাবের প্রতিফলনই ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধের অন্যতম কারণ।[১৬৪]

ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের প্রথম দিকেই আসাম, কাছাড় ও আরাকানে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮২৪ সালের মে মাসের শুরুর দিকে বর্মী সেনাপতি মহাবান্দুলার নেতৃত্বে বর্মী সৈন্যরা বাংলা দখল করার মানসে আরাকানে অবস্থান করছিল। যুদ্ধ শুরু হবার পর তারা নাফ নদী অতিক্রম করে রামুর ১৪ মাইল দক্ষিণে রত্মাপালং-এ অবস্থান গ্রহণ করে। ইংরেজ ক্যাপ্টেন মর্টন (Captain Morton) তিন'শ নেটিভ পদাতিক বাহিনী নিয়ে অগ্রসরমান বর্মী বাহিনীর মোকাবেলার চেষ্টা করলে দশ হাজার সৈন্যের বর্মী বাহিনী তাকে পরাজিত এবং হত্যা করে। মহাবান্দুলার এ বিজয়ের ফলে সারা চট্টগ্রামে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।[১৬৫] ওদিকে ১৮২৪ সালের ১২ মে বর্মীদের সম্পূর্ণভাবে বিস্মিত করে দিয়ে ইংরেজরা রেঙ্গুন দখল করে নেয়। থোন বা উংগি এবং কিউংগি নামক দুই বর্মী সেনানায়ক ইংরেজদের অগ্রযাত্রায় বাধা দানে ব্যর্থ হলে সেনাপতি মহাবান্দুলাকে আরাকান থেকে ডেকে পাঠানো হয় এবং তাকে প্রচুর সম্মানে ভূষিত করে জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে দেবার জন্য প্রেরণ করা হয়। বান্দুলা এ সময় আস্ফালন করে রাজকুমার থারাওয়াদীকে বলেছিল- "In eight days I shall diney in the public hall at Rangoon and afterwards return thanks at the Shwe Dagon Pagoda."[১৬৬] বান্দুলা ষাট হাজার পদাতিক সৈন্য এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গোলন্দাজ সেনাসহ রেঙ্গুনের দিকে অগ্রসর হয়ে অর্ধবৃত্ত আকারে কেসেনদাইন থেকে পাজুনগং নদী পর্যন্ত নিজের সৈন্যদের বুহ্য রচনা করে বৃটিশ বাহিনীর মোকাবেলা করতে থাকে।[১৬৭] আরাকান থেকে বান্দুলাকে ডেকে পাঠানো এবং স্যার আর্চিবল্ড ক্যাম্পবেলের বাহিনী দীর্ঘকাল যাবৎ রেঙ্গনে অবস্থান করার ফলে কোলকাতার বৃটিশ প্রশাসনকে আরাকান-ইয়োমা গিরিপথের মধ্য দিয়ে আরাকানের অভ্যন্তরে যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটানোর বিষয়ে উৎসাহিত করে তোলে। এর ফলে ১৮২৫ সালের জানুয়ারি মাসে জেনারেল মরিসণের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী আরাকানে অনুপ্রবেশ করে এবং শীঘ্রই আরাকানের রাজধানী ম্রোহংয়ে পৌঁছায়। এ

অভিযানে একটি স্থল বাহিনী এবং ছোট জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত নৌবহর অংশ গ্রহণ করে। ফলে সহজেই বৃটিশ সৈন্যরা আরাকানের রাজধানী দখল করে। এরপর বৃটিশ বাহিনী দক্ষিণ দিকে স্যান্ডুয়ে এবং চেদুবা দখলের জন্য অগ্রসর হয় এবং কিছু সৈন্য আরাকানের রাজধানীতে অবস্থান করতে থাকে। বর্ষার শেষে ভারত থেকে আরাকানে পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র, রসদ এবং নতুন সৈন্যদের আগমন ঘটলে জেনারেল মরিসন বিনা বাধায় দ্রুত সমস্ত আরাকান দখল করেন। ১৮২৫ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই সমস্ত আরাকান বৃটিশ দখলাধীনে আসে।[১৬৮] ১৮২৫ সালের ১ এপ্রিল দানবুতে বোমা বিস্ফোরণে বান্দুলা মৃত্যু বরণ করার পর ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্মী সেনা নায়ক মহা নেমিও (Maha Nemyo) প্রোমের যুদ্ধে পরাজিত হলেও বায়জীদ পরাজয় স্বীকার করে চুক্তি স্বাক্ষরে রাজী ছিলেন না।[১৬৯] অতঃপর বৃটিশের চাপের মুখে অসহায়, বিপর্যস্ত ও ভীত সন্ত্রস্ত বর্মীদের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শান্তি প্রস্তাব মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অবশেষে ১৮২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রেঙ্গুন থেকে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত ইয়ান্দাবু (Yandaboo) গ্রামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[১৭০] চুক্তির ধারা অনুসারে বর্মীরাজ -

এক, আসাম এবং এর অধীনস্থ এলাকা ও মণিপুরের উপর থেকে সমস্ত দাবী প্রত্যাহার করে।

দুই, বর্মীরাজ ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আরাকান এবং টেনাসেরিম প্রদেশ ছেড়ে দিতে রাজি হয়।

তিন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ইংরেজকে এক মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং দিতে বাধ্য হয়।

চার, এই মর্মে ঐকমত্যে পৌঁছে যে, আভাতে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট অবস্থান করবেন এবং কোলকাতায় একজন বর্মীদূত স্থায়ীভাবে অবস্থান করবেন।[১৭১] এ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইংরেজদের সফলতা অর্জন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে D.P. Singhal বলেন-

> They (The British) got much more by military power than they had asked for through diplomatic negotiations. Their diplomatic ventures to establish a permanent misson at the court of Ava were previously rejected by the king of Burma, but now under the terms of the Yandabo Treaty they obtained the right to send their acceredited representatives to Ava, accompanied by a military escort. In fact, the Treaty provided for the mutual exchange of permanent diplomatic missions.[১৭২]

প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের মাধ্যমে বৃটিশ আরাকান দখল করে নিলেও শুরুতেই সেখানে কোন সুস্পষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। এ যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ সম্পাদিত ইয়ান্দাবুর চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নে বর্মী কর্তৃপক্ষ কালক্ষেপণ করতে থাকলে দীর্ঘ ২৬ বছর যাবৎ ইঙ্গ-বর্মীর অবনতিশীল রাজনৈতিক সম্পর্কের ফলশ্রুতি হিসেবে

১৮৫২-৫৩ সালের যুদ্ধে ইংরেজরা বার্মার সমৃদ্ধশালী পেগু প্রদেশটি দখল করে নেয়। ফলে বার্মার অবশিষ্টাংশ একটি স্থল বেষ্টিত দেশে পরিণত হয়। অধিকন্তু বিভিন্ন বন্দর ও সমৃদ্ধশালী পেগু প্রদেশ হাতছাড়া হবার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে বার্মা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।[১৭৩] মং মং মন্তব্য করেন-

> The Second war marked the beginning of the end of Burma. Her natural wealth was lost in war, all her seaports had been taken, and she could reach the world only by the sufference of the British. The remaining years of the kingdom were a leage of life.[১৭৪]

পেগু দখলের পর বৃটিশরা আরাকান সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠে। অতঃপর তৃতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধে (১৮৫২-১৮৮৫) বিজয়ের মাধ্যমে বার্মা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

তৃতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের (১৮৮৫ খৃ.) মাধ্যমে বার্মায় পুরোপুরিভাবে বৃটিশ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে কাঠামোগত ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

প্রথমত, সমগ্র বার্মা বৃটিশ ভারতের একটি প্রশাসনিক প্রদেশে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, বার্মার রাজধানী পরিবর্তন করে বন্দর নগরী রেঙ্গুনকে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজধানীতে পরিণত করা হয়।

তৃতীয়ত, বর্মী রাজাদের সামন্তবাদী কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে নগরকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়।[১৭৫]

বৃটিশ প্রবর্তিত প্রশাসন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বর্মীদের নিকটে খুবই অপরিচিত ছিল। তাছাড়া বার্মায় জনশক্তির অপ্রতুলতা যেমন ছিল তেমনি ভারতীয়রা ছিল কর্ম সংস্থানের অনুসন্ধানী। ফলে ভারতীয়দেরকে বার্মায় কর্মসংস্থানের জন্য যাবার সুযোগ দেয়া হয়। এমতাবস্থায় প্রাথমিকভাবে ভারতীয়রা সরকারি কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর তল্পীবাহক হিসেবে বার্মায় আগমন করে। এরপর ক্রমশ ব্যবসায়ী, দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক, রেলশ্রমিক, দোকানদার, দোকান কর্মচারী, বন্দরের কুলি, স্কুল শিক্ষক, নৌকার মাঝি, খনি শ্রমিক, ব্যাংক কর্মচারী, পোষ্ট অফিসের কর্মচারী এবং ফেরিওয়ালা প্রভৃতি পেশায় বাংলা ও ভারত থেকে বহু লোকের আগমন ঘটে।[১৭৬]

বৃটিশ কর্তৃক আরাকান জয়ের পর বাংলার আরাকানী উদ্বাস্তুদের ভাগ্যের কিছুটা পটপরিবর্তন হয়। বৃটিশরা আরাকানের পতিত জমির ব্যাবহারের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে ১৮৩৯ সালে আরাকান 'পতিত জমি অধ্যাদেশ আইন ১৮৩৯' এর মাধ্যমে সেখানে আবাদ ও বসতি স্থাপনে আগ্রহী হয়। বৃটিশদের কঠোর খাজনানীতি কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও ১৭৮৫ সালের পর হতে আরাকান থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা ও মগরা পুনরায় সেখানে ফিরে গিয়ে দেশপ্রেমের টানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং অনাহারে অর্ধাহারে থেকে পাহাড়ী রোগ ও হিংস্র জানোয়ারের সাথে যুদ্ধ করে

অমানবিক পরিশ্রমের মাধ্যমে শ্রম বিনিয়োগ করে আরাকানের গভীর অরণ্যে পতিত অঞ্চলসমূহ বাসযোগ্য করে তোলে।[১৭৭] তারপরেও সকল রোহিঙ্গা মুসলমান ও আরাকানী মগ সেখানে ফিরে যায়নি। কারণ এ সময় ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা একই শাসক শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত থাকায় বাংলা ও আরাকানের মধ্যে যাতায়াত-ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যাগুলি দূরীভূত হয় এবং আরাকানীরা বৃটিশ ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কক্সবাজার জেলার হারবাং, মানিকপুর, রামু, কক্সবাজার সদর, খুরুস্কুল, চৌফলদণ্ডী, মহিষখালী, খারাংখালী, নীলা, চৌধুরীপাড়া ও টেকনাফ প্রভৃতি এলাকায় আরাকানী মগদের বসতি আজও বিদ্যমান। তাদের অনেকে বিভিন্ন মওসুমে শ্রমিক হিসেবে কিংবা ব্যবসা করার জন্য আরাকান যেত অতঃপর নিজ বাড়িতে ফিরে আসত।[১৭৮]

যে সব আরাকানী উদ্বাস্তু পুনরায় আরাকানে ফিরে যায়- তাদের গমন ছিল স্বেচ্ছায়, তবে বৃটিশ কিছু সুযোগ সুবিধা দেখিয়ে তাদেরকে আরাকানে যেতে উৎসাহিত করেছে মাত্র। এ ছাড়াও আরো কিছু কারণও বিদ্যমান ছিলঃ-

প্রথমত, বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের সর্বত্র ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরি করার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হবার কারণে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী আরাকানী জনসমষ্টির একটি বিরাট অংশ আরাকানে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে।

দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রাম অঞ্চলে তীব্র বেকার সমস্যা ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে আরাকানের ব্যবসায়িক সুবিধা ও মজুরীর উচ্চহার তাদের নিজ ভূমে যেতে উৎসাহিত করে। ১৮৮৭ সালে বাংলার চট্টগ্রাম জেলার একজন মজুরের দৈনিক গড় মজুরী ছিল ৯ টাকা ১২ আনা। অথচ একই সময়ে আরাকানের আকিয়াবে একজন শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরী ছিল ১৫ টাকা।[১৭৯]

তৃতীয়ত, বাপদাদার বাস্তুভিটার প্রতি প্রত্যেক মানুষেরই আকর্ষণ থাকে। সে আকর্ষণেও অনেকে আরাকানে নিজ বাসভূমে ফিরে যায়। বৃটিশ সরকারের অবাধ শ্রমনীতির ফলে আরাকানী অভিবাসী ছাড়াও বাংলা ও ভারতের অনেক শ্রমিক ব্যবসায়ী ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আরাকানে পাড়ি জমায়। তবে এ সংখ্যা খুব বেশী হবে না।[১৮০]

বার্মা পুরোপুরিভাবে বৃটিশমুক্ত হবার পর সেখানকার বৌদ্ধ নাগরিকদের সুসংঘবদ্ধকরণ, শিক্ষার সম্প্রসারণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে রেঙ্গুন কলেজের ছাত্র-যুবকদের সমন্বয়ে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে Young Men`s Buddhist Association (YMBA) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে সংগঠনটি রাজনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করে। পরবর্তীতে YMBA থেকে General Council of Burmese Association (GCBA) নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮১]

এদিকে বৃটিশ শাসনামলেও বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরাকানসহ বার্মায় মুসলমানদের আগমন ঘটে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বহিরাগত ও স্থানীয় মুসলমানদের

মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য দেখা দেয়। বিশেষ করে আগত মুসলমানরা বাংলা, তেলেগু ও উর্দুসহ নিজ নিজ এলাকার স্থানীয় ভাষায় কথা বলে; পক্ষান্তরে স্থানীয় মুসলমানরা বর্মী ভাষা ব্যবহার করে। এ অবস্থায় স্বকীয়তা বজায় রাখার মানসে অনেকেই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনে অনীহা প্রকাশ করে। অন্যদিকে মগরা অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সুসংঘবদ্ধ হয় এবং গোপনে মুসলিম বিদ্বেষী কার্যকলাপ শুরু করে।[১৮২] এ প্রেক্ষিতে বার্মায় বসবাসরত সকল মুসলমানকে স্থানীয় পরিবেশে অভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে সহায়তার লক্ষ্যে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর উ বা অ (U Bah Oh) নামক রেঙ্গুনের জনৈক মুসলিম ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে 'বার্মা মুসলিম সোসাইটি' গঠিত হয়।[১৮৩] বৃটিশ সরকার কর্তৃক গঠিত তথ্যানুসন্ধানী কমিটিসমূহের নিকট এ সংগঠনটি বার্মার মুসলমানদের একক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পেশ করে। বিশেষ করে ১৯১৬ এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে লর্ড চেমস্ ফোর্ড ভারত শাসন আইন সংস্কারের লক্ষ্যে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বার্মায় আসে। তখন এ সোসাইটির পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিভিন্ন দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করে আইন পরিষদে (Legislative Council) মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দানের জন্য অনুরোধ জানায়। এছাড়াও ভারত শাসন আইনের অধীনে গঠিত সাইমন কমিশন গঠিত হলে তাতেও এ সোসাইটি স্মারকলিপি প্রদান করে। পরবর্তী কালেও মুসলমানদের মধ্যে জনকল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৮৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বার্মার গ্রামীণ জীবনে দুর্দিন নেমে আসে। কৃষকরা ধান-চালসহ কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এ সময়ে ভারতীয় হিন্দু সুদখোর মহাজনরা সেখানকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বন্ধকী ব্যবসা শুরু করে। ফলে হাজার হাজার কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে ভারতীয় মহাজনদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে শহরে পাড়ি জমায়। কিন্তু শহরের শ্রমিকদের অধিকাংশ ভারতীয় বিধায় তারা বাংলা ও ভারত থেকে আগত মুসলমানসহ সবার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে।[১৮৫] এ থেকে ক্রমশ জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে ওঠে এবং বার্মাকে ভারত শাসন আইন থেকে পৃথক করে দেশ শাসনের ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে DOHBAME ASIAYONE (Our Burman Association) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের কর্মীরা নিজেদের নামের প্রথমে থাকিন (THAKIN)[১৮৬] শব্দটি লিখত বলে জনগণের নিকট এটি 'থাকিন পার্টি' নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীতে এ সংগঠনটি মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।[১৮৭]

আরাকানের মুসলমানগণ ১৯৪২ সালের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানে দু'একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়া ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সর্ব প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছিল এবং সেখানকার মগ সম্প্রদায়ের সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে,

স্থানীয় মগরা ইয়োমা পাহাড়ের উচ্চ শৃংগের অপর পাড়ের বৌদ্ধদের চেয়ে প্রতিবেশী রোহিঙ্গাদেরকে বেশি আপন মনে করতো।[১৮৮] কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে গোটা উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সুবাদে বার্মায় থাকিন পার্টির (Thakin Party) নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে পার্টির নেতৃবৃন্দ আরাকানের মগ নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ক গড়ে মুসলমান-মগদের মাঝে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনতা-উত্তর আরাকানকে বর্মীভুক্ত রাখার পরিকল্পনা করে। তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মগদের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে।[১৮৯] ১৯৩৭ সালে বৃটিশ-ভারত থেকে বৃটিশ বার্মা আলাদা হবার পর বৃটিশ প্রশাসন Home Rule (Local Self Government of 1937) জারি করে বার্মায় অভ্যন্তরীণ স্থানীয় সরকার গঠনের বিষয় অনুমোদনের মাধ্যমে বর্মী নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেয়, ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানী দিয়ে ১৯৩৮ সালে রেঙ্গুনসহ নিচু অংশে (Lower Burma) মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে ৩০,০০০ মুসলমানকে হত্যা করে।[১৯০] এ সূত্র ধরে ১৯৪০ সালে মুসলমানদের উপর বৌদ্ধ ধর্ম ও এর প্রচারক গৌতম বুদ্ধের অবমাননার অভিযোগ এনে থাকিন পার্টি নামে বর্মী জাতীয়তাবাদী চরমপন্থী দল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করে; যার পরিণতি হিসেবেই ১৯৪২ সালে আরাকানে মুসলিম নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হয়।[১৯১]

উনিশ'শ উনচল্লিশ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে থাকিন পার্টির নেতৃবৃন্দ বার্মার স্বাধীনতার অঙ্গীকারের পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশকে সমর্থন না দেবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানালে বৃটিশ সরকার অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাকে গ্রেফতার করে। এ সময় অং সান (Aung San) এর নেতৃত্বে ত্রিশ সদস্যের একটি দল গোপনে জাপানে পালিয়ে গেলে জাপান সরকার এদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেন এবং জাপানের অর্থ, প্রশিক্ষণ ও নিজস্ব তত্ত্বাবধানে Burma Independent Army (BIA) গঠিত হয়।[১৯২] ১৯৪১ সালে জাপানী বাহিনীর সাথে BIA বার্মায় প্রবেশ করে এবং ১৯৪১ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাপানীদের কাছে রেঙ্গুনের পতন ঘটলে BIA এর শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ জাপানী বিমানবাহিনী আকিয়াবের উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে, ফলে অনেক বৃটিশ, গুর্খা, রাজপুত, এবং কারেন সৈন্য নিহত হয়।[১৯৩] জাপানীদের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে বৃটিশ শক্তি আরাকান ছেড়ে পলায়ন করে; ফলে আরাকানে এক প্রশাসনিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এ সময় BIA-এর কিছু সদস্য জাপানী সেনাবাহিনীর সাথে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে আরাকানে এলে স্থানীয় মগরা BIA এর সহযোগিতায় আরাকানের নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনীর অস্ত্র-সস্ত্র হস্তগত করে আকিয়াব, রাছিডং ক্যাকথ, মাব্রা, মিনবিয়া, পুনাজুয়ে, বাহারপাড়া, মহামুনী, পাকটুলিসহ গোটা আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায় যা - '৪২ মাস্যাকার' হিসেবে কুখ্যাত।[১৯৪] নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে হত্যা, লুটতরাজ নারী ধর্ষণসহ গ্রামের

পর গ্রাম জালিয়ে পুড়িয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি, উন্মত্ত হামলাকারীরা মৃত মানুষের মস্তক বর্শার মাথায় বিঁধে তাণ্ডব নৃত্যের মাধ্যমে বিজয়ানন্দ উদযাপন করেছে।[১৯৫] আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লাখ লাখ লোক দুর্গম 'আপক' গিরিপথ দিয়ে উত্তর আরাকানের মংডু, বুচিদং এলাকায় পলায়ন করার সময় পথিমধ্যে হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে; নাফ নদী ছিল নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বনিতাসহ অসংখ্য মুসলমানের লাশে পরিপূর্ণ।[১৯৬] এ সময়ে প্রায় ১ লাখ মুসলমানকে হত্যা এবং প্রায় ৫ লাখ মুসলমানকে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। অনেকে সৌদি আরব, পাকিস্তান, ভারত, ইরান, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমীরাত ও পার্শ্ববর্তী দেশসহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।[১৯৭] বৃটিশ সরকার রংপুরের সুবীরনগরে মুসলিম উদ্বাস্তুদের জন্য উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন করেছিলেন। উত্তর আরাকান হতে বহু দূরে রংপুরের সুবীর নগরে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল।[১৯৮] কক্সবাজারের স্থানীয় প্রশাসন সমুদ্রের উপকূলবর্তী একটি এলাকায় বহু উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন করেছিলেন; যা এখনও 'রিফিউজি ঘোনা' নামে পরিচিত। দেশ স্বাধীন হলেও বার্মা সরকার এ সমস্ত উদ্বাস্তুদের আর স্বদেশে ফিরে নেয়নি।[১৯৯]

জাপানীরা পরিপূর্ণভাবে বার্মা দখলের পর তাদের ফ্যাসিবাদী রূপ ক্রমশ জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করে। ফলে জাতীয়তাবাদীরা বার্মা থেকে জাপানীদের বিতাড়িত করার জন্য ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৯৪৪ সালে Anti-Fascist Organisation (AFO) গঠন করে।[২০০] ১৯৪৫ সালের ১৬ মার্চ Burma National Army (BNA)[২০১] রেংগুনে জাপানীদের সাথে একটি আনুষ্ঠানিক যৌথ প্যারেডে অংশ গ্রহণের পর মহড়া প্রদর্শনের নামে রেংগুন হতে বের হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালের ২৭ মার্চ BNA সারা দেশ ব্যাপী জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। এ সময় William Slim এর নেতৃত্বে বৃটিশ বাহিনী অগ্রসর হতে থাকলে ১৯৪৫ সালের ১৫ই মে জেনারেল অং সান[২০২] BNA এর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলির সাথে দেখা করেন। অতঃপর BNA কে বৃটিশ বাহিনীর সাথে একটি শরিক সেনাবাহিনী হিসেবে মর্যাদা দেবার শর্তে তিনি বৃটিশ কমান্ডারকে জাপানীদের বিরুদ্ধে যৌথ সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ জুন সমগ্র বার্মা বৃটিশদের দখলে আসে এবং ঐ দিন রেঙ্গুনে বৃটিশ বাহিনীর বিজয়ী প্যারেডে BNA-ও অংশ গ্রহণ করে।[২০৩]

ফ্যাসিবাদী জাপানীদের অধিকৃত বার্মায় স্থগিত থাকা বৃটিশের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় শুরু হলে দখল পূর্ব ১৯৪৫ সালের মে মাসে শ্বেতপত্রের মাধ্যমে ঘোষিত ভবিষ্যৎ নীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ ঘোষণায় বলা হয়েছিল, বার্মায় সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ কর্তৃক আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হলে একটি সর্বজন সম্মত সংবিধান রচনার পর বার্মাকে ডমিনিয়ন মর্যাদা (Domunion Status) দেয়া হবে। কিন্তু সীমান্তবর্তী ও পাহাড়ী জাতিসমূহ যথা, শান, কারেন, কায়া, মন, চিন,

কাচিন প্রভৃতি বার্মার সাথে স্বেচ্ছায় যোগদান করতে না চাইলে এ সমস্ত এলাকা বার্মার ডমিনিয়ন মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত হবে না।[২০৪] এমতাবস্থায় বার্মা পুনরায় বৃটিশ দখলীভুক্ত হলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বিশেষত অং সান 'সর্ব বার্মাভিত্তিক' রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে BNA থেকে পদত্যাগ করে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং AFO কে সর্ব বার্মাভিত্তিক রূপ দিয়ে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে Anti Fascist Peoples Freedom League (AFPFL) প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় জেনারেল অংসানকে রেংগুনস্থ বৃটিশ গভর্নর জেনারেলের অধীনে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।[২০৫] AFPFL প্রতিষ্ঠার ৪ মাস পর ১৯৪৫ সালের ২৪-২৬ ডিসেম্বর বার্মার সকল মুসলিম সংগঠনকে একীভূত করে সকল মুসলমানকে বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভিন্ন স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে Pyinmana নামক স্থানে সর্ব বার্মাভিত্তিক মুসলিম সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে সিয়াজী উ আবদুর রাজ্জাক Burma Muslim Congress (BMC) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই এর সভাপতি নির্বাচিত হন। অতঃপর একে AFPFLএর অংগ সংগঠনরূপে ঘোষণা দেয়া হয়।[২০৬] তিনি General Council of Burma Muslisn Associations (GCBMA)[২০৭] কর্তৃক বার্মা সংবিধানে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র অধিকার ঘোষণার দাবীকে অযৌক্তি বলে অভিহিত করেন এবং এর মাধ্যমে মুসলমানেরা স্থায়ীভাবে বার্মার মূল ধারা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে GCBMA কে BMC এর পদাংক অনুসরণ করে AFPFLএ যোগদানের পরামর্শ দান করেন।[২০৮]

বৃটিশ প্রদত্ত শর্ত পূরণের জন্য জেনারেল অং সান সারা দেশব্যাপী সফর করেন। সীমান্তবর্তী ও পাহাড়ী জাতিসমূহ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে বর্মী জাতির সাথে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেও অং সান অবশেষে তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, বার্মার স্বাধীনতার জন্যই প্রাথমিকভাবে সবাইকে ইউনিয়নে থাকতে হবে। জাতিগত ও রাজ্যগত স্বায়ত্তশাসনের কথা পরে বিবেচনা করা হবে। অন্যদিকে আরাকানে এসে মগ নেতাদের বুঝাতে সক্ষম হন যে, এ মুহূর্তে স্বায়ত্তশাসনের চিন্তা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকলেই সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করা হবে। আরাকানের মুসলমানরা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দুর্বল ও শক্তিহীন হলেই তোমাদের হাতে স্বায়ত্তশাসন ন্যস্ত করা হবে।[২০৯]

বার্মার সকল জাতিগোষ্ঠীকে ঐকমত্যে আনা এবং স্বাধীনতা উত্তর ভবিষ্যৎ জাতীয় নীতিনির্ধারণ প্রশ্নে আলোচনার্থে জেনারেল অং সান ১৯৪৭ সালের ২-১২ ফেব্রুয়ারি বার্মার শান রাজ্যের অন্তর্গত 'প্যানলং' নামক পার্বত্য শহরে 'প্যানলং জাতীয় সম্মেলনের' আহ্বান করেন। সম্মেলনে সীমান্তবর্তী ও পাহাড়ী জাতিসমূহকে আমন্ত্রণ জানালেও আরাকানের মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের কোন প্রতিনিধিকে আহ্বান না করে উ অং জান ওয়াই (U Aung Zan Wai) নামক জনৈক মগকে আরাকান জাতিসত্তা

ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্যানলং সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, বৃটিশদের কাছ থেকে Union of Burma-এর স্বাধীনতা আদায়ের মাধ্যমেই সকল জাতিসত্ত্বার স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হবে। সর্ব বার্মার সকল জাতির প্রতিনিধিকে নিয়ে Union of Burma-এর ফেডারেল সরকার গঠিত হবে। স্বাধীনতার দশ বছর পর সান এবং কায়া জাতি ইচ্ছা করলে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাবে। সকল জাতির স্বকীয় অধিকার ঐতিহ্য, ভাষা-ধর্ম প্রভৃতি সুনিশ্চিত করার জন্য ফেডারেল সরকার ওয়াদাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু এক সময়ের স্বাধীন সার্বভৌম ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজ্য আরাকানের মগ প্রতিনিধি সম্মেলনে আরাকানের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কোন প্রস্তাব কিংবা কোন প্রশ্নই উত্থাপন করেন নি;[২১০] যা অং সান ও মগদের গোপন আঁতাতের রাজনৈতিক কৌশলের ফলশ্রুতি বলেই রোহিঙ্গা নেতৃবৃন্দসহ অনেকে মনে করেন।

প্যানলং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বাধীন বার্মা ইউনিয়নের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে উ চান টুনকে উপদেষ্টা মনোনয়ন করে একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যেই ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা চলাকালে জেনারেল অং সান, উ আবদুর রাজ্জাকসহ সাতজন শীর্ষস্থানীয় নেতা আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে উ নু বার্মার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হন।[২১১] ১৯৪৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি GCBMA নেতৃবৃন্দ বৃটিশ গভর্নর সমীপে বার্মা ইউনিয়নের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়ায় মুসলমানদের অধিকার বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধিকারনামা ঘোষণার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে ব্যর্থ হলেও পুনরায় ১৯৪৭ সালের ৪ আগষ্ট প্রস্তাবিত সংবিধানে একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে বার্মার মুসলমানদের স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে বার্মার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী উ নু'র কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। ২ অক্টোবর সংবিধান প্রণয়ন কমিটির উপদেষ্টা উ চান টুন GCBMA এর সভাপতি বরাবরে প্রেরিত চিঠির উত্তরে উল্লেখ করেন "বার্মা ইউনিয়নের সংবিধান অনুসারে যে সমস্ত মুসলমান বার্মায় জন্ম গ্রহণ করেছে, বার্মায় লালিত পালিত হয়েছে, বার্মায় শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং যাদের পিতা-মাতা অথবা পিতা-মাতার যে কোন একজন বার্মার নাগরিক তাদের সবাই বার্মার নাগরিক।"[২১২] কিন্তু GCBMA নেতৃবৃন্দ এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা মনে করে যে, সংখ্যালঘু হবার কারণে বার্মার মুসলমানগণ যে কোন আইন পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হবার সুযোগ লাভ করবেনা। তাই সংস্থার পক্ষ থেকে সংবিধানের ৮৭ নং অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থার মত মুসলমানদের জন্যও সংখ্যালঘু হিসেবে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেবার জন্য অনুরোধ জানানো হলেও সরকারিভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।[২১৩]

বার্মা ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বৃটিশের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। অতঃপর ১৯ নভেম্বর বার্মার অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত মুসলমানদের নিরাপত্তা ও

সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানিয়ে GCBMA এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।[২১৪] প্যানলং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শান, কাচিন, কায়া, কারেন ও চিন রাজ্যগুলো অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ঐ রাজ্যগুলোর মতই আরাকান পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তা অধ্যুষিত রাজ্য হয়েও বোধপায়া কর্তৃক দখলীভুক্ত আরাকানের এক ইঞ্চিও শৃংখল মুক্ত হয়নি। যে স্বপ্ন আর প্রত্যাশায় মুসলমানরা স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় নেতা জেনারেল অং সানকে সমর্থন দিয়েছিল, শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ, মুসলমানদের ধর্মচ্যুতিকরণ ও সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের নামে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিনাশ সাধন করে ব্যাপকভাবে বর্মীকরণ প্রক্রিয়ায় তাদের সে প্রত্যাশা গভীর হতাশায় রূপান্তরিত হয়।[২১৫]

স্বাধীনতার পর সাময়িক সংকট কেটে বার্মা ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন কর্তৃক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মোতাবেক জনপ্রতিনিধিত্বশীল, জবাবদিহিমূলক শাসনতন্ত্রের অধীনে শাসিত হয়েও মুসলমানরা মানবাধিকার ফিরে পায়নি; বরং জাতিগত রোষানলে পড়ে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়।[২১৬] বার্মা কর্তৃপক্ষ ১৯৪৭ সালে নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিষদ নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রণীত ভোটার তালিকায় 'সন্দেহজনক নাগরিক' অজুহাতে আরাকানের মুসলিম অধ্যুষিত জনপদগুলোকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়। বার্মার প্রথম প্রধানমন্ত্রী উ নু'র মত ব্যক্তিত্ব আরাকানে মুসলমানদের প্রতি সর্বজনীন সুনজর প্রয়োগ করতে পারেননি; বরং ন্যূনতম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন। উ নু'র শাসনকালে স্বাধীনতার পর পরই ১৯৪৮ সালে আরাকান থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন ও তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি সৃষ্টির পদক্ষেপ হিসেবে আকিয়াবের মগ ডেপুটি কমিশনার ক্যাইউ (Kyawu) এর নেতৃত্বে ৯৯% মগদের নিয়ে ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের অধীনে তদন্তের নামে Burma Territorial Force (BTF) গঠিত হয়। BTF উত্তর আরাকানের বুদ্ধিজীবী, গ্রাম্য প্রধান, উলামা এবং হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করে এবং মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।[২১৭] Mohammed Yunus এর ভাষায় -

> "The BTF Under the direction of the Deputy Commissionar of Akyab district, Kyaw U, a Magh, unleashed a reign of terror in the whole north Arakan. Muslim men-women and children were moved down by machingun fire. Hundreds of intellectuals, vellage elders and Ulema were killed like dogs and rats. Almost all-Muslim villages were razed to the ground. The BTF massacre triggered refugee exodus into the then East Pakistan numbering more than 50,000 people."[২১৮]

মূলত বৃটিশ কর্তৃপক্ষই সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূচনা করেছিল। মুসলমানরা বৃটিশের পক্ষে যুদ্ধ করে জাপানীদের তাড়িয়ে দিলেও তারা প্রচার করে -" Burma for the Budhist Burmans এবং Burmese Muslims are Foreign Immigrants or

kalas"[২১৯] আরাকানে মুসলমানদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের বিরুদ্ধে মগ সম্প্রদায় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এ প্রচারণাকে তুঙ্গে তুলতে থাকলে বর্মী সরকার পরিকল্পিতভাবে উচ্ছেদ অভিযানে নামে। অপর পক্ষে স্বাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মুসলমানরা স্বতন্ত্র কোন নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে না পারায় অপপ্রচার সত্যায়নের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে মুসলমানরা আরাকানের বৈধ নাগরিক হয়েও বার্মার সংবিধানে নৃতাত্তিক বা বুনিয়াদী জাতি হিসেবে তালিকাভুক্তির দাবীতে ব্যর্থ হয়।[২২০] মুসলিম নেতৃবৃন্দ বর্মী সরকারের কাছে '৪২ এর গণহত্যার উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে বিতাড়িত মুসলমানদের স্বীয় বসতবাড়ীতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেবার আবেদন জানালে AFPFL সরকার এসকল দাবী প্রত্যাখ্যান করেন এবং সরকারি চাকরি হতে মুসলমানদের অপসারণ করে তদস্থলে মগদের নিয়োগ শুরু করেন।[২২১] ফলে মুসলমানরা ক্রমশ আন্দোলনমুখী ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

প্রথমে মোহাম্মদ জাফর হুসাইন কাওয়াল[২২২] বা জাফর কাওয়াল নামে আকিয়াবের জনৈক যুবক মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি কাওয়ালী[২২৩] গাইতেন বলে তাঁকে কাওয়াল বলা হয়। তিনি নিজেই রোহিঙ্গা মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে গান রচনা করতেন, গানের মাধ্যমে সরকারের জুলুম সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতেন এবং মুসলমানদের বাঁচার একমাত্র পথ হিসেবে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদানের জন্য মুসলিম যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন।[২২৪] তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই শত শত লোক তাঁর বিপ্লবাত্মক গান শুনে মুজাহিদ আন্দোলনে[২২৫] যোগদান করত। ১৯৫০ সালের ১১ অক্টোবর আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হলে মোহাম্মদ আব্বাস[২২৬] এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। আন্দোলন যত তীব্রতর হয়, সরকারের পক্ষ থেকে কৌশলগত বিরোধিতাও তত বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের পাশাপাশি কারেন জাতির একটি সশস্ত্রদল তাদের স্বাধীন আবাসভূমির দাবীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আরাকানের মগ সম্প্রদায়ের একটি দল আরাকানের স্বাধীনতার দাবীতে Arakan National Liberation Party নামে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। স্বাধীনতা উত্তর দশ বৎসর পূর্ণ না হতেই প্যানলং সম্মেলনের শর্ত বাস্তবায়নের জন্য শান ও কায়া জাতি কেন্দ্রীয় সরকার হতে বিচ্ছিন্ন হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। মুসলমানদের মুজাহিদ আন্দোলন সফলতার সাথে এগুতে থাকলে আব্বাসের নেতৃত্বাধীন বাহিনী হতে দলত্যাগী কিছু স্বাধীনতাকামী মোহাম্মদ কাসিম[২২৭] (প্রকাশ কাসিম রাজার) নেতৃত্বে Rohingya Libaration Front (RLF) নামে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। মুসলমানদের আন্দোলনের প্রভাব বাড়তে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের মুজাহিদ আন্দোলনকে বন্ধ করার প্রথম রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ১৯৫৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় প্রধানমন্ত্রী উ নু রেডিও'র মাধ্যমে তাদেরকে স্বদেশী (Indigenous Ethnic Community) হিসেবে ঘোষণা করেন। এছাড়া তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ ও চাকরিতে নিয়োগের কথা বলা হয়, বার্মা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত দু'বার রোহিঙ্গা ভাষায় প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়। পার্লামেন্ট ও অন্য সশস্ত্র বাহিনী

১৯৫৪ সালের মধ্যে মংডু, বুচিদং ও রাথিডংসহ উত্তর আরাকানের ৮০% এলাকা বর্মী শাসনমুক্ত করানোসহ অন্যান্য সংস্থায় রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হয় এবং ৫৭'এর নির্বাচনে রোহিঙ্গা মুসলমানরা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে সাতটি আসনে পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে বিজয়ী হয়।[২২৮]

এক দিকে শাসক শ্রেণী রোহিঙ্গা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে অপরদিকে একই সময়ে তাদের উপর কঠোরভাবে সামরিক চাপ সৃষ্টি করে এবং Combined Emmigration and Army Operation, Union Military Police Operation প্রভৃতির নামে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায়। দেশের বিশৃংখল পরিস্থিতিতে ১৯৫৮ সালে প্রধানমন্ত্রী উ নু দেশে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল নে-উইনের নেতৃত্বাধীন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশের শাসনভার অর্পণ করেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী উ নু এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।[২২৯] জেনারেল নে উইন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বে এসে আরাকানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বেপরোয়া উচ্ছেদ অভিযান শুরু করলে প্রায় বিশ হাজার মুসলমান সীমান্ত অতিক্রম করে কক্সবাজার এলাকায় পালিয়ে আসে। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জাকির হোসেনের নেতৃত্বে পাকিস্তান-বার্মা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং বর্মীপক্ষ একে আকিয়াবের মগ গোষ্ঠীর একটি সাম্প্রদায়িক কারসাজি বলে অভিহিত করে সকল উদ্বাস্তুকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেয়।[২৩০]

এ উচ্ছেদ অভিযানকালে বার্মার ইমিগ্রেশন পুলিশ মংডু মহকুমা থেকে শতাধিক মুসলমানকে বন্দী করে এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নামায় উল্লেখ করে যে, তারা বার্মার নাগরিক নয়, কেননা তারা পুলিশের কাছে তাদের নাগরিকত্বের সমর্থনে কোন প্রমাণপত্র দেখাতে সক্ষম হয়নি। ইমেগ্রেশন পুলিশ নির্দিষ্ট ফরমে বন্দীদের নাম পূরণ করে বার্মা থেকে তাড়িয়ে দেবার আদেশনামা জারীর জন্য পূরণকৃত ফরম মংডুর মহকুমা প্রশাসনের নিকট উপস্থাপন করে। মহকুমা প্রশাসক আদেশ নামা জারী করে সংশিষ্ট ফরমে দস্তখত করেন এবং বার্মা থেকে বহিষ্কারের আদেশ কার্যকর করার জন্য বন্দীদেরকে রেংগুনে প্রেরণ করেন।[২৩১]

বন্দীদের মধ্য হতে জনৈক হাসান আলী ও মুসা আলী নামে দু'ব্যক্তি বার্মার সুপ্রীম কোর্ট বরাবরে ফরিয়াদ জানায় যে, তারা বার্মার বৈধ নাগরিক, পুলিশ তাদেরকে অন্যায়ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে গ্রেফতার করেছে। মহামান্য আদালত ১৯৫৯ সালের ৪ নভেম্বর বন্দীদ্বয়কে মুক্তি দেবার জন্যে নির্দেশ দেন। এরপর বন্দীদের মধ্য থেকে আরও ৭৬ জন বন্দী সুপ্রীম কোর্টে ফরিয়াদ জানালে মহামান্য আদালত তাদেরও মুক্তি দেবার জন্য নির্দেশ দেন। পুনরায় একইভাবে অভিযুক্ত ২৩ জন বন্দী বার্মার সুপ্রীম কোর্ট বরাবরে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দানের জন্য আবেদন জানায়। এরপর সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতি তাদের মুক্তি দানের আদেশ দিয়ে এক

নির্দেশনামা জারী করেন এবং তাতে উল্লেখ করেন, বার্মার ইমিগ্রেশন পুলিশ সুপ্রীম কোর্টের পরপর দু'টি নির্দেশ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রথমত, হাসান আলী ও মুসা আলী নামক দু'জন বন্দীকে মুক্তি দেয়ার জন্য নির্দেশ জারী করা হয়েছিল, সংগত কারণেই ইমিগ্রেশন পুলিশের উচিত ছিল একই প্রক্রিয়ায় আটককৃত সকল বন্দীর মুক্তি দেয়া; কিন্তু তা করা হয়নি।[২৩২]

দ্বিতীয়ত, অপর ৭৬ জন বন্দীকে মুক্তি দেয়ার জন্য বিজ্ঞ বিচারপতি পুনরায় নির্দেশ জারী করলেও ইমিগ্রেশন পুলিশ সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক আরো ২৩ জনকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ জারী করেছে কিন্তু তারাসহ একই অভিযোগে আটকৃত অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়নি। নির্দেশনামায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, ইমিগ্রেশন কর্তৃক উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট ছাপানো ফরমে মংডু মহকুমা প্রশাসক কোন বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকে দস্তখত করেছেন যার অর্থ দাঁড়ায়, বেআইনীভাবে দেশের কিছু নাগরিককে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা এবং দেশের বৈধ নাগরিক অধিকারকে অস্বীকার করা; আর একজন নাগরিককে স্বীয় আবাসভূমি থেকে বিতাড়ন করা মূলত মৃত্যুর দণ্ডাদেশ দেয়ার শামিল। মাননীয় আদালত আরো প্রত্যক্ষ করেন যে, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাদের সরবরাহকৃত অভিযোগনামায় আটককৃতরা বর্মী ভাষা জানে না বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের বার্মার নাগরিকত্বের স্বপক্ষে কোন প্রমাণপত্র দেখাতে পারেনি বলে জানিয়েছেন।[২৩৩] বিজ্ঞ বিচারপতি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, ইউনিয়ন অব বার্মায় বহু ধর্ম, বর্ণ ও জাতি বসবাস করে। বার্মা ইউনিয়নে অনেক জাতি আছে যারা বর্মী ভাষা জানে না। তাই বর্মীভাষা জানা বার্মার নাগরিকত্বের আবশ্যকীয় শর্ত নয়। নির্দেশনামার উল্লেখ মতে বার্মার সংবিধানের ৪ (২) অনুচ্ছেদে নাগরিকত্বের উপর অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে, তারা বার্মার নাগরিক; যারা বার্মায় জন্ম গ্রহণ করেছে, লালিত পালিত হয়েছে এবং যাদের পূর্ব পুরুষ বার্মাতে তাদের আবাস গড়ে তুলেছে। অতএব, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ও মংড মহকুমা প্রশাসকের কার্যকলাপ বেআইনী। তাই মাননীয় আদালত সকল বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জন্য নির্দেশ জারী করছেন।[২৩৪]

উ নু ১৯৬০ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নে উইন এর নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে বার্মা ফেডারেশনের অধীনে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি উত্তর আরাকানের মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে Meyu Frontier Administration গঠন করে এ অঞ্চলকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে মুসলমানদের বার্মার একটি বুনিয়াদী জাতি হিসেবে অভিহিত করে।[235] আরাকানের মগ গোষ্ঠীর নির্যাতন থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য মূলত এ ব্যবস্থা নেয়া হয়। মুসলমানরা সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও মগ সম্প্রদায় একে বার্মা সরকারের Divide and Rule নীতি বলে অভিহিত করে এবং আরাকানের Kala (বিদেশীদের) রক্ষার উদ্যোগ বলে অভিযোগ এনে একে হাস্যস্পদ

উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করলেও মুসলমানরা একে 'নিপীড়িত মানুষের হাফ ছেড়ে বাঁচা' বলে উল্লেখ করে।।[২৩৬] প্রধানমন্ত্রী উ নু রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে একটি শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে উল্লেখ করে সশস্ত্র আন্দোলনকারীদেরকে আত্মসমসর্পণের অনুরোধ জানান। উ নু'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৬১ সালের ৪ জুলাই সকল মুজাহিদ অস্ত্র সমর্পণ করেন।[২৩৭] এ অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে বার্মার ভাইস চীফ অব ষ্টাফ ব্রিগেডিয়ার অং জি ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং বার্মা সরকারের পক্ষ থেকে সে ভাষণ প্রচার করা হয়।[২৩৮] ব্রিগেডিয়ার অং জি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন যে, রোহিঙ্গা মুসলমানরা আরাকানেরই শান্তিপ্রিয় নাগরিক। বার্মা সরকারের তরফ থেকে শুধুমাত্র ভুল বুঝাবুঝির কারণে রোহিঙ্গাদের প্রতি বহু অন্যায় করা হয়েছে; আজ এ ভুল বুঝাবুঝি অবসানের মাধ্যমে সকল সমস্যা দূরীভূত হয়েছে।[২৩৯] তিনি আরো বলেন যে, পৃথিবীর সব সীমান্তে একই জাতি সীমান্তের দুই পারে বসবাস করে। এ জন্যে কোন নাগরিকের জাতীয়তা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া উচিত নয়।[২৪০]

বার্মার স্বাধীনতার এক দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হবার পরও অবর্মী সম্প্রদায়গুলো লক্ষ্য করলো অধিকাংশ বর্মী শাসক তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের সাথে সাথে সাংঘাতিকভাবে অবহেলা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক ব্যবহার করছে। বঞ্চনা ও আধিপত্যবাদী শাসন-শোষণ সম্প্রদায়গুলোর মাঝে বিদ্রোহের জন্ম দেয়। বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উ নু বিদ্যমান সম্প্রদায়গত বৈষম্য সমাধানের লক্ষ্যে একটি ফেডারেল সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল নে উইন বর্মী জাতিগত অভিযানের প্রশ্নে কোন ছাড় দিতে রাজী ছিলেন না। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে,'এ মুহূর্তে বিভিন্ন জাতিসত্তার স্বীকৃতি প্রদান উ নু শাসনের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে'। তাই তিনি ১৯৬২ সালের ২ মার্চ ফেডারেল সম্মেলন শেষ হবার পূর্ব মুহূর্তে একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উ নুকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলপূর্বক বার্মাকে নিষিদ্ধ গণতন্ত্রের দেশে পরিণত করে রোহিঙ্গাসহ বার্মার সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সকল প্রকার সাংবিধানিক অধিকার বাতিল করেন।[২৪১] Mohammed Yunus এর ভাষায়- In March 2, 1962 Gen. Ne Win, the then Burma`s Army Chief, seized power in a bloodless military coup, abolished the constitution and dissolved the Parliament. All power of the states - ligeslative, judiciary and executive had fallen automatically under the control of the 'Revolutionary Council' (RC) headed by him."[২৪২]

জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় এসে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ৯৫% সামরিক অফিসার ও সামান্য সংখ্যক বর্মী সিভিলিয়ান নিয়ে Burma Socialist Programme Party (BSPP) গঠন করে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানরা নবগঠিত BSPP-তে যোগ না দিলেও আরাকানের মগরা ব্যাপকভাবে যোগদান করে।[২৪৩] মুসলমানরা প্রধানত কৃষিজীবী হলেও আকিয়াবসহ আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের অনেকেই প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ছিল। কেউ কেউ আবার ক্ষুদ্র

ব্যবসা-বাণিজ্য করেও জীবন যাপন করত। নে উইন ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয়করণ করলে রোহিঙ্গা ব্যবসায়ীরা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষত বিভিন্ন ইস্যুতে মগদের অত্যাচার ও লুটপাটের কারণে আতংকিত ব্যবসায়ীরা জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন শুরু করে। জেনারেল নে উইন Burmese Way to Socialism কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে মূলত বৌদ্ধধর্ম, বর্মী-জাতীয়তাবাদ ও মার্ক্সবাদের একটি অদ্ভুত মিশ্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দেশের অর্থনীতিকেও মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেন।[২৪৪] ১৯৬০ সালে বার্মার মাথাপিছু আয় যেখানে ৬৭০ ডলার ছিল, পরবর্তীতে তাঁর এ নতুন ব্যবস্থার কারণেই ২০০ ডলারে নেমে আসে।[২৪৫]

জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই মুসলমানদের নির্মূলের জন্য আরাকানী মগদের উস্কিয়ে দেয়। ১৯৬৪ সালে তাদের United Rohingya Organisation,[২৪৬] The Rohingya Youth Organisation,[২৪৭] Rangoon University Rohingya Students Association,[২৪৮] Rohingya Jamiatul Ulama,[২৪৯] Arakan National Muslim Organisation[২৫০], Arakanese Muslim Youth Organisation[২৫১] এবং Rohingya Student Association[২৫২] প্রভৃতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করেন[২৫৩] এবং ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে Burma Broadcasting Service (BBS) থেকে নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে দেন।[২৫৪] অতঃপর ১৯৬৬ সালে সমস্ত বেসরকারি সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[২৫৫]

উ নু এর শাসনামলেও বার্মার ক্যাবিনেটে মুসলমান সদস্য ছিল। আরাকানের আকিয়াব অঞ্চলের অধিবাসী সুলতান মাহমুদ ছিলেন মুসলিম মন্ত্রী। এছাড়াও খনিজ ও শ্রম মন্ত্রী ছিলেন উ খিন মং লাট, শিল্পমন্ত্রী ছিলেন উ রশীদ এবং মালয় ফেডারেশন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে বার্মার রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বপালন করেছিলেন উ পে খিন। উ খিন মং লাট খনিজ ও শ্রম মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও স্বাস্থ্য বিভাগেরও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বার্মা মুসলিম কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনি সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলোতে স্বার্থকভাবে মিশন পরিচালনা করেন এবং সে সময় বহু খ্যাতিমান ও উচ্চপদস্থ মুসলমান বার্মায় আগমন করেন। কিন্তু নে উইন ক্ষমতা গ্রহণের পর আর কোন মুসলমানকে মন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়নি; বরং তিনি আরাকানের প্রশাসনকে বৌদ্ধিকরণ করে অনেক মুসলমান পুলিশকে বার্মার দুর্গম এলাকায় বদলী করেন এবং অনেককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। উচ্চপদস্থ মুসলিম কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ অথবা উত্তর আরাকান হতে অন্যত্র বদলী করা হয়। পক্ষান্তরে মগদের চাকরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দানের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুসলমানদের চাকরি রক্ষা কিংবা পদোন্নতির জন্য স্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল।[২৫৬]

নে উইনের শাসনামলে কয়েকবার মুদ্রা অচল ঘোষণার ফলে মুসলমানদের জন্য এক শাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ সালের ১৭ মে ৫০ ও ১০০ টাকার মুদ্রামূল্য রহিত করা হলে আরাকানী মুসলমানরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরাকানী মগরা নিজেদের মধ্যকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও স্থানীয় BSPP এর সদস্য থাকার সুবাদে জমাকৃত অর্থের মূল্যমান নতুন টাকা ফেরৎ পেলেও মুসলমানরা তাদের ডিপোজিটকৃত টাকা ফেরৎ পায়নি।[২৫৭] পক্ষান্তরে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও রেশন বিতরণের সার্বিক তদারকী মগদের হাতে থাকায় মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে।[২৫৮] উপরন্তু ১৯৬৭ সালে বার্মায় বিশেষত রাজধানী রেংগুনে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে আরাকান থেকে চাল আমদানী করে রেংগুনে পাঠানো হয়। সরকারিভাবে মুসলমানদের মজুতকৃত খাদ্য-শস্য জোরপূর্বক আদায় করে এবং সামরিক আধাসামরিক বাহিনীর লুটপাটের মাধ্যমে তাদের গোলা শূন্য করে নেয়া হয়। একদিকে অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, খাদ্য-শস্য লুট, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ এবং মুদ্রা অচল ঘোষণায় অর্থনৈতিক দৈন্যের কারণে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে যাত্রা; অন্যদিকে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নিয়ে সরকারিভাবে নির্যাতন চালায়। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।[২৫৯] Mohammed Yunus এর ভাষায় -

> After the nationalisation of the shops, demonelisation and imposition of restriction on movement, the backbone of economy of the Rohingyas crumbled.... The military quelled the riots with iron hand killing many persons. During 1967 crisis many Muslims died of starvation.[২৬০]

নির্যাতনের এক পর্যায়ে রোহিঙ্গা মুজাহিদরা পুনরায় Rohingya Patriotic Front নামে নতুন করে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে; যা ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করে।[২৬১] বার্মার সামরিক প্রশাসন আরাকানী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রমশ আরো মারমুখি হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে সামরিক অফিসারগণ শিউ কাই (Shwe Kyi) ও কাই গান (Kyi Gan) অপারেশনের নামে বিনা কারণে বিনা নোটিশে রাতের শেষ প্রহরে ইচ্ছামত মুসলিম এলাকায় হানা দিয়ে মারাত্মক অস্ত্রের মুখে মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত লুটে নেয়। তাদের দৃষ্টিতে মুসলিম মহিলাদের শ্লীলতাহানি মোটেই অপরাধ নয়।[২৬২] এলাকার প্রভাবশালী মুসলমানেরা যাতে প্রতিবাদ করতে না পারে এজন্য তাদেরকে অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন কায়দায় দিনভর শারীরিক নির্যাতনের পর জীবন নাশের হুমকি দিয়ে ছেড়ে দেয়।[২৬৩] আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মুসলমানদেরকে উৎপীড়নের জন্য মগদেরকে সরাসরি নির্দেশ দেয়। ফলে মগরা মুসলমানদেরকে যে কোন সময় আক্রমণ চালিয়ে মারপিট করতে, তাদের অস্থাবর সম্পত্তি লুট ও মুসলিম মহিলাদের ইজ্জতহানী করতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মুসলমানরা এ সকল দুঃখ দুর্দশা ও সমস্যার বিচারের জন্য পুলিশ ষ্টেশনে গেলে

পাল্টা তাদেরকেই নির্যাতন সহ্য করতে হয়।[২৬৪] শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা, মহিলাদের শ্লীলতাহানী, সম্পদ লুট এবং বিনা কারণে কারাগারে নিক্ষেপ প্রভৃতি নির্যাতনের মুখে টিকতে না পেরে অবশেষে Kyawktaw, Mrohaung, Pauktaw, Minbya প্রভৃতি অঞ্চলের অসংখ্য মুসলমান নিজেদের বাড়িঘর, স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি রেখে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।[২৬৫] বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পরই ১৯৭৩ এবং '৭৪ সালে বর্মী বাহিনীর অত্যাচারে বিপুল সংখ্যক মুসলমান এদেশে আসে। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধ করে আগত শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরৎ নেয়ার জন্য বর্মী সরকারকে চরমপত্র প্রদান করলে তারা বিতাড়িত মুসলমানদের পুনরায় তাদের বসতবাড়ীতে পুনর্বাসনে বাধ্য হয়।[২৬৬] বাংলাদেশ সরকারের চরমপত্র পাবার মাত্র তিন বছর পরই ১৯৭৮ সালে ইয়াঙ্গুনের সামরিক জান্তা পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ অপারেশন চালায়; যার নামকরণ করে কিং ড্রাগন (King Dragon) বা নাগা মিন (Naga Min) অপারেশন।[২৬৭] ১৯৭৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ২৫০ জন বহিরাগমন কর্মকর্তা মিন গং নামক জনৈক দুর্ধর্ষ সেনাপতির নেতৃত্বে সশস্ত্র অবস্থায় রেঙ্গুন থেকে আকিয়াবে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের জাতীয়তা যাচাইয়ের নামে National Registration Card (NRC)[২৬৮] তল্লাশীর অজুহাতে বিভিন্নমুখী নির্যাতন শুরু করে।[২৬৯] ইতোমধ্যে আরো অধিকসংখ্যক সামরিক অফিসার তাদের সাথে যোগ দিয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৪০০ জন মুসলিম মহিলাকে ধরে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন চালায়। এর প্রতিবাদে মুসলমানরা একত্রিত হলে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।[২৭০] ২০ ফেব্রুয়ারি আরাকান ষ্টেট হলে ভাষণ দিতে গিয়ে অপারেশনের নায়ক কর্নেল মিন গং হুমকী দিয়ে বলেন, "ড্রাগন অপারেশনের বিরোধিতা করা হলে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে।"[২৭১] এ ঘোষণার পরপরই তারা অত্যন্ত আগ্রাসী মনোভাবে স্থানীয় মগদের সাথে নিয়ে হত্যা, ধর্ষণ, গ্রেফতার, লুণ্ঠন প্রভৃতিতে নেমে পড়ে।[২৭২] ১ মার্চ ড্রাগন অপারেশনের নামে Kyauktaw জেলার Myebon শহরের ৫০০ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করে।[২৭৩] ৩ মার্চ কিয়াকুট (Kyauktaw) থেকে ২০০ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করে বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালায়।[২৭৪] ১৬ই মার্চ অত্যন্ত ভোর বেলায় বুচিদং এ অপারেশন করে ৩০০ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করে এবং উন্মত্ত লালসা মেটানোর জন্য আরো ১০০ জন মহিলাকে ধরে নিয়ে যায়। পরে এদেরকে বুচিদং থেকে মংডুতে নিয়ে যাওয়া হলেও তারা আর ফিরে আসেনি।[২৭৫] বর্মী বাহিনী ২৬ মার্চ বুচিদং এর দাবিনসারা, জাদিবুরং, কাদিরপাড়া, কাদিব্রুং, গনিবারপাড়া, নাকিনদক, মরিসাবিল গারংচং, খিনোক্তি, হোক্কাপাড়া, কাগিয়াপা, কান্ব্রান, মনিরবিল প্রভৃতি গ্রাম জালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়।[২৭৬] বর্মী বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে জন্মভূমির সমস্ত সম্পদের মায়া ত্যাগ করে হাজার হাজার মুসলমান নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবক ও শিশু জীবন বাঁচানোর তাগিদে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এ অপারেশনে ১০ হাজারের অধিক মুসলমানকে হত্যা

করা হয়; প্রায় আড়াই লক্ষ মুসলমান শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আসে এবং পথিমধ্যে-ক্যাম্পে প্রায় ৪০ হাজার নারী, শিশু ও বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করে।[২৭৭] শরণার্থীদের এহেন বিপজ্জনক ঢল জাতিসংঘসহ বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়; ফলে United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) সহ বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেয়া হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপের মুখে বার্মা সরকার এসব উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

মুসলিম নির্যাতনের অধ্যায় মূলত ১৯৪২ সাল থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে চরম আকার ধারণ করে। বর্মী সরকার পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৯৪৮ সাল থেকে '৭৮ পর্যন্ত প্রায় ১৪টি বড় রকমের অপারেশন চালিয়ে মুসলমানদের জীবনকে বিপন্ন করে তোলার মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘন করে।[২৭৮] ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরচালিত প্রধান প্রধান ১১টি অপারেশন হলো- বি টি এফ অপারেশন (BurmaTerritoria Force Operation), কমবাইন্ড ইমিগ্রেশন এন্ড আর্মি (Combined Immigration & Army), ইউএমপি অপারেশন (Union Military Police Operation), ক্যাপ্টেন টিন ক্যাইউ অপারেশন (Captain Htin Kyaw Operation), শিউ কাই অপারেশন (Shwe Kyi Operation), কাই গান অপারেশন (Kyi Gan Operation), নাগাজিন কা অপারেশন (Nagazin Ka Operation), মাইয়াট মন অপারেশন (Myat Mon Operation), মেজর অং থান অপারেশন (Major Aung Than Operation), সেব অপারেশন (Sabe Operation), নাগামিন (ড্রাগন)অপারেশন (Nagamin (Dragon)Opertation)|[২৭৯] উল্লেখিত অপারেশনসমূহ বাহ্যিকভাবে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার নামে পরিচালিত হলেও তা মূলত মুসলিম উৎখাতেরই নীল নক্শা। উল্লেখিত ১১টি অপারেশনের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল বিটিএফ, শিউ কাই, কাই গান, মেজর অং থান, সেব (Sabe) এবং ড্রাগন অপারেশন। এ অপারেশনসমূহ পরিচালনা করে সরকারি পরিকল্পনার ভিত্তিতে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হয়। Nagamin Operation এর পর ১৯৭৯ ও ১৯৯২ সালে আরো কয়েকটি মারাত্মক অপারেশন পরিচালনা করে লাখ লাখ মুসলমানকে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের অনেকেই স্বদেশে ফেরৎ গেলেও হাজার হাজার মুসলমান বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবির কিংবা তার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়ে বাংলাদেশেই থেকে যায়।[২৮০]

বার্মা সরকার ১৯৭৪ সালে BSPP এর নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য First Peoples Congress (Pyethu Hlutn Taw) আহ্বান করে আরাকানকে শুধুমাত্র 'বৌদ্ধশাসিত স্টেট' ঘোষণা করলে স্বৈরশাসকের ছত্রছায়ায় মগরা আরো উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে এবং

আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে অনবরত মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম নিধন শুরু করে।[২৮১] আরাকানের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাসমূহ ছাড়াও সমগ্র আরাকানে স্থানীয় মগগোষ্ঠী কর্তৃক মুসলমান বিরোধী দাঙ্গা পরিচালিত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশী দাঙ্গা পরিচালিত হয়েছে আকিয়াব, বুচিদং, মংডু এবং স্যান্ডুয়েতে; কারণ এখানকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই মুসলমান। মূলত এ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা হতে তাদেরকে তাড়িয়ে নতুনভাবে মগ প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু করার জন্যই সরকারি সহযোগিতায় এসকল দাঙ্গা পরিচালনা করা হয়।

শুধু অপারেশন বা দাঙ্গা বাঁধানোই নয়, এছাড়াও বর্মী কর্তৃপক্ষ মুসলমান নির্মূলে আরো বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র মুসলমানদের কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর ব্যাপকভাবে উচ্চ হারে করারোপ করে এবং আরোপিত কর পরিশোধ করতে না পারলে তাদের বাড়ীঘর ঘেরাও করে জীবিকার জন্য মজুদকৃত খাদ্য-শস্যাদি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অজুহাতে অনেক অস্থাবর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সাথে বর্মী সরকার ওয়াক্‌ফকৃত জমি ও সম্পত্তি বেআইনীভাবে ভিত্তিহীন অজুহাতে ছিনিয়ে নেয়। আরাকানে জনসংখ্যাগত অবস্থান পরিবর্তন এবং মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য তাদের বাজেয়াপ্তকৃত ভূমিতে নতুন নতুন মগ বসতি স্থাপন করে।[২৮২]

মুসলমানদের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সরকারি অনুমতি ব্যতিত তারা এক থানা থেকে অন্য থানায় যেতে পারে না।[২৮৩] অপরদিকে বিনা মজুরীতে জবরদস্তিমূলক শ্রমের মাধ্যমে প্রতিদিন শত শত মুসলমান নারী, পুরুষ ও যুবকদেরকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি ও নিরাপত্তা বাহিনীর কাজে দিনের পর দিন খাটানো হয়। শ্রমের মূল্য দাবী করলে কিংবা শ্রমদানে অস্বীকৃতি জানালে অমানবিক নির্যাতন অথবা মৃত্যুকেই সহজে মেনে নিতে হয়। মুসলমানদের উপর সেনাবাহিনী ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার জন্য নিয়মিত খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা অনেকটা বাধ্যতামূলক।[২৮৪]

শুধু মুসলমানদের জীবন ও সম্পদই নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহও বর্মী সরকারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বুচিদং শহরের বাজার মসজিদ, রাহাস্ত্রী ও গাওয়ার প্রধান মসজিদ, আমবরী, আকিয়াব, কাইউক, নিমাই মসজিদ এবং বুচিদং শহরের টংবাজার দারুল উলুম মাদ্রাসাসহ বিপুল সংখ্যক মসজিদ মাদ্রাসা বিধ্বস্থ ও উচ্ছেদ সাধন করা হয়; সেই সাথে ১৯৭৬ সালে কাইউক পাইউ শহরের মাদ্রাসাকে ভস্মিভূত করা হয়।[২৮৫] আকিয়াবের পাইকতালী ও আকিয়াব জামে মসজিদের ওয়াক্‌ফভূমিসহ অনেক ওয়াক্‌ফকৃত জমি, মংডু টাউনের কবরস্থান, মংডুর গ্যাকুরা গ্রামের কবরস্থান ও কাইউক পাইক শহরের কবরস্থানসহ অনেক কবরস্থানকে শুকুরের চারণভূমি এবং গণপায়খানা বানানো হয়।[২৮৬] পবিত্র কুরআন মজিদ ও ধর্মীয় বই পুস্তকগুলোকে প্রায়ই নষ্ট করে ফেলা হয় এবং প্যাকিং সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[২৮৭] কোরবানীর ক্ষেত্রে নানা

রকম বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে দুই থেকে পাঁচ হাজার লোক অধ্যুষিত গ্রামে দু'টি খাসি অথবা ১টি দু'টি গরু কোরবানীর অনুমতি দেয়া হয়।[২৮৮] ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কোন মুসলমানকেই হজ্জ গমনের অনুমতি দেয়া হয়নি। স্কুল-কলেজে ধর্মীয় শিক্ষার কোন সুযোগ নেই।[২৮৯] Rohngya Petriotic Front প্রদত্ত তথ্যানুসারে ১৯৫৫-৭৮ সাল পর্যন্ত তেইশ বছরের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মুসলমান বর্মীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।[২৯০]

সরকারি নথিপত্রে বাংলাদেশে আশ্রিত শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ২ লাখ উল্লেখ করা হলেও মূলত এর সংখ্যা আরও বেশী ছিল। বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রিত মুসলমান শরণার্থী সংখ্যা ২,২২,৫৩৫ জন জানা যায়।[২৯১] তবে শিবিরের তালিকাভুক্ত শরণার্থী ছাড়াও অনেকেই এলোমেলোভাবে শিবিরের তালিকার বাইরে ছিল এবং তারা পরবর্তীতে এদেশেই রয়ে গেছে; সব মিলে আগত শরণার্থীর সংখ্যা ৩ লাখেরও বেশী।[২৯২]

১৯৪৮-৭৮ সাল পর্যন্ত আরাকানে বর্মী শাসনের চিত্র বর্ণনা করতে আবদুল মাবুদ খান মন্তব্য করেন-

১৯৪৮-৭৮ পর্যন্ত সুদীর্ঘ তিরিশ বছর বর্মী শাসকশ্রেণী এই দেশটির (আরাকান রাজ্যের) উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেনি। শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরাকান এখনো মধ্যযুগীয় অবস্থায় রয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত আরাকানে মাত্র সতেরটি হাই স্কুল ও একটি মাত্র ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রয়েছে। আরাকানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও মধ্যযুগীয় অবস্থায় বিদ্যমান। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল পাকা রাস্তা রয়েছে (সড়কটি রাথিডং থেকে বুথিডং পর্যন্ত প্রসারিত)। আরাকানে আজও কোন রেলপথ তৈরী হয়নি। ব্রহ্মদেশের (বার্মা) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হল ধান। আরাকান তার সিংহভাগ সরবরাহ করা সত্ত্বেও সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়নি। আরাকানে আজও কোন ছোট-খাট কলকারখানাও গড়ে ওঠেনি। প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোকের জন্য আরাকানে দু'শ ষাট শয্যাবিশিষ্ট মাত্র তিনটি হাসপাতাল রয়েছে। উক্ত অবস্থার পরিপেক্ষিতে বর্মীশাসন আরাকানীদের নিকট বরাবরই মনে হয়েছে বিদেশী শাসন। হত্যা, গৃহযুদ্ধ, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন ও অরাজকতা আরাকানীদের নিত্যসহচর।[২৯৩]

সামরিক বাহিনী ও মগদের বর্বরোচিত নির্যাতন নিষ্পেষণে মুসলমানদের জীবনের শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি শুরু হলে তাদের মধ্যকার কিছু বুদ্ধিজীবী বর্মী স্বৈরশাসনের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার নিমিত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ও সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে ১৯৭০ সালে Rohingya Independence Front (RIF) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। অচিরেই উত্তর আরাকানের শহর-গ্রামাঞ্চলসহ মুসলিম অধ্যুষিত বার্মায় এর কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের মাধ্যমেই বাইরের দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ করে তাদের নতুন সংগ্রামের প্রতি

সমর্থন আদায়সহ পূর্বের মুজাহিদ আন্দোলনের কিছু বিচ্ছিন্ন সদস্যকে একত্রিত করার প্রয়াস চালায়। অব্যাহত হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, লুটপাট ও নিজস্ব বাড়িঘর থেকে বহিষ্কারের প্রেক্ষিতে RIF নেতা মোহাম্মদ সুলতান রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানালে তাকেও বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়ে অবশেষে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পলায়ন করতে হয়।[২৯৪]

১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে মুসলমানরা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য Rohingya Patriotic Front (RPF) নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলে। আরাকানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে তাদের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ থাকে। নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে ১৯৭৮ সালে উক্ত সংগঠনটি Rohingya Liberation Front (RLF) নামে আরও একটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[২৯৫]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্যাতনের পরাকাষ্টায় চল্লিশের দশক থেকে মুজাহিদ আন্দোলন (Mujahid Movement), Rohingya Liberation Front (RLF), Rohingya Patriotic Front (RPF), সময়ের প্রেক্ষিতে গঠনমূলক ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ৮০'র দশকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে এলেও নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দুর্বলতা, বাস্তবতা বিবর্জিত চিন্তা, গণযোগাযোগের অভাব প্রভৃতি কারণে লক্ষ্য হাসিলে তেমন ফলদায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ১৯৭৮ সালের ড্রাগন অপারেশনের কারণে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তু হবার পর আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে গভীর যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগে অতীত দুর্বলতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, দুনিয়ার আধুনিক বাস্তবতাকে সামনে রেখে, বার্মার উগ্র স্বাদেশিকতাবাদী শোষণ, জুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে মজলুম জনগোষ্ঠীর মুক্তির লক্ষ্যে জেহাদ করে স্বাধীন সার্বভৌম শান্তিময় ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৮২ সালে Rohingya Solidarity Organisation (RSO) প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৯৬] ছাত্র যুবকদের মধ্যেও শিক্ষা সংক্রান্ত দাবী দাওয়াসহ ইসলামি চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলাদাভাবে ১৯৮৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর 'ইত্তেহাদুত তুলাবীল মুসলিমীন' নামক একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৯৭]

মুক্ত স্বাধীন আরাকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলেও আর্থিক সংকট, সৈন্য ও অস্ত্রের অভাব, আন্তর্জাতিক বিশ্বের সমর্থন ও সহযোগিতার অভাব, অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলসহ বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে বর্মী জান্তার শক্তিশালী সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে অচিরেই ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তবে, ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে ARIF ও RSOসহ বিভিন্ন দল ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনার নিমিত্তে Arakan Rahingya National Organisation (ARNO) নামে এক মঞ্চে যোগ দিয়ে নুরুল ইসলাম ও ডাঃ মুহাম্মদ ইউনুছ এর নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালনার চেষ্টা করছে; এতে কতটুকু ঐক্য থাকবে এটাই বিবেচ্য বিষয়।

বৃটিশ শাসনের শেষ পর্ব পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের জন্মভূমির নিজস্ব বসতবাড়ীতে মৌলিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার প্রয়াস পেলেও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কোন বলিষ্ঠ ধারা সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে বৃটিশ রাজত্বের শেষ পর্যায়ে থাকিন পার্টির নেতৃবৃন্দ তাদের দাবী-দাওয়া যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম হলেও মুসলমানরা এক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়। তারা স্বাধীনতা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় স্বাধিকার আন্দোলনের জাতীয় নেতা জেনারেল অং সানকে সমর্থন করলেও কোন সফলতা পায়নি। বরং বার্মা স্বাধীন হবার পর থেকে মুসলমানদের উপর ক্রমশ নির্যাতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রশাসনসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বরত থাকার ফলে জাতীয়ভাবে কিছুটা মজবুতি থাকলেও পরবর্তীতে সকল পদ থেকে মুসলমানদের চাকরিচ্যুত করা হয়। জাফর কাওয়ালের প্রচেষ্টায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও তার মৃত্যুর পরে দলীয় কোন্দলসহ বিভিন্ন কারণে দলে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং সমস্যার বিবর্তনে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন দলের উদ্ভব হয়। কিন্তু কোন দলই তাদের আন্দোলনে সফল হতে পারেনি। এক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃত্বের অযোগ্যতা ও স্বার্থান্ধতা অনেকাংশে দায়ী। এছাড়া উ নু'র সরকার মুসলমানদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে এবং নে উইনের শাসনামলে রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহকে নিষিদ্ধকরণ; অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্তকরণের জন্য সরকারের মুদ্রা অচলকরণসহ বিভিন্ন অপকৌশল, আত্মরক্ষার্থে বিত্তশালী শিক্ষিত মুসলমানদের স্বদেশ ত্যাগ এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকা মুসলমানদের আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয়। মুসলমানরা বিশ্বের মজলুম-মানবাধিকার বঞ্চিত জাতিসমূহের অন্যতম। সুতরাং এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরো তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

অধ্যায় সমাপনীতে বলা যায়, আরাকান রাজ্যটি ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজীর স্থাপনকারী দেশ হিসেবে খ্রিস্টপূর্ব থেকেই খ্যাতি অর্জন করেছে। জড়বাদী ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মীয় বিশ্বাসের যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে এটি সম্প্রীতির সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ শাসিত হয়েছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে সেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই আরাকান অঞ্চলে বৌদ্ধ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে হিন্দু ধর্ম মজবুতভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর সপ্তম শতাব্দী থেকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার পর থেকে ইসলামের প্রসার ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রভাবের যুগেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট ছিল। কিন্তু বার্মা কর্তৃক ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকান দখলের পর থেকে অদ্যাবধি মুসলমানগণ সেখানকার নির্যাতিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হিসেবে বেঁচে আছে।

পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জি

---

১ মিয়ানমারের পূর্ব নাম ছিল বার্মা। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুন সরকারিভাবে বার্মার নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার রাখা হয়েছে। রাজধানী রেঙ্গুনের নামও পরিবর্তন করে রেখেছে ইয়াংগুন। মূলত বার্মায় কারেন, কাচিন, মন, বর্মী প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর লোক বাস করে বলে একক কোন গোষ্ঠীর নামানুসারে নামকরণ না করার জন্য সরকার এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। (দ্রষ্টব্যঃ *Far Eastern Economic Review,* 29 June, 1989, p. 14.) তবে এ গ্রন্থে রাজধানী ইয়াংগুনের পরিবর্তে রেঙ্গুন এবং বার্মার স্থলে বার্মা ও মিয়ানমার উভয় নামই ব্যবহার করা হয়েছে।

২ আরাকানের আকিয়াব অঞ্চলে সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জেলে পেশায় নিয়োজিত একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর নাম থাম্ভইক্যা। এ গোত্রের লোকসংখ্যা মাত্র কয়েক'শ। তারা আরাকানী মগদের মত পোষাক পরিধান করে এবং আরাকানী মগী ভাষায় কথা বলে। বাংলাদেশের টেকনাফ অঞ্চলেও এদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় এদেরকে থাম্ভরগ্যা বলে।

৩ জেরবাদী শব্দটি ফারসি ভাষাজাত। 'জির+বাদ'= বায়ুর নিম্নদিকে অর্থাৎ অনুবাত। শব্দটি নৌবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়। মালাক্কা, সুমাত্রা, টেনাসেরিম, বাংলা, মার্তাবান, পেগু প্রভৃতি অঞ্চল অনুবাত স্থলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে এ আঞ্চলিক সমুদ্র ভ্রমণকারী নাবিকদিগকে বুঝাতে জেরবাদী শব্দটির ব্যবহৃত হত। এছাড়া আরবদের নিকট বার্মাও অনুবাত অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। এ অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে জেবরাদী বলা হত। (মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, "ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মুসলমান" *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ২৪৭-২৪৮) তবে আরাকানরাজ নরমিখলা কর্তৃক ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে হৃতরাজ্য আরাকান পুনরুদ্ধারের পর হতে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান আরাকানে গিয়ে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মগ মহিলাদেরকে ইসলাম গ্রহণ না করিয়েই বিয়ে করেন। এর ফলে যে বর্ণসংকর জাতির উদ্ভব হয়েছে তারাই জেরবাদী নামে খ্যাত। তারা আরাকানী ও উর্দু ভাষাভাষী। ইসলামের অনুসারী হলেও তাদের মধ্যে মগ প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৪ ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা শাহ সুজা আরাকানে নিহত হবার ফলে তার অনেক সৈন্যও হতাহত হয়। অবশিষ্ট সৈনিকদেরকে আরাকানরাজ সান্দাথু ধম্মা তার দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন। ফারসি ভাষায় কামান অর্থ ধনুক। পরবর্তীতে আরাকানরাজের এ ধনুকধারী মুসলমান দেহরক্ষী ও প্রাসাদরক্ষী বাহিনীই কামাঞ্চি নামে খ্যাত হয়। (দ্রঃ *সিদ্দিক খান রচনাবলী*-১, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৬-৫৭)। কামাঞ্চিদের পোষাক পরিচ্ছদ আরাকানী মগদের মত। তারা উর্দু ও আরাকানী ভাষায় কথা বলে। তাদের আকার-আকৃতি ও স্বভাব অনেকাংশে আফগান বা মোগলদের মত।

৫ আরাকানের সর্বশেষ রাজধানী ছিল ম্রোহং নামক স্থানে। মুসলমানগণ একে রোহাং উচ্চরণ করেন। এ রোহাংয়ের মুসলিম আধিবাসীদেরকে রোহিঙ্গা বলা হয়। আরাকানের মুসলমানদের মধ্যে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা এত বেশী যে, বর্তমানে আরাকানী মুসলমান বলতে অনেকাংশে রোহিঙ্গাদেরকেই বুঝায়। রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- মোঃ মাহফুজুর রহমান "রোহিঙ্গা সমস্যা ঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী, ১৯৭৮-১৯৯৪" ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।

৬ Abdul Mabud khan, *The Maghs : A Buddist Community in Bangladesh,* (Dhaka : University press ltd., 1999) P.3.

৭ Abdul Karim, *The Rohingyas : A short Account of their History and Culture* (Chittagong: Arakan Historical society, 2000) P.1.

৮ আহমদ শরীফ, "চট্টগ্রামের ইতিকথা (আদিযুগ)," *ইতিহাস*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪, পৃ. ১৬২।

৯ Abdul Karim, *The Rohingyas, op.cit.,* P.2.

১০ A FK Jilani, *The Rohingyas of Arakan : Their quest for Justice,*(Chittagong : Ahmed Jilani, 1999), P.18.

১১ *Ibid.,* 20.

১২ Abdul Mabud Khan, *The Maghs, op.cit.,* P.4
১৩ Jilani, op.cit., p. -25.
১৪ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২২শ খণ্ড, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃ. ৭১৭।
১৫ Abdul Mabud Khan, *The Maghs, op.cit.,* P. 4.
১৬ Mohammed Yunus, *A History of Arakan: Past and Present,* (Chittagong: Magenta colour, 1994), P.12; *Manifesto of Arakan Rohingya National Organisation,* Arakan, 1998, P.2; *দৈনিক জনতা*, ১৭ নভেম্বর ১৯৯১; *দৈনিক সংবাদ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০; *দৈনিক আজাদ*, ১৫ ও ১৭ নভেম্বর, ১৯৯১।
১৭ Abdul Karim, *The Rohingyas, op.cit.,* P, 2.
১৮ The Return of the Rohingyas to Burma: Voluntary Repatriation or Refaulement? *U.S Committee for Refugees,* Washington, March 1995, P.3.
১৯ হাজী এম.এ. কালাম, "রাষ্ট্রহীন এক মুসলিম জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ ডিসেম্বর, ২০০১।
২০ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মোঃ মাহফুজুর রহমান "রংপুরের সুবীরনগরে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির ঃ প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা," *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, বিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০০২. পৃ. ১৪৭-১৬১।
২১ R. B. Smart, *Burma Gazetteer Akyab District, Vol.* A (Rangoon : Burma Government printing & Stay, 1959) P.83.
২২ *Government Official population census of Arakan in 1931,* Union of Burma.
২৩ *The Constitution of the Socialist Republic of Union of Burma,* 1974, Sec. No. 3/5.
২৪ মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ "আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য", *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৩২; উদ্ধৃতি, *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Vol. XIII, Part, 1. 1844, p. 24.
২৫ *তদেব।*
২৬ Anthur P. Pheyre. *History of Burma, Including Burma Proper, Pegu, Taungu, Tenasserim and Arakan : From the Earliest time to the End of the First war with British India* (London: Susil Gupta, 1967), p. 41.
২৭ তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারাকানাথ আরাকানকে রখন বলে উল্লেখ করেছেন (দ্রঃ Sarat Chandra Das, "Antiquity of Chittagong," *JASB,* 1898, pp. 13-14) মীর্জা নাথান "বাহারীস্তান-ই-গায়বীতে আরাকানকে রাখাঙ" ও সেখানকার অধিবাসীকে রখঙ্গী বলে উল্লেখ করেছেন। [দ্রঃ মির্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, দ্বিতীয় খণ্ড, খালেকদাদ চৌধুরী অনুদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১৪২]। ঐতিহাসিক আর্থার ফেয়ার আরাকানকে রাখাইং নামের বিকৃতি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি পেগুতে রাখাইন নামের এক জনগোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু রাখাইন নামের উক্ত জনগোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে আরাকানী বৌদ্ধ রাখাইনদের ধর্মের কোন সাদৃশ্য নেই। (দ্রঃ A. Phayre, "On the History of Arakan, *JASB,* Vol. XII, Part 1, Calcutta, 1844, p. 14; *Bhattasali Commemoration Volume,* Dhaka Museum, pp. 334-335).
২৮ *The call of Rohingya,* Arakan Rahingya Patriotic Front, Ist year, Vol. 1. 1981.
২৯ A.P. Phayre, *History of Burma, op.cit.,* p. 43.
৩০ সুপ্রাচীনকাল থেকে খ্রিস্টীয় ১৩ শতক পর্যন্ত বর্তমান আরাকানে দুটি স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। একটির নাম স্যাণ্ডোয়ে অন্যটি আরাকান। বর্তমান দক্ষিণ আরাকানের নামই ছিল স্যাণ্ডোয়ে; যা তের শতক পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। আর আরাকান বলতে বর্তমান উত্তর আরাকানকে বুঝানো হয়ে থাকে। বিস্তারিত

জানার জন্য দেখুন- আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) পৃ. ৪।

৩১ A.P. Phayre, *History of Burma, op.cit.,* pp. 42-43; Abdul Mabud Khan, *The Maghs, op.cit.,* p.12.

৩২ A.P. Phayre, *History of Burma, op.cit.,* pp. 42-43.

৩৩ আরাকানের রাজাদের শাসনকালের তালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

৩৪ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১) পৃ. ৫৪; A.P. Phayre. *History of Burma, op.cit.,* pp. 44-45; Harvey, *History of Burma, op.cit.,* p. 137.

৩৫ রাজাদের বিস্তারিত তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৩৬ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৬-৭।

৩৭ আরাকানের চন্দ্র বংশীয় বৈশালীর সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক আনন্দ চন্দ্র (৭২০ পর্যন্ত) এর রাজত্বের নবম বৎসরে এ স্তম্ভটি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। তিনি সেখানকার চন্দ্রবংশীয় রাজাদের নামের তালিকা উক্ত শহরের স্ত ম্ভটিতে উৎকীর্ণ করেছিলেন বলে এটা আনন্দচন্দ্রের স্তম্ভলিপি নামে সুবিখ্যাত। ইংরেজ পণ্ডিত ড. ই. এইচ. জনষ্টোন (Dr. E. H. Johnston) ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আনন্দচন্দ্রের স্তম্ভলিপি পাঠোদ্ধার করেন। [দ্রষ্টব্য: Dr. E. H. Johnston, "Inscription of Arakan," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies,* No. II, London, 1944, pp. 357-385]

৩৮ A.P. Phayre. *History of Burma, op.cit.,* pp. 298-99.

৩৯ Abdul Mabud Khan, *The Maghs, op.cit.,* P.18.

৪০ *Ibid.* p. 18.

৪১ A.P. Phayre. *History of Burma, op.cit.,* p. 299.

৪২ G.E. Harvay, *Out line of Burmese history,* London, 1925, p. 15.

৪৩ A.P. Phayre. *History of Burma, op.cit.,* pp. 299-300; Harvey, *History of Burma, op.cit.,* p. 137.

৪৪ *Ibid.,* p. 300; Harvey, *History of Burma, op.cit.,* p. 137.

৪৫ A.P. Phayre. *History of Burma, op.cit.,* pp. 300-301.

৪৬ *Ibid.,* p. 301.

৪৭ *Ibid.,* pp. 301-302.

৪৮ দক্ষিণ পূর্ব বাণিজ্যিক পথ বলতে ভারত মহাসাগরীয় সামুদ্রিক পথকে বুঝানো হয়ে থাকে। এ পথ একদিকে মেসোপোটিমিয়া এবং পারস্যোপসাগর থেকে অন্যদিকে মিশর ও লোহিত সাগর থেকে শুরু হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার পর্যন্ত চলে যেত; সেখান থেকে একদিকে শ্রীলংকা, ইন্দোচীন এবং দক্ষিণ চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [দ্রষ্টব্য: মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮) পৃ. ১৫৮।]

৪৯ মুহিউদ্দীন খান, "বাংলাদেশে ইসলাম: কয়েকটি তথ্য সূত্র", *মাসিক মদীনা,* ২৭ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯২, পৃ. ৩৯।

৫০ মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৬০।

৫১ *সুরাহ আলে ইমরান-* ১০৩-১০৫, ১১০-১১৪, ১৮১-১৯৫, *নিসা-* ৮৫, ১১৫; *আনয়াম-* ৮৪-১০৮; *তওবা-* ১২২; *রা'দ* -২৪, ৯৫; *নহল-* ৬৭-৬৯ প্রভৃতি আয়াত।

৫২ সম্রাট নাজ্জাশীর পুরো নাম আসহামার ইবনে আবহার নাজ্জাশী। তিনি ন্যায়পরায়ন শাসক হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) গায়েবানাহ জানাযা আদায় করেছিলেন; আলিমগণ কেউ কেউ তাকে সাহাবি আবার কেউ কেউ তাবেঈ মনে করেন। (দ্রষ্টব্য:) *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১৩শ খণ্ড, ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ. ৬৭০।

৫৩ *সীরাতে ইবনে হিশাম*, আকরাম ফারুক অনূদিত (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৮) পৃ. ৭৯।

৫৪ আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) এর পুরো নাম আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওয়াইব। তিনি রাসুল (সাঃ) এর মাতা আমিনার আপন চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি কাদেসিয়া যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের পিতা। তিনি চীনের কোয়াংটা শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এরই অদূরে তার মাজার এখনও বিদ্যমান। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক পরিচালক প্রফেসর মাহমুদ শাহ কোরেশী সে মাজার জিয়ারত করেছেন বলে গবেষককে জানিয়েছেন।

৫৫ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মো. আশরাফ- উজ-জামান, "বৃহত্তর রংপুর জেলায় ইসলাম প্রচার : আউলিয়া কেরামের ভূমিকা" অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।

৫৬ মুহাম্মদ রুহুল আমীন "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান," অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ. ৫৩।

৫৭ আবু আবদুল্লাহ হাকিম, *মুস্তাদরাক-ই-হাকিম*, ১ম খণ্ড, (দক্ষিণ হায়দরাবাদ, প্র. বি. তাবি;) পৃ. ৩৫।

৫৮ রুহমী রাজ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিক রুহমী বলতে আরাকান রাজ্যকে বুঝিয়েছেন। কেননা আরাকানের পূর্ব নাম 'রোখাম'। এটি আরবী শব্দ; যার অর্থ শ্বেতপাথর এবং আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ম্রোহংয়ের পূর্বনাম কায়কপ্রু। এটি বার্মিজ শব্দ; যার অর্থও শ্বেত পাথর। এদিক থেকে কায়াকপ্রু অঞ্চল ও রোখাম একই অঞ্চল হেতু রুহমী বলতে রোখাম বা আরাকানকেই বুঝানো যায়। মনে করা হয় যে, রোখাম শব্দটির বিকৃতরূপই রুহমী। তবে কেউ কেউ রুহমী বলতে রামুকে বুঝিয়েছেন। যদি এটা ধরে নেয়া হয় তবুও আরাকানই বুঝায়। কেননা তখন রামু আরাকানেরই অংশ ছিল। তাছাড়া হাজার বছরের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আরাকানের ঐতিহ্যও অস্বীকার করা যায় না। [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, "প্রাচীন ইতিহাসে রুহমী রাজ্যঃ মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী সম্পাদিত, *আরাকানের মুসলমানঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্যঃ* (চট্টগ্রামঃ আরাকান হিসটরিক্যাল সোসাইটি ২০০০) পৃ. ২৬৪-২৭৫।

৫৯ কাজী আতাহার মুবারকপুরী, *আরব ওয়া হিন্দ আহদে রিসালাত মে* (দিল্লী : নদওয়াতুল মুসান্নেফিন, তা. বি.) পৃ. ১৬০।

৬০ ইবনে আব্দুর রব্বী আল আন্দালদী, *আল ইকদুল ফরিদ*, ১ম খণ্ড, (কায়রো : প্র. বি., ১৯৬৯) পৃ. ২০২।

৬১ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, কাজী রশিদ বিন জুবাইর, *কিতাবুস যাখারের ওয়াত তুহফ* (কুয়েত : প্র.বি., ১৯৫৯) পৃ. ২১-২২।

৬২ A.P. phayre, *JASB,* Vol. xii, part- 1, 1844, p. 36

৬৩ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, *তাওয়ারিখে ইসলামঃ বার্মা ওয়া আরকান*, (কলিকাতা : দি স্টার আর্ট প্রেস, ১৯৪২) পৃ. ২৪।

৬৪ উল্লেখ্য, বদরশাহ নামে একাধিক অলি ছিলেন। যেমন দিনাজপুরের হেমতাবাদে, বর্ধমানের কালনায় এবং বিহারে বদরউদ্দিন বদরে আলম দরবেশের দরগাহ রয়েছে। (দ্রষ্টব্য ঃ আহমদ শরীফ, *বাঙালা ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃ. ২৬১, ২৮৯, ৪৫৯, ৪৬৭, ৪৯০, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪৮)।

৬৫ Harvey, *History of Burma,* 137; P.E. Maung Tin & C.H. Luce, *The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma,* (London: Humphrey, Midford, 1913), p. 75.

৬৬ আবদুল মাবুদ খান "আরাকানে মুসলমান সম্প্রদায়" *দৈনিক আজাদী*, ২২-২৭ আগষ্ট, ১৯৭৮।

৬৭ গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সুফি সাধক* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩), পৃ. ১৬৮-৬৯।

৬৮ *JASB,* Vol. 13, 1844, PP. 44-46.

৬৯ আবদুল করিম 'ইতিহাস' *কক্সবাজারের ইতিহাস* (কক্সবাজারঃ কক্সবাজার ফাউন্ডেশন; ১৯৯০) পৃ. ২৮.

৭০ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩।

৭১ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) পৃ. ১৯৯।

৭২ *JASB,* VoL. 13, No1. 1884 P.44-46.

৭৩ উল্লেখ্য যে, ইলিয়াছ শাহী বংশের শাসনামলে মুসলিম শাসকদের অসামান্য উদারতার প্রেক্ষিতে হিন্দুরা রাজ্যের উচ্চপদ ও মন্ত্রণালয়সমূহ লাভ করে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মন্ত্রী গণেশের নেতৃত্বে হিন্দুরা গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলে মাওলানা মুজাফফর শামস বলখী সুলতানকে সতর্ক করে দেন। তদুপরি আত্মবিশ্বাসী সুলতান সেদিকে তেমন কোন আমল দেননি। ফলে গণেশের চক্রান্তেই তাকে শহীদ হতে হলো। (দ্রঃ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৯)

৭৪ মন্ত্রী গণেশের চক্রান্তে মাত্র দু বছরের মাথায় সুলতানের ক্রীতদাস শিহাব উদ্দীন কর্তৃক শহীদ হন। শিহাব উদ্দীন মন্ত্রী গণেশের চক্রান্তে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বীয় মনিব হত্যার মাধ্যমে নিজেই বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। বাহ্যত শিহাব উদ্দীন বায়েজিদ শাহ শাসন ক্ষমতায় বসলেও বাংলার সমস্ত কর্তৃত্ব মন্ত্রী গণেশের হাতে চলে যায়। রাজা গণেশ এভাবে পর্যায়ক্রমে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বাংলার মসনদ থেকে ইলিয়াছশাহী বংশ ও বায়েজীদশাহী বংশকে উৎখাত করেন এবং মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করেন। মুসলমানদের উপর এরূপ অত্যাচারের প্রেক্ষিতে বাংলার অন্যতম অলীয়ে কামেল নুর কুতুবুল আলম জৌনপুরের সুলতান ইবরাহীম শর্কীকে বাংলা আক্রমণ করার জন্য অনুরোধপূর্বক পত্র লেখেন। সুলতান ইবরাহীম শর্কী পত্র পেয়ে তারই শ্রদ্ধাভাজন সমকালীন শ্রেষ্ট জ্ঞানী কাজী শাহাব উদ্দীন জৌনপুরীকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং তার পরামর্শে সসৈন্যে বাংলা অভিমুখে রওনা হলেন। রাজা গনেশ সে সংবাদে বিচলিত হয়ে দরবেশ নুর কুতুবুউল আলমের নিকট প্রাণ ভিক্ষা ও আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। নুর কুতুবউল আলমের শর্ত মোতাবেক নিজে ইসলাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলেও পরে তার স্ত্রীর কুচক্রে নিজে ইসলাম কবুল না করে স্বীয় পুত্র যদুকে ইসলাম দীক্ষা দিয়ে জালাল উদ্দীন নাম গ্রহণ পূর্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তার নামে খুৎবা পাঠ ও ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহ পুনরায় চালু করা হয়। দরবেশ নুর কুতুব উল আলম ইব্রাহীম শার্কীকে যুদ্ধ না করার অনুরোধ জানালে তিনি রুষ্ট হয়ে জৌনপুরে ফিরে যান। সুলতান ইব্রাহীম শর্কী স্বরাজ্যে ফিরে গেলে রাজা গণেশ ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দেই স্বীয় মুসলিম পুত্র জালাল উদ দীন মোহাম্মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুতপূর্বক বন্দী করেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দু ধর্মে ফিরে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জালাল উদ্দীন প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ত্যাগ করেনি। [দ্র.নলিনীকান্ত ভট্টাশালী, *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম*, মোঃ রেজাউল করিম অনুদিত (ঢাকা : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার পর বেঙ্গল স্টাডিজ, ১৯৯৯) পৃ. ৭০; গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ -উস- সালাতীন* [আকবর উদ্দীন অনুদিত] (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ৮৭।]

৭৫ AP. Phy, (Journal of the Asiatic Society of Pakistan, *JASP.* Vol. 8,P. 65.

৭৬ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, পৃ. ২৩১-২৫৪।

৭৭ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma* (Jerusalem : Hebrew University, 1981), p. 18.

৭৮ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল* (চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯।

৭৯ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩।

৮০ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ৫১; এনামুল হক ও আবদুল করিম, *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫।

৮১ M. Robinson & L.A. Shaw: *The Coins and Bank notes of Burma,* Manchester, England, 1980, p.45.

৮২ Abdul Karim, Was Chittagong ever a Cap[ital Cityu? A fresh study of some rare coins of Chittagong, *JASB,* Vol. XXXI (1) June.

৮৩ Harvey, *History of Burma, op.cit.*, p. 137, পৃ. ৫১।

৮৪ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৬; আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মোগল আমল* (রাজশাহী : ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২), পৃ. ২১৮। উল্লেখ্য, কোন কোন গবেষক মনে করেন, আরাকান রাজাগণ বাংলার করদ রাজা ছিল না বরং মুসলমানদের উন্নত সভ্যতা গ্রহণের নিমিত্তেই তাদের বৌদ্ধ নামের সাথে মুসলিম নাম ও মুদ্রায় কালেমা উৎকীর্ণ করত। [দ্র: এনামুল হক ও আবদুল করিম,*আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬; মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২; Yunus, *A History of Arakan, op.cit.*, pp. 35-36 এবং আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ*, (চট্টগ্রাম : কথামালা প্রকাশন, ১৯৯২), পৃ. ৮৪-৯৮।]

৮৫ M.S. Collis, "Arakan's place in the civilization of the Bay," Journal of the Burma Research Society, 50th Aniversary Publication, No. 2, Rangoon, 1960, p. 491.

৮৬ অমৃতলাল বালা,*আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮।

৮৭ Hall, *A History of South-East Asia,* (London: The Macmillan Press Ltd., 1994), p. 421.

৮৮ M. Siddiq Khan, "The Tragedy of Mrauk-U-(1660-1666)", *JASP*, vol. XI, No. 2, August 1966, p. 198.

৮৯ বিস্তারিত দেখুন আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস - মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত ১২০০-১৮৫৭* (ঢাকা : বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৬৮-৭২।

৯০ *তদেব;* J.C. Powell price, *A History of India* (London : Jhomas Nelson, 1950), p. 342; George Durber, *A History of India from the Earliest Times to Nineteen Thirty Nine* (London : Nicholson and Watson, 1939), pp. 259-60; S.W.Cooks, *A Short History of Burma* (London : Macmellan, 1910), pp. 203-204 and G.E. Harvey, "The Fate of Shah Shuja, 1661" *Journal of the Burma Research Society*, Vol. xii, August 1922, pp. 107-12.

৯১ Hall, *A History of South-East Asia, op.cit.*, p. 422; ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস, প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল* (চট্টগ্রাম : আলমবাগ প্রকাশনী, ১৯৮২), পৃ. ১২২। উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি, শাহ সুজা রোসাঙ্গে আইলা দৈব গতি/হতবুদ্ধি পাত্র সবে দিল হতমতি/কারাগারে পৈলু আমি না পাই বিচার/ যত ইতি বসতি হৈল ছাড়খার। [দ্র: আলাউল বিরচিত *সিকান্দার নামা*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭) পৃ. ২৮।

৯২ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬৮; S.M.Ali, "Arakan Rule in Chittagong", *Journal of Asiatic Society of Pakistan,* Vol. xii, No. 3, 1967, pp. 331-51.

৯৩ এন.এম. হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, পূর্বোক্ত*, (ঢাকা: বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৯৫) পৃ. ৮৭।

৯৪ H.J.S. Cotton, *Memorandum on the Revenue History of Chittagong,* (Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1880), pp. 18-19.

৯৫ *Ibid,* p. 92.

৯৬ *Ibid,* p. 93.

৯৭ A.M. Sirajuddin, *The Revenue Administation of the East India Company in Chittagong* (Chittagong : University Press, 1971), p. 127.

৯৮ আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস ও প্রসঙ্গ কথা, *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৫শ - ২০বর্ষ সম্মিলিত সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮৮-চৈত্র ১৩৯৩, পৃ. ৮৯।

৯৯ হারির প্রকৃত নাম ছিল ঘা থিন ডা (NGa Thin Da) এবং পদবী ছিল মোথুজী (Myothogyi) [দ্রঃ আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯০।]

১০০ D.G.E. Hall, *Burma*, (New York: Hutchinson University Library. 1950), p. 94.

১০১ রতন লাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক, ১৭৮৫-১৮২৪* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪), পৃ. ৯।

১০২ *তদেব।*

১০৩ আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯০।

১০৪ Harvey, *History of Burma, op.cit.,* p. 149; Hall, *A History of South East Asia, op.cit.,* p. 402; আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬-৮৮।

১০৫ রতনলাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯।

১০৬ *তদেব।*

১০৭ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ২৬-২৭; A. Aspinal, ÒEnglish Relations with Burma in the time of Cornwallis and shore (1786-1798)Ó, *Bengal past and present*, Vol.XL. Part, II, 1930, p. 101.

১০৮ Harvey, *History of Burma*, p.180.

১০৯ *Ibid.,* 270-73; হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৯০।

১১০ এ প্রেক্ষিতে তিনি আরাকানের গভর্নর হারি (Hari) বা ঘা থিন ডা (Nga-thin-Da) কে চল্লিশ হাজার সৈন্য ও চল্লিশ হাজার মুদ্রা প্রদান করতে বলেন। [দ্রঃ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৯০।] সিন পিয়ানের চিঠিতে বিশ হাজার সৈন্য ও বিশ হাজার বন্দুক দাবি করার কথা উল্লেখ রয়েছে। [দ্রঃ Secret Consultation, 29 October, 1813, No. 28, *MSKC*, Secret Procedings, Vol. 6, 1721-26.]

১১১ Captain of Infantry to the Secretary to Government, 19 February, 1799, *BSR*, CD, Vol. 515, pp. 49-102.

১১২ Harvey, *History of Burma*, p. 280.

১১৩ Hall, *Burma*, p. 94.

১১৪ *Ibid.,* p. 95.

১১৫ Lieutenant Colonnel to the Commander-in-Chief PC, 25 April, 1794, No. 14, *MSKC*, PP, Vol. 1, p. 195. উল্লেখ্য যে, মরহুম মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি এক সময়ে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি ভারত সরকারের ন্যাশনাল আর্কাইব থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, যার অধিকাংশই এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত।

১১৬ Anil Chandra Banerjee, *The Estern frontier of India* (Calcutta : Mukhergee, 1964), p. 59.

১১৭ Colonel to the Secretary to Government, PC, 10 November 1794, No. 41, *MSKC*, PP, Vol. 1, p. 234.

১১৮ R.B. Pearn, "King Bearing", *JBRS*, XXIII, Part 1, 1933, p. 57.

১১৯ Walter Hamiltan, *A Geographical Statistical and Description of Hindustan and Adjacent Countries*, Vol. 1, Reprint (Delhi : 1971), p. 168.

১২০ J. Stuart, "An Appeal for more light on Arakane History", *JBRS*, Vol. VIII, Part. 1, 1923, p. 95.

১২১ A. Aspinal, "English Relations with Burma," p. 101.

১২২ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক,* পৃ. ১১-১২; J. Stuart, "Political History of the Extraordinary Events Which led to the Burmese war," *JBRS,* Vol. XI, Part. III, 1921, p. 114.
১২৩ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক,* পৃ. ১১-১২।
১২৪ *তদেব,* পৃ. ১৫।
১২৫ *তদেব,* পৃ. ১৩।
১২৬ Harvey, *History of Burma,* p. 281.
১২৭ B.R.Pearn, "King Berring," *JBRS.* Vol. XXII, Part. 1, 1933, p. 55. উল্লেখ্য, সম্ভবতঃ সিন পিয়ান রাজা উপাধি ধারণ করেছিলেন বলে কিংবিয়ারিং (King Bearing) শব্দটি বিকৃত হয়ে কিংবেরিং এ পরিণত হয়েছে।(দ্রঃ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস,* পৃ. ৯১।)
১২৮ বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্ত সংলগ্ন নাফ নদীর তীরে একটি ছোট ভূ-খণ্ডের নাম মুরুসুগিরি। কোম্পানির নথিপত্রে খানডি মুরুসিগিরি নামেই পরিচিত এবং তার নামানুসারেই ভূ-খণ্ডটির নামকরণ করা হয়। [দ্রঃ চক্রবর্তী,*বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক,* পৃ. ১০৭-৮]
১২৯ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক,* পৃ. ১০৭-৮।
১৩০ Civil Surgeon to the Collector of Chittagong, 28 January, 1811, BSR, CD, vol. 89, p. 35.
১৩১ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক,* পৃ. ১০৮।
১৩২ *তদেব,* পৃ. ১০৯।
১৩৩ Secretary to Government to the Envoy to the Court of Ava. PC, 6 September, 1811, No. 50, *MSKC,* PP, Vol. 5, p. 1267.
১৩৪ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক,* পৃ. ১০৯।
১৩৫ Pearn, "King Berring," pp. 55-56.
১৩৬ Envoy to the Court of Ava to the viceroy of pegu, PC, 22 November, 1811, No. 4, *MSKC,* PP, Vol. 5, pp. 1306-12.
১৩৭ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক,* পৃ. ১১১।
১৩৮ B.R. Pearn "King Bearing" *JBRS* Fifteenth Anniversary Publications No. 2. pp. 456-57.
১৩৯ Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, SC, 25 June, 1812, No. 18, *MSKC,* SP, Vol. 4, pp. 1038-40.
১৪০ Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, SC, 12 June, 1812, No. 18, *MSKC,* SP, Vol. 3, pp. 821-28.
১৪১ Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, SC, 15 June, 1812, No. 41, *MSKC,* SP, Vol. 4, p. 1054.
১৪২ Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, SC, 25 November, 1812, No. 71, *MSKC,* SP, Vol.5, pp. 1325-31.
১৪৩ আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস", পৃ. ৯২।
১৪৪ Magistrate of Chattagong to the Secretary to Government, SC, 15 January, 1813, No. 26, *MSKC,* SP, Vol. 5, pp. 1395-1400.
১৪৫ Secretary to Government to the Magistrate of Chittagong, SC, 12 November, 1813, No. 29, *MSKC,* SP, Vol. 6, p. 1756.
১৪৬ আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস", পৃ. ৮৩।
১৪৭ Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, PC, 17 May, 1816, No. 48, *MSKC,* PP, Vol. 7, pp. 24-28.

১৪৮ Magistrate of Chittagong to the Secretary to Government, PC, 27 July, 1816, No. 19, *MSKC,* PP, Vol. 7, pp. 29-41.
১৪৯ Governor of Arakan to the Magistrate of Chittagong, PC, 14 June, 1817, No. 32, *MSKC,* PP, Vol.7, pp. 94-96.
১৫০ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক,* পৃ. ১২৬-২৭।
১৫১ সিরাজুল ইসলাম, *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক,* পৃ. ৭৪-৭৫।
১৫২ D G E, Hall, *Europe and Burma* (London : Oxford University Press, 1945), p. 103.
১৫৩ Hall, *Burma,* p. 13.
১৫৪ Hall, *Europe and Burma,* p. 108.
১৫৫ *Ibid.*; Harvey, *History of Burma,* p. 293.
১৫৬ Harvey, *History of Burma,* p. 293.
১৫৭ Sub-Assistant Commissioner to the Magistrate of Chittagong, PC, 7 June, 1822, No. 47, *MSKC,* PP, Vol. 9, pp. 341-43.
১৫৮ Banerjee, *The Estern Frontier of India,* pp. 192-94.
১৫৯ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক,* পৃ. ১৪৬।
১৬০ *তদেব,* পৃ. ১৪৭।
১৬১ Secret Letter to Court, 9 February 1824, *MSKC,* PP, Vol. 10, pp. 40-42.
১৬২ Secret Letter to Court, 23 February 1824, *MSKC,* PP, Vol. 10, p. 52.
১৬৩ চক্রবর্তী, *বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক,* পৃ. ১৫৩।
১৬৪ Proclamation of war, 5 March, 1824, SC, No. 2, *MSKC,* PP,Vol. 10, pp. 126-32.
১৬৫ সিরাজুল ইসলাম, *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক,* পৃ. ৯৬।
১৬৬ Hall, *Europe and Burma,* p. 115.
১৬৭ *Ibid.*, pp.115-16.
১৬৮ W.S. Desai, *A Pageant of Burmese History* (Bomby : Orient Longmens, 1961), pp. 131-39.
১৬৯ *Ibid.*, pp. 131-39; 141-47.
১৭০ D.P.Singhal, *The Annexation of Upper Burma* (Singapore : Eastern University Press, 1960), pp. 91-94.
১৭১ *Ibid.*
১৭২ *Ibid.*, pp. 16-17.
১৭৩ সিরাজুল ইসলাম, *ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক,* পৃ. ১৩।
১৭৪ Maung Maung, *Burma in the Family of Nations* (Amsterdam : Uitgverij Djambatan, 1956), p. 44.
১৭৫ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস,* পৃ. ৯৮।
১৭৬ তদেব।
১৭৭ *তদেব,* পৃ. ৯৯।
১৭৮ আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস", পৃ. ৯২।
১৭৯ Philip Nolan, *Report on Emigration from Bengal to Burma. Proceeding of Governor General 1888,* Bangladesh National Archives, p. 4.
১৮০ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* , পৃ. ৩৬-৩৭।
১৮১ Hall, *A History of South East Asia,* pp.780-81.

১৮২ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০০।
১৮৩ *তদেব*।
১৮৪ *তদেব*, পৃ. ১০১।
১৮৫ *তদেব*, পৃ. ১০৫।
১৮৬ উল্লেখ্য, থাকিন শব্দের অর্থ মালিক। (তদেব, পৃ. ১০৬।)
১৮৭ Yunus, *A History of Arakan,* pp. 102-103.
১৮৮ সামিউল আহমদ খান, "রোহিঙ্গা মুসলমান" *ইসলামিক ফাইন্ডেশন পত্রিকা*, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, তেইশ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃ. ২২৬।
১৮৯ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৬-১৪৭।
১৯০ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী*, পৃ. ৪০; আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৭।
১৯১ "বার্মার মুসলমান" মুহাম্মদ রুহুল আমিন অনূদিত, তেহরান টাইমস, ২৪ মে ১৯৮৩ এর সৌজন্যে, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, তেইশ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃ. ২১৭।
১৯২ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৬।
১৯৩ Yunus, *A History of Arakan,* p. 105.
১৯৪ *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৭; অচিন সাঁই, "আরশী নগর" *দৈনিক জনতা*, ২৭ নভেম্বর ১৯৯১ এবং মোঃ শাহেদ হুসেইন, "আরাকান : আরেক কাশ্মীর" *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ নভেম্বর, ১৯৯১।
১৯৫ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৭।
১৯৬ *তদেব*।
১৯৭ Muin-ud-Din Ahmad Khan, *Muslim Communities of South-Esat Asia: A Brif Survey* (Chittagong: Islamic Cultural Centre, 1980) p. 54; Abdur Razzaq and Mahfuzul Haque, *A Tale of Refugees : Rohingyas in Bangladesh*, pp. 15-16.
১৯৮ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মোঃ মাহফুজুর রহমান "রংপুর সুবীরনগরে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির: প্রসঙ্গিক পর্যালোচনা" *এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* বিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০০২, পৃ. ১৪৭-১৬১।
১৯৯ *তদেব*।
২০০ *তদেব*, পৃ. ১০৮।
২০১ Burma National Army (BNA) Burma Independent Army (BIA) এর পরবর্তী নামকরণ।
২০২ Burma Independent Army (BIA) এর বাহিনী প্রধান হিসেবে কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ জাপান সরকার অং সানকে জেনারেল উপাধিতে ভূষিত করেন। (দ্রঃ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৭)।
২০৩ Yunus, *A History of Arakan,* pp. 114-18; হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৮-১০৯।
২০৪ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৮-১০৯।
২০৫ *তদেব*,১০৯।
২০৬ *তদেব*।
২০৭ বার্মার মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে ১৯৩৬ সালে GCBMA প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বার্মায় জাপানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে বার্মার সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালে বার্মা হতে জাপানীদের বিতাড়নের পর এটি পুনর্গঠিত হয় এবং বার্মার মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কর্মকাণ্ড শুরু করে। [দ্রঃ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০২।]

২০৮ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, pp. 75-96; হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৮- ১১০।

২০৯ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৭; হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১১৩।

২১০ Abdur Razzaq and Mahfuzul Haque, *A Tale of Refugees : Rohingyas in Bangladesh*, (Dhaka : Center for Human Rights 1995), p.16; Yunus, *A History of Arakan*, pp.122-123; David 1. Stenbarg, "Constetutional and Political Bases of Minority Insurrection in Burma" *Armd Separatisisum in South Asia,* (Singapor: Institute of South East Asian studies, 1984), p. 60.

২১১ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, ১০৩; *Insaf,* Rohinyas' Voice and Vision, Vol. 10. June 1997, pp. 3-4.

২১২ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, pp. 75-96; হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৩।

২১৩ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১০৪।

২১৪ তদেব।

২১৫ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৮।

২১৬ তদেব।

২১৭ Mohammad Yusuf, "The plight of the Rohingyas: A living Human Tragedy in Arakan, "*Arakan*-Official Mouthpiece of ARIF, vol. 5, ISSUE 7, 31 July 1992, pp. 5 - 6.

২১৮ Yunus, *A History of Arakan*, p. 133.

২১৯ Kala বা কলা শব্দের অর্থ প্রথমত: ভারতীয় এবং দ্বিতীয়ত: পাশ্চাত্যের অধিবাসী বা যে কোন বিদেশী, যেমন : ইউরোপীয় বা আরবীয়। [দ্রঃ H. Yule, *A Narative of the Mission Sent by the Governor General of India to the Court of Ava in 1855*, p. 5; সিরাজুল ইসলাম, ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক, পৃ. ১৬৯।] মূলত: বর্মীরা এ শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বিদেশী বুঝিয়ে থাকে।

২২০ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১১৫ ।

২২১ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১১৬ - ১১৭ এবং Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, pp. 96-98.

২২২ জাফর হুসাইন ১৯১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর আকিয়াব জেলার বুচিদং শহরের (Township) আলী চং (Ali Chaung) গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা সুলতান হুসাইন এবং দাদার নাম মাওলানা আবদুল বারী; তারা ছিলেন আবরীয় বংশোদ্ভূত এবং অত্র টাউনশীপের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম। বাল্যকাল থেকে জাফর ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও মেধাবী। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষে আকিয়াব জেলা শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ইংরেজি ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। বাল্যকাল থেকেই কাওয়ালী গানের প্রতি তার ভীষণ ঝোঁক ছিল এবং স্কুল জীবনে তিনি সংগীত চর্চায় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। স্কুল জীবনেই তিনি জাফর কাওয়াল হিসেবে পরিচিত হন। তিনি রোহিঙ্গাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাওয়ালী পরিবেশনের মাধ্যমে মুজাহিদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। অতঃপর ১৯৫০ সালের ২১ অক্টোবর আততায়ীর হাতে নিহত হন। তিনি রোহিঙ্গাদের নিকট মুজাহিদ-ই-আজম হিসেবে সমাদৃত। [দ্রঃ "Tribute to a departed revolutionary: Martayr Mujahid-e-Azam Jafar Hussain Kawwal" *Insaf. Rohingyas Voice and Vision,* vol. 3, Issue 2-3, 30 September, 1986, pp. 17-22.]

২২৩ কাওয়ালী এক ধরনের লোক সঙ্গীত; যা একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রশংসা এ ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জাফর কাওয়াল হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর বিপ্লবী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে কাওয়ালী রচনা করতেন এবং রোহিঙ্গাদের নির্যাতিত জীবন চিত্রকে উপস্থাপন করে মুক্তির জন্য মহানবীর আদর্শ অনুসরণে জেহাদে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান।

২২৪ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, p. 99; *Insaf. Rohingyas Voice and Vision*, pp. 17-22; *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০ নভেম্বর, ১৯৯১, ঢাকা।

২২৫ বৃটিশ-বার্মা শাসিত আরাকানে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে জাফর কাওয়াল প্রাথমিকভাবে বিপ্লবাত্মক কাওয়ালী গেয়ে জনগণকে তাদের অধিকার আদায়ে সচেতন করে তোলেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ২০ আগষ্ট বুচিদংয়ের দাব্রুচং (Dabbru-Chaung) গ্রামে জাফর কাওয়ালের নেতৃত্বে মুজাহিদ পার্টি সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। বার্মা স্বাধীনতা অর্জনকালে এ পার্টির পক্ষ থেকে স্বাধীনতা অথবা পূর্ণস্বায়ত্ত শাসন দাবী করে ব্যর্থ হলে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে বুচিদং শহরের ১২ মাইল উত্তরে টং বাজার নামক স্থানে এক সমাবেশ করে আন্দোলনের নীতি পুনর্নির্ধারণ করেন এবং পরবর্তীতে ক্রমশ সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। [দ্রঃ *Insaf. Rohingyas Voice and Vision*, pp. 17-22.]

২২৬ মুহাম্মদ আব্বাস ছিলেন মুজাহিদ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। আবদুর রশীদ, আবদুর রহমান, আবদুশ শুকুর এবং আবুল কাশিম বা কাশিম রাজা প্রমুখ মিলে জাফর কাওয়ালের নেতৃত্বে মুজাহিদ পার্টি গঠন করেন।

২২৭ মুহাম্মদ কাশিম মুজাহিদ পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি সশস্ত্র সংগ্রামকেই রোহিঙ্গাদের একমাত্র মুক্তির পথ হিসেবে উপলব্ধি করে Rohingya Liberation Front গঠন করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই এ আন্দোলন ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। এমনকি তিনি রাজা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। সরকারিভাবে তাকে ডাকাতের সরদার আখ্যা দিয়ে গ্রেফতারের জন্য আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার এলাকায় তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তার মৃত্যুর পর এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। [দ্রঃ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, p. 99 এবং আরাকানের মুক্তি সংগ্রাম ও তার উৎস, পৃ. ১০৩।]

২২৮ Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, p.99; Yunus, *A History of Arakan*, pp.133 - 135.

২২৯ *The Pakistan Times*, 27 August 1959; Moshe Yegar, *The Muslims of Burma*, p. 82.

২৩০ *Ibid.*

২৩১ *The Pakistan Times*, 27th August 1959.

২৩২ *Ibid.*

২৩৩ *Ibid.*

২৩৪ *Ibid.*

২৩৫ *Ibid.*

২৩৬ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, পৃ. ১১৮।

২৩৭ *তদেব*, পৃ. ১১৮-১৯।

২৩৮ *The Daily Guardian*, Rangoon, 27 October, 1960.

২৩৯ *Ibid.*

২৪০ *Ibid.*

২৪১ ওসমান গণি মনসুর, "আরাকানে স্বাধীনতার লড়াই; *নতুন ঢাকা ডাইজেষ্ট*, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯১, ঢাকা; আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ১৪৯; *নিউজ লেটার*, আরএসও ১ম সংখ্যা ডিসেম্বর, ১৯৮৯, পৃ. ২; Yunus, *A History of Arakan*, p. 148 এবং *দৈনিক সংবাদ*, ৭ অক্টোবর ১৯৮৭, ঢাকা।

২৪২ Yunus, *A History of Arakan*, p. 148.

২৪৩ *Ibid.*, p. 148 এবং ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস*, পৃ. ২৯।

২৪৪ *Ibid.*

২৪৫ *Ibid.*

২৪৬ এটি ১৯৫০ সালে আরাকানের মংডু শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসমুল আলম চৌধুরী এবং মাষ্টার বদিউর রহমান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সংগঠনটি ১৯৬৪ সালে নে উইন কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। [আশরাফ আলম, আরাকান হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রাপ্ত।]

২৪৭ ছাত্র-যুব সমাজের মাঝে ইসলামি চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য ১৯৫৬ সালে রেঙ্গুনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আবদুল মান্নান (U Tin Win) এবং রশীদ বা মং (Rashid Ba Maung) যথাক্রমে এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব।]

২৪৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোহিঙ্গা মুসলমান ছাত্রদের মাঝে ইসলামি চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৯ সালের ৩ ডিসেম্বর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে মোহাম্মদ হুসাইন কাশিম এবং মোহাম্মদ খান দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব।]

২৪৯ রোহিঙ্গা আলিম সমাজকে একতাবদ্ধ করার জন্য এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবদুল কুদ্দুস এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। [তদেব।]

২৫০ সুবহান উকিলের নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। [তদেব।]

২৫১ আরাকানের মুসলিম যুব সমাজকে ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে নৈতিকতা গঠনের নিমিত্তে মোহাম্মদ কাশিম (Nata Kasim) ও মং মং গিয়াই (Maung Maung Gyi) এর নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। [তদেব।]

২৫২ রোহিঙ্গা ছাত্রদের মাঝে দ্বীনি চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে শাহ্ আলম ও শাহ্ লতিফ এর নেতৃত্বে রেঙ্গুনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরোলেখিত সংগঠনসমূহ ১৯৬৪ সালে নে উইন কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। [তদেব।]

২৫৩ Yunus, *A History of Arakan*, pp. 149-50 .

২৫৪ *Ibid.*

২৫৫ National Refugee Week, *The Refugee Council of Australia*, 17 June, 1992, p. 37.

২৫৬ ডক্টর অং, "বার্মায় মুসলিম সমাজ : অতীত এবং বর্তমান; *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩১ মে, ১৯৯১ ঢাকা এবং তামো " বার্মার মুসলমান : এক নিদারুণ দুঃসময়ের মুখোমুখি" *দৈনিক আজাদ*, ৬ জানুয়ারি, ১৯৯১, ঢাকা।

২৫৭ Yunus, *A History of Arakan*, pp. 150-51.

২৫৮ *Ibid.*

২৫৯ *Ibid.*

২৬০ *Ibid.*

২৬১ *দৈনিক জনতা*, ১৭ নভেম্বর ১৯৯১।

২৬২ Yunus, *A History of Arakan*, pp.152-53.

২৬৩ *Ibid.*

২৬৪ *Ibid.*

২৬৫ *Ibid.*

২৬৬ *The Bangladesh Observer*, 8, 14 May, 1978; *The Bangladesh Times*, 21 May, 1978; *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ নভেম্বর, ১৯৯১।

২৬৭ আবদুল মাবুদ খান, "আরাকানে মুক্তি সংগ্রাম", পৃ. ১০২।

২৬৮ আরাকানের নাগরিকদের দেশের অভ্যন্তরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের জন্য National Registration Card (NRC) ব্যবহার করা হয়। এ কার্ড কারো কাছে না থাকলে তাকে অনুপ্রবেশকারী কিংবা বিদ্রোহী বলে সন্দেহ করে দেশীয় আইনে তাকে শাস্তি দেবার বিধি রয়েছে। সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত এ কার্ড প্রতি ১০ বছর পর পর ইস্যু করা হয় এবং এগার বছর বয়সের নিচে কারো জন্য এ কার্ড ইস্যু করা হয় না। প্রতি দশ বছর পর NRC পরীক্ষা করতে এলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি

হয়, কেননা ১০ বছর আগের ১১ বছরের সেই শিশুটি এখন ২১ বছরের যুবক/যুবতী। তখন তাকে বিদেশী নাগরিক, অনুপ্রবেশকারী কিংবা বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে জেলে পাঠানো হয়। অনেক সময় সামরিক কিংবা পুলিশ বাহিনীর লোক এসে বিভিন্ন তলাশীর নাম করে NRC ছিনিয়ে নেয় এবং আর কখনো এ কার্ড ফেরৎ দেয়া হয় না। ফলে বহু নাগরিক অযথা হয়রানির শিকার হন। (দ্রঃ আবদুল মাবুদ খান, "আরাকানে মুক্তি সংগ্রাম", পৃ. ১০৬)।

২৬৯ মুহাম্মদ আবুল হোসেন মাহমুদ, *বার্মায় মুসলিম গণহত্যা* (ঢাকা : বর্মী মুসলিম কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটি, ১৯৭৮), পৃ. ৪; *The Bangladesh Illustrated Weekly,* May 14-21, 1978.

২৭০ Documentation, *Warld Press On Rohingya Muslim Refugees in Bangladesh,* 1978-79, compiled by N. Kamal, Chittagong, 56-58; মাহফুজউল্যাহ / জাহিদুল করিম, প্রচ্ছদ কাহিনী, "মানুষ আসতি আছে নাফ নদীর বানের লাহান" *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ৬ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা, ১২ মে, ১৯৭৮।

২৭১ *The Bangladesh Illustrated Weekly,* May 14-21, 1978.

২৭২ *Ibid.*

২৭৩ *Ibid.*

২৭৪ *Ibid.*

২৭৫ *Ibid.*

২৭৬ *Ibid.*

২৭৭ কাজী নিজামুল হক, "শতাব্দীর শিকার : বর্মী মুসলমান" *দৈনিক সংগ্রাম,* ২২ আগষ্ট, ১৯৭৯।

২৭৮ *Insaf, Rohingyas' Voice & Vision,* vol. 3, Issue 2 - 3, 30 September, 1986, Arakan, Burma, p. 7.

২৭৯ *Ibid.*

২৮০ *Ibid.*

২৮১ Yunus, *A History of Arakan,* p. 155.

২৮২ ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস,* পৃ. ২৬-২৭।

২৮৩ *New Straits Times,* 11 November, 1992.

২৮৪ ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস,* পৃ. ২৬-২৮।

২৮৫ *তদেব,* পৃ. ২৮-২৯; আবুল হোসেন মাহমুদ, *বার্মায় মুসলিম গণহত্যা,* পৃ. ৫০।

২৮৬ ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস,* পৃ. ২৯।

২৮৭ *তদেব।*

২৮৮ আবুল হোসেন মাহমুদ,*বার্মায় মুসলিম গণহত্যা,* পৃ. ৫০।

২৮৯ *"বার্মার মুসলমান" মুহাম্মদ রুহুল আমিন অনুদিত,* পৃ. ২১৭।

২৯০ *Genocide in Burma Against The Muslim of Arakan,* published by Rohingya Patriotic Front, Arakan, Burma, pp. 2-7.

২৯১ Headquarters of 1978 Rohingya Refugee Control Room in Ukiya, Bangladesh. উল্লেখ্য, N. Kamal, Bangladesh Red Cross Society 1978 as quoted in: Kamaluddin, 1983, p. ১46.

২৯২ *দৈনিক আজাদ ও দৈনিক কিষান,* সম্পাদকীয় ৩০ এপ্রিল, ১৯৮১।

২৯৩ আবদুল মাবুদ খান, "আরাকানে মুক্তি সংগ্রাম," পৃ. ১০০।

২৯৪ Yunus, *A History of Arakan,* pp. 153-54.

২৯৫ আবদুল মাবুদ খান, " আরাকানে মুক্তি সংগ্রাম," পৃ. ১০৩ - ৪।

২৯৬ *দৈনিক ইত্তেফাক,* ২১ জুন, ১৯৯১ ও ২৬ জানু:, ১৯৯২; *দৈনিক সংগ্রাম,* ২৩ জুন, ১৯৯১; *দৈনিক ইনকিলাব,* ২০ অক্টো:, ১৯৯১।

২৯৭ *নিউজ লেটার,* আরএসও, আরাকান, ২য় সংখ্যা, ফেব্রু: ১৯৯০, ৭ ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ১১।

অধ্যায় ২
আরাকানী প্রশাসন ও মুসলিম সভাসদ

আরাকানের প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের [খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত] শাসন কাঠামো ছিল রাজতান্ত্রিক।[১] সপ্তম শতাব্দীর সমসাময়িক কালের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ার চন্দ্রসূর্য বংশের শাসকদের সময়ে আরাকানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলেও চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তা সামাজিক ও ধর্মীয় পর্যায়ে সীমিত ছিল। মূলত ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে মিনসুয়ামুন বা সোলায়মান শাহ কর্তৃক আরাকান পুনর্দখলের পর থেকে সেখানকার রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে ইসলামের প্রসার ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু এ প্রভাব ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা নয় বরং প্রশাসনের কিছু কিছু ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল মাত্র। এ প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিসীমাকে অত্র অধ্যায়ে আলোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

২.১ আরাকানী প্রশাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলার সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের (১৪১৫-১৬; ১৪১৮-৩৩ খ্রি.) সহায়তার সুবাদে নরমিখলা কর্তৃক আরাকান পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে সেখানকার রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোতে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতিফলন ঘটলেও একাদশ শতাব্দীতেও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে মুসলমানদের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরাকানের পিনসা বা চাম্পাওয়াত বংশের শেষ রাজা পোন্যাক (Ponnaka-1054-58) এর রাজত্বকালে ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দে পগাঁ (Pagan) রাজা আনওয়ারাথা (Anwaratha-1044-1077) আরাকান জয় করে পঁগা রাজ্যের সীমাকে বৃদ্ধি করেন[২] এবং কৌলিন্য অর্জন ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য আরাকানের বৈশালী রাজকন্যা পঞ্চকল্যানী (Pancha Kalyani) কে বিয়ে করেন। অতঃপর তিনি ১০৫৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ও পাট্টিকারা (বর্তমান বাংলদেশের বৃহত্তর কুমিল্লা) জয় করে তৎকালীন বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান।[৩] ইতোপূর্বে বার্মা, আরাকান ও বাংলায় মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু আনওয়ারাথা'র শাসনামলে আরাকান, চট্টগ্রাম ও পাট্টিকারা অঞ্চলে হীনযান বা থেরবাদ বৌদ্ধমত প্রচারিত হয়। রাজা আনওয়ারাথাই উদার ধর্মীয়নীতি গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমান বণিক, নাবিক, ধর্ম প্রচারকদের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দেন এবং রাজ্যের সৈন্য বিভাগসহ তাঁর নিজের দেহরক্ষী বাহিনীতেও মুসলমানদের নিয়োগ দান করেন।[৪] শুধু তাই নয়, তার সন্তানের গৃহশিক্ষক হিসেবে জনৈক মুসলিম ব্যক্তিকে নিয়োগ দেন। ফলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে প্রথমবারের মতো মুসলমানদের কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

আনওয়ারাথা'র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাউলু (Sawlu) ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শৈশবকালের মুসলিম গৃহ শিক্ষকের পুত্র, দুধভাই ও বাল্যবন্ধু আবদুর রহমান খান [বর্মী ভাষায় ইয়ামানকান][৫] কে বন্ধুত্বপ্রীতির নিদর্শন স্বরূপ উস্‌সা (Ussa) নগরীর (বর্তমান পেগু) শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কারণে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে সউলুর সাথে আবদুর রহমান বিজয়ী হলেও সউলুর অপর ভাই কানজিথা'র ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন।[৬] বিস্তারিত ঘটনায় বলা যায়, সউলু পগাঁ এবং আবদুর রহমান খান পেগু শাসন করা কালীন সউলু অচিরেই বিলাসী ও অলস প্রকৃতির আড়ম্বর জীবন শুরু করলে উভয়ের বন্ধুত্বে ভাটা পড়ে। উভয়ে একদিন পাশা খেলার সময় আবদুর রহমান খান জয়লাভ করে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেন। এতে পরাজিত সউলু রহমান খানের উপর ভীষণ রেগে যান এবং বলেন, তুমি সাধারণ একটি পাশা খেলায় জয়লাভ করেই হাততালি দিচ্ছ, যদি সাহসী পুরুষ হও তবে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর। এতে রহমান জিজ্ঞেস করেন- তুমি একথা সত্যিই বলছ? সউলু উত্তর দিলেন, রাজারা কি কখনো মিথ্যা বলে থাকে? রহমান খান রাজার এ আহ্বান গ্রহণ করে বিদ্রোহ করেন এবং প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহপূর্বক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। উভয়ের মধ্যে থায়েটমায়ু (Thayetmyo) অঞ্চলের পাইডা থাজুন (Pyedawthagyun) নামক সুরক্ষিত দ্বীপে যুদ্ধ হল। যুদ্ধে রাজা সউলু রহমান খানের নিকট পরাজিত ও বন্দী হলেন। সউলু'র বৈমাত্রেয় ভাই কানজিথা সউলু'কে উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অতঃপর রহমান খান সউলুকে হত্যা করে পঁগা রাজ্যও শাসনের প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু পগাঁর লেডউইনের এগারটি গ্রামের শাসনকর্তা কানজিথাকে পরাজিত করার পরামর্শ দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদ। কিন্তু কানজিথা'র সাথে তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইরাবতী নদী দিয়ে স্বর্ণখচিত নৌকায় চড়ে আরাকানের নিম্নাঞ্চলের দিকে পালানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু কানজিথা'র সুদক্ষ শিকারী ঘা সিংগু (Nga Singu) নদীর তীরবর্তী ডুমুর গাছে (Telhahpan tree) বসে সুললিত কণ্ঠে পাখির মত গান গাইতে থাকে। রহমান খান পাখিটিকে দেখার অভিপ্রায়ে নৌকার ছাউনী থেকে মাথা বের করতেই শিকারী সুতীক্ষ্ণ তীর দ্বারা চক্ষু ছেদন করে তাঁকে হত্যা করে। এভাবেই আবদুর রহমান খানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বার্মা তথা আরাকান অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে মুসলিম প্রভাবের উদয়লগ্নেই সূর্য অস্তমিত হয়। ফলে আরাকান তথা বার্মার প্রশাসনে মুসলিম প্রভাব সূচনালগ্নেই সমাপ্তি ঘটে।

আরাকান প্রশাসনে ইসলামের প্রভাব বিস্তারের মূলধারা শুরু হয় নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহের রাজত্বকালে। তিনি দীর্ঘ ২৪ বছর (১৪০৬-১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার সুলতানদের আশ্রয়ে থেকে ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সহযোগিতায় পিতৃরাজ্য আরাকান পুনরুদ্ধার করেন। বাংলার সুলতান দুপর্বে তাকে যে পঞ্চাশ হাজার সৈনিক দিয়ে রাজ্য পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করেছিলেন তার অধিকাংশ সৈনিকই ছিল মুসলমান। নরমিখলা আরাকানের রাজধানী লংগিয়েত পুনরুদ্ধার করে তাড়াতাড়ি সৈনিকদেরকে বাংলায় ফেরত দেবার পক্ষপাতি ছিলেন না; কেননা বার্মা রাজা

পুনঃআক্রমণ করলে তা মোকাবেলা করার মত সুলতান প্রেরিত সৈনিক ছাড়া কোন বিকল্প শক্তি তাঁর হাতে ছিল না। নরমিখলা প্রায় তিন বছর লংগিয়েতকে রাজধানী রেখে আরাকান শাসন করলেও বর্মীদের হাতে নিজকে নিরাপদ মনে করতে পারেননি। তাই তিনি ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে লংগিয়েত থেকে স্থানান্তর করে আকিয়াব জেলার লেম্ব্রু নদীর তীরবর্তী বর্তমান পাথুরে কেল্লা বলে পরিচিত প্রাচীন ম্রাইক-উ (Mrauk-U) নগরীতে ম্রোহং নাম দিয়ে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।[৭] এ সময় থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বর্মীরাজা বোধাপায়া কর্তৃক আরাকান দখলের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৩৫২ বছরকাল ম্রোহংই আরাকানের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নরমিখলা ম্রোহংয়ে নতুন রাজধানী স্থাপন করার পর যে নতুন রাজবংশের সূচনা হয় তা প্রাচীন ম্রাউক-উ নগরের নামানুসারে ম্রাউক-উ রাজবংশ হিসেবে খ্যাত হয়।

সোলায়মান শাহ নতুন রাজধানী ম্রোহংকে সুরক্ষার নিমিত্তে বাংলার সেনাবাহিনীকে আরাকানের রাজধানীতেই স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য উৎসাহিত করেন। এ নিমিত্তে তিনি রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাংলার সেনাসদস্যদের বসবাসের জন্য সেনাছাউনী নির্মাণ করেন। সেইসাথে মুসলমানদের মৌলিক ইবাদত 'নামাজ' আদায়ের জন্য গৌড়ীয় স্থাপত্যরীতিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন; পরবর্তীকালে এটি সন্ধিখান (Sandhikan) মসজিদ[৮] নামে খ্যাতি লাভ করে। বাংলার অধিকাংশ মুসলিম সৈন্য ম্রোহংয়ের সেনাক্যাম্পেই থেকে যান এবং তাঁদের অনেকেই স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে আরাকানের স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে বসবাস করতে থাকেন। ফলে আরাকানে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে উপরোক্ত পরিস্থিতিসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

উল্লেখ্য যে, অন্যত্র যে কোন স্থান থেকে আরাকানে আগত লোকদেরকে রাজ্যে সাদরে বসতি স্থাপনের জন্য অনুমতি দেয়া আরাকানের রাষ্ট্রনীতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছিল। তারা যুদ্ধে প্রাপ্ত বন্দীদেরকে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকরূপে নিয়োগ করত এবং আরাকানী মহিলা বিবাহপূর্বক দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসে বাধ্য করত। আরাকানী মহিলাকে বিবাহের পর স্বামীকেও আরাকানী বলে গণ্য করা হতো এবং তার স্ত্রী-পুত্রকে নিজ দেশে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি ছিল না।[৯] আরাকানে আগত লোকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিল মুসলমান। কেননা হিন্দু ও বৌদ্ধরা সমুদ্র ভ্রমণ ও বিদেশ বাণিজ্যে বেশী আগ্রহী ছিল না। মুসলমানগণ বাণিজ্য ও দ্বীন প্রচারের জন্য বিদেশ ভ্রমণে বেশী তৎপর ছিলেন। ফলে আগত লোকদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান।

নরমিখলা বাংলায় আশ্রয় নেবার পর আরাকানে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ব্যাপক যুদ্ধ বিগ্রহ হবার কারণে অনেক পুরুষ সৈনিক মারা যায়।[১০] ফলে বিধবা মহিলার সংখ্যা আরাকানে অনেক বেশী ছিল; যা নরমিখলা কর্তৃক আরাকান দখলের পর মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হয়েছে। মুসলিম সৈনিকগণ রাজধানী ম্রোহং কেন্দ্রিক বসবাস শুরু করার ফলে সেখানে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে; যা কোয়ালং বা গডলংগী নামে পরিচিত হয়। ক্রমশ এ বসতি লেম্ব্রু নদীর তীরবর্তী বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে এবং

পরবর্তীতে রওয়ামা, নেদান পাড়া, মোয়াল্লেম পাড়া, সফুচিক, ফুয়িপাড়া, কামার পাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম প্রভাবিত বসতি গড়ে ওঠে।[১১] এ সকল অঞ্চলে ৭টি পাকা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থাকলেও বর্তমানের বর্মী সামরিক সরকার বুলডোজার দিয়ে ধ্বংসের মাধ্যমে তা অস্তিত্বহীন করে ফেলেছে।

রাজধানী ম্রোহংকে সুরক্ষিত করার পাশাপাশি বার্মারাজ্যের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ আরাকানের স্যান্ডোয়ে (চাঁদা) ও চকপিয় (কেপ্র) সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সেখানে দুটি গৌড়ীয় বাহিনীর সেনানিবাস স্থাপন করা হয়। তারাও স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। তাদের বংশ বিস্তারের ফলে পরবর্তীকালে স্যান্ডোয়ের শোয়েজুঁবি, চানবী, নাজাবী, চংদয়ক, থাডে, ছায়াডো, সিনবিনও, চকপিয়ুর ছনে, জালিয়াপাড়া, মেহেরবনু প্রভৃতি নামের বহু মুসলিম জনপদ গড়ে ওঠে।[১২] নরমিখলা কর্তৃক আরাকান পুনরুদ্ধারের পর বাংলার সেনাদের পাশাপাশি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক মুসলমানও আরাকানে বসতি স্থাপন করেছেন। এভাবে সেখানে ব্যাপকভাবে মুসলিম জনবসতি গড়ে ওঠে।

নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহ স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেই শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করেন। মুদ্রা প্রচলনে তৎকালীন বাংলার খুব সুনাম ছিল। সোলায়মান শাহ বাংলার সুলতানদের অনুকরণে মুদ্রার প্রচলন করেন; যার এক পীঠে ফারসি অক্ষরে কালেমা ও শাসকের মুসলমানী নাম লেখা ছিল।[১৩] রাজদরবার মদপান মুক্ত রেখে রাজদরবারকে পবিত্র অংগন মনে করে সেখানে অনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেন। সেইসাথে ইসলামের উদারনীতি গ্রহণ করে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুসারে সকলকে রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। এভাবে তিনি দরবারের আদব কায়দা ও রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালাতে বাংলার অনুকরণে ইসলামি ভাবধারা চালু করেন। বাংলায় আশ্রিত ২৪ বছরে সোলায়মান শাহ কুরআন, হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তার প্রভাব শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিস্ফুটিত হয়েছিল। এর ফলেই অনেক লেখক সোলায়মান শাহকে একজন বিশ্বাসী মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৪] তবে বাস্তবিক পক্ষে তিনি কায়মনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা এখনো সন্দেহাতীত নয়। কেননা, মুসলিম নাম গ্রহণের পর তিনি বৌদ্ধ নামকে পরিত্যাগ করেননি। এমনটিও হতে পারে যে, বাংলার করদরাজা হিসেবে শাসন পরিচালনা করার কারণে বাংলার সুলতানদের খুশি রাখার জন্যই তিনি সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করে মুসলিম রীতিনীতির প্রচলন করেছিলেন।

সোলায়মান শাহ বাংলার সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের করদরাজা ছিলেন এ ব্যাপারে তেমন কোন মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু সোলায়মান শাহের পরবর্তী সুলতানগণ বাংলার সুলতানদের করদরাজা হিসেবে শাসন করেছেন কিনা এ নিয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন গবেষক[১৫] সোলায়মান শাহের পরে প্রায় একশত বছর (১৪৩০-১৫৩০) সময়কালের এগার জন রাজাকে বাংলার করদরাজা

হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা যুক্তি হিসেবে শাসকদের বৌদ্ধনাম ব্যবহারের পাশাপাশি মুসলিম নাম গ্রহণ ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোতে বাংলার অনুকরণে ইসলামি প্রভাবের প্রতিফলনের কথা উপস্থাপন করে থাকেন। আবার অনেক গবেষক[16] শুধুমাত্র সোলায়মান শাহকে বাংলার করদরাজা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে শুধুমাত্র সোলায়মান শাহই বাংলার সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সহযোগিতার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজকে সামন্ত শাসক হিসেবে মনে করতেন। তবু এ ব্যাপারে লিখিত কোন চুক্তিও ছিলনা। ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ মৃত্যুবরণ করলে বাংলার পরবর্তী সুলতান শামস উদ্দীন আহমদ শাহের (১৪৩২-১৪৩৬) সাথে নতুন করে মৌখিক কিংবা লিখিত চুক্তির বর্ণনা পাওয়া যায়না। তাছাড়া শুধুমাত্র বাংলার অনুকরণে শাসকদের মুসলিম নাম গ্রহণ, ও অশ্লীলতা ও সুরামুক্ত অভিষেক অনুষ্ঠান পালন, বিচারব্যবস্থা কার্যকর করতে কাজী ও জল্লাদ প্রথার প্রচলন প্রভৃতি সামন্ত রাজা হবার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয়। কেননা যদি একশত বছরই সামন্ত রাজা হিসেবে শাসন করত তবে প্রায় দু'শো বছর পর্যন্ত তারা কেন মুসলিম নাম ব্যবহার করেছিল। তাছাড়া এ সময় বাংলার সুলতানদের সাথে আরাকান রাজাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত সব সময় লেগেই থাকত। সেইসাথে আরো উল্লেখ করা যায় যে, আরাকানের রাজারা কখনো বাংলার সুলতানদের নামে মুদ্রা প্রচলন করেননি। সামন্ত শাসক হলে বাংলার সুলতানদের নামে মুদ্রার প্রচলন হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই বলা যায়, আরাকানের রাজারা বাংলার সুলতানদের সামন্ত শাসক ছিলেন না বরং বাংলার মুসলমানদের উন্নত আদর্শ ও সভ্যতাই তাদেরকে বাস্তবায়নে অনুপ্রাণীত করেছিল। আরাকানের রাজাদের মুসলিম নাম ব্যবহার এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মুসলিম রীতিনীতির প্রয়োগ বাধ্যতামূলক ছিলনা। কারণ বাধ্যতামূলক হলে পরবর্তীতে আরাকানের রাজাগণ স্বাধীনতা লাভ করেও তাদের মুসলিম নাম গ্রহণের কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকতে পারেনা। মূলত শ্রেষ্ঠ মানব সম্প্রদায়ের আদর্শে অনুন্নত জাতির সভ্যতা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, চলাফেরা, আদব-কায়দা, বেশভূষা, মতবাদ সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানকালে আমরা যেমন সর্ব বিষয়ে ও সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনুসরণ করছি তেমনি সেকালেও মুসলিম সভ্যতার অনুসরণ করা সর্বত্র ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল। মোগল পাঠান সভ্যতার অনুকরণে আরাকানের রাজারা স্বাধীনতা অবলম্বন করেও আপন আপন বৌদ্ধ নামের সাথে মুসলিম নাম গ্রহণ, কালেমা খচিত মুদ্রা উৎকীর্ণ করা এবং রাষ্ট্রীয় রীতিনীতিতে ইসলামের অনুশাসন প্রয়োগ গৌরবজনক মনে করতেন। সুতরাং সোলায়মান শাহ কৃতজ্ঞতা বশত নিজকে বাংলার সুলতানদের সামন্ত শাসক হিসেবে মনে করলেও পরবর্তী অন্য কোন আরাকানী শাসক তা মনে করেননি। কিন্তু এ বিষয়ে কোন মতের স্বপক্ষেই উল্লেখযোগ্য কোন দলীল দস্তাবেজ না থাকায় বিতর্কের উর্ধ্বে উঠা সম্ভব হচ্ছে না।

আরাকানী শাসকগণ মুসলমানী নাম গ্রহণপূর্বক রাষ্ট্রীয় বিচারকার্যে কাজী নিয়োগ ও দরবারী আদব কায়দায় ইসলামি অনুশাসনের বাস্তবায়নকে সামনে রেখে নরমিখলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরাকানের ম্রাউক-উ-রাজবংশকে অনেক গবেষকই আরাকানে মুসলিম শাসনের যুগ বলে উল্লেখ করেন। শুধুমাত্র নরমিখলার শাসনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৯৫৭-১৪৩০ সাল পর্যন্ত আরাকানকে তাঁরা বৌদ্ধ রাষ্ট্র মনে করেন।[১৭] তাঁদের কারো মতে, বিভিন্ন সময়ে মুসলমানরা বিভিন্নভাবে ইসলাম প্রচারের কাজকে তরান্বিত করে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই তারা সালতানাত গঠনের মত শক্তি সামর্থ্য অর্জন করে ইসলামের যুগস্রষ্টা ও শক্তিশালী মূল্যবোধকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৮] তারা মনে করেন ম্রাউক-উ বংশের শাসনাকালের (১৪৩০-১৭৮৫ খ্রি.) মধ্যে ১৪৩০-১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের এ দু'শো আট বছরকে আরাকানের 'মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগ' বলা যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও পর্তুগিজ নির্বিশেষে সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল যে, আরাকান একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম শাসনামলের দু'শো বছরে আরাকানে শুধু মুসলমানদেরই নয় বরং সকলের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটেছিল। বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক বেড়েছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল; ফলে বিভিন্ন দেশের লোকজন ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য আরাকানে এসে ভিড় করেছিল। বস্তুতঃপক্ষে বাংলা-বার্মার রাজা ও সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আরাকানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।[১৯] ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা এতদূর এগিয়েছিল যে, কোন মুসলিম রাজার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে অভিজ্ঞ আলেমের নিকট দশ বছরকাল কুরআন হাদিস শিক্ষা নিয়ে ইসলামি জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হতে হতো।[২০] তখন আরাকানের জাতীয় পতাকা, মুদ্রা ও পদকে ঈমানের চিহ্ন স্বরূপ কালেমা এবং পৃথিবীর উপর আল্লাহর শাসন কায়েমের অর্থবহনকারী 'আকিমুদ্দীন' এর ছাপ থাকতো, রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ফারসি গ্রহণ করা হয়েছিল; যা ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ আরাকান বৃটিশ শাসনাধীনে আসার পরও ২২ (বাইশ) বছর পর্যন্ত চালু ছিল।[২১] কিন্তু ইতিহাস গবেষক আবদুল হক চৌধুরী এটাকে অলীক ধারণা বলে আখ্যা দিয়ে উল্লেখ করেন যে, শাসকগণ অবশ্যই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল।[২২] তবে তারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হলেও ইসলামের প্রতি যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন এতে কোন সন্দেহ নেই। এমনকি তারা উন্নত পোষাক পদ্ধতি, রান্নাবান্না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গীর লালন, পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নিজেরাও ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের বৈষয়িক আদর্শের চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। আরাকানের মোট ১৮ জন রাজার মুসলমানী নাম পাওয়া গেছে।[২৩] তার মধ্যে নরমিখলা বা সোলায়মান শাহ থেকে শুরু করে রাজা থিরি থু ধম্মা বা দ্বিতীয় সেলিম শাহ পর্যন্ত মোট ১৬ জন রাজা মুসলমানী নাম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী শাসক নরপদিগ্যিও (১৬৩৮-১৬৪৫) মুসলিম নাম গ্রহণ করেছিলেন তবে তা দুষ্পাঠ্য ফারসি নাম বলে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া রাজা মিনবিন বা জবৌক শাহ (১৫৩১-১৫৫৩) ও রাজা দিখা (Dikha- 1553-1555) বা দাউদ খান এর পরে রাজা সৌহলা (Sawhla-1555-1564) ও রাজা মিনসিথিয়া (Minsetya- 1564-1571)

পর্যন্ত দুই জন রাজার মুদ্রা না পাবার কারণে মুসলমানী নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে এ কথা সত্য যে, আরাকানের ম্রাউক-উ-রাজবংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৪৩০-১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২১৫ বছর আরাকানের রাজাগণ বৌদ্ধ নামের পাশাপাশি মুসলমানী নাম ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য ম্রাউক উ রাজবংশের ঐতিহ্য মণ্ডিত স্থিতিশীল শাসনামলে (১৪৩০-১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) রাজাগণ তিন ধরনের উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। **প্রথমত** ১৪৩০-১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ নরমিখলা থেকে নরপদিগ্যি পর্যন্ত শাসকগণ নিজেদের আরাকানী নামের সাথে মুসলমানি নাম উপাধি হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং নামের সাথে শাহ, খান প্রভৃতি উপাধিও ধারণ করতেন। সেইসাথে তাঁদের প্রচারিত মুদ্রার এক পীঠে আরবি অক্ষরে গ্রহণকৃত মুসলমানি নাম এবং অন্যপীঠে কালেমা উৎকীর্ণ করতেন।[২৪]

দ্বিতীয়ত, ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ মিন রাজাগ্যি থেকে নরপদিগ্যি পর্যন্ত এ বংশের পাঁচজন রাজা সৌভাগ্যের প্রতীক শ্বেত হস্তির মালিক হয়ে নিজেদের আরাকানী নাম ও মুসলমানি নামের সাথে শ্বেত গজেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের প্রচারিত মুদ্রায় এক পীঠে মুসলমানি নাম ও উপাধি অন্য পীঠে কালেমা উৎকীর্ণ করতেন।[২৫] কিন্তু রাজা থদো (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রিঃ) মুসলমানি নাম, উপাধি ও আরবি অক্ষরে মুদ্রা উৎকীর্ণ করার প্রথা বাতিল করে শুধু শ্বেতরক্ত গজেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।[২৬]

তৃতীয়ত, রাজা সান্দা থু ধাম্মা (১৬৫২-১৬৮৪) পৈত্রিক ও পূর্বোক্ত উপাধি বাদ দিয়ে 'সুবর্ণ প্রাসাদের অধীশ্বর' নামক একটি নতুন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এরপর আর কারো কোন উপাধি গ্রহণের কথা জানা যায় না।[২৭]

সোলায়মান শাহের আরাকান পুনরুদ্ধার ও বাংলার মুসলমান সৈনিকদেরকে রাজধানী শহরসহ আরাকানের বিভিন্ন স্থানে বসবাসের ব্যবস্থাকরণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের তৎপরতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি আরাকানের নদীনির্ভর ব্যবসা বাণিজ্যও সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের আওতায় চলে আসে। ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আরাকানের উপকূলীয় অঞ্চলসহ নদীগুলোর দু'ধারে মুসলিম বসতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এগুলোর মধ্যে লেম্রু নদীর দু'তীরবর্তী সরা আও বন্দর, কোয়ালং, রাজার বিল, বল্দি পাড়া (পার্রি), পংডু, কমবাওঁ, শিশারেক, মেলাতুডাইং, বটং, শাগু, পিপারাং, দাসপাড়া, মেয়ংবুয়ে, বুতলুহুঁলিখং, হালিমপাড়া, পুরানপাড়া, ছিত্তাপাড়া, কত্তিপাড়া, পাইকপাড়া, চম্বলি, ক্কাইম ও বারবচ্চা প্রভৃতি অঞ্চল; মিংগান নদীর দুইধারে - জিচা, পাডং, জোলাপাড়া বাবুডাং অঞ্চল; কালাদান নদীর তীরবর্তী - চন্দমা, মিউরকুল, কাইনিরপরাং, ক্বাইমরপরাং, শোলি পেরাং, টংফরু, আকিয়াব, ডবে, আফকন চানকেরি, কাজীপাড়া, কেয়দা, রমজুপাড়া, আমবাড়ি, টংটং নিরং, পল্লান পাড়া ও মেওকটং প্রভৃতি অঞ্চল; মায়ু নদীর দুই তীরে মচ্চায়ি, আংপেরাং, বাজার বিল, রৌশন পেরাং, জোপেরাং, ছমিলা, রোয়াঙ্গাডং, আলীখং, মিনজং, ছুয়েফ্রেংডং, মরুছং,

খোয়াচং, গওলাঙ্গ, লোয়াডং এবং নাফ নদীর তীরবর্তী- মংডু, ওলীডং, কাজীপাড়া, বলিবাজার, নাগপুরা, বুড়া, শিকদার পাড়া, কানরিপাড়া, হাবসি পাড়া, রাজার বিল, নূরুল্লাপাড়া, আলীছাঙ্গু প্রভৃতি অঞ্চল মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে পড়ে।[২৮] এ সময় এ সমস্ত অঞ্চলে মুসলিম প্রভাব তো প্রাধান্য বিস্তার করেই পাশাপাশি বাংলা ভাষাভাষীরও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; পাড়াকেন্দ্রিক আঞ্চলিক নামগুলো যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সোলায়মান শাহের মৃত্যুর পর ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় ছোট ভাই মিনখারী (Minkhari) বা নারুনু (Naranu), আলী খান বা আলী শাহ[২৯] নাম ধারণ করে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই বিশিষ্ট মুসলমানদের সমন্বয়ে একটি সংসদ গঠন করেন। স্থানীয় প্রভাবশালী আলিম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এ সংসদের কাজ হলো রাজার মুসলমানী নাম নির্বাচন করা এবং অভিষেকের সময় রাজাকে শপথ বাক্য পাঠ করানো।[৩০] যেহেতু সংসদটি উলামা ও বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল সেহেতু সহজেই অনুমান করা যায় যে, সংসদ কর্তৃক রাজার মুসলিম নাম নির্বাচনের পর উক্ত শপথ অনুষ্ঠান ইসলামি রীতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হতো। কেননা বৌদ্ধ রীতিতে শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য নেতৃস্থানীয় মুসলমান ব্যক্তিসহ শীর্ষস্থানীয় উলামা সংসদ গঠনের প্রয়োজন পড়ে না। আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে রাজাকে ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হতো। এমনকি আরাকানী লেখকগণ উল্লেখ করেন- 'রাজাদের ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এত দূর এগিয়ে ছিল যে, কোন রাজাকে সিংহাসন আরোহণের পূর্বে অভিজ্ঞ আলেমের নিকট দশ বছরকাল কুরআন-হাদিস ও ইসলামি জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ থাকতে হতো'।[৩১] এ মন্তব্যের কোন যৌক্তিক উপাত্ত পাওয়া যায়নি। তবে ইসলাম সম্পর্কে যে তাদেরকে সম্যক জ্ঞান রাখতে হতো এতে কোন সন্দেহ নেই।

আলী খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মুদ্রা অংকন পদ্ধতিসহ বাংলার অনুকরণে শাসনকার্য চালালেও বাংলার সুলতানদের সাথে অনুগত কিংবা সামন্ত সম্পর্ক রাখতে চাননি। তিনি অচিরেই সামরিক বাহিনীকে সুসজ্জিত করে বাংলার অধীনতা অস্বীকারপূর্বক আরাকানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং চট্টগ্রাম আক্রমণ করে রামু পর্যন্ত দখল করে নেন।[৩২] তবে রামু দখলের সুনির্দিষ্ট সময় ও বাংলার শাসকের নাম পাওয়া যায় না। কোন কোন গবেষক[৩৩] সুলতান জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহের পুত্র সুলতান শামসুদ্দীন আহমদ (১৪৩২-১৪৩২) এবং কেউ কেউ[৩৪] পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশীয় শাসক সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৪৩৫-১৪৩৬) সময়কে উল্লেখ করেন। তবে যে শাসকের সময়েই হোক না কেন তা যে আলী খান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই এ কথা সহজেই বলা যায়।

আলী খানের মৃত্যুর পর স্বীয়পুত্র বসপিয়ু (Basawpyu) কালিমা শাহ (Kalima Shah) নাম ধারণ করে ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও বাংলার সাথে আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভংগীই পোষণ করতে থাকেন। তিনি ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ-পূর্ববর্তী সমস্ত ভূভাগটি দখল করে আরাকান রাজ্যভুক্ত করেন।[৩৫] কক্সবাজারের রামুসহ অধিকৃত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হিসেবে তার কোন ভাই বা নিকট আত্মীয়কে মনোনীত করেন। চট্টগ্রামের মনোনীত শাসকের অধীনে সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধাস্ত্রসহ একশখানা যুদ্ধ জাহাজ রাখা হতো এবং প্রতি বছরই দায়িত্বপ্রাপ্ত বাহিনীকে সরিয়ে নতুন বাহিনী পাঠানো হতো।[৩৬] বাংলার সুলতান কর্তৃক প্রেরিত সাবেক সেনাসদস্যগণ উক্ত বাহিনীর আওতাভুক্ত ছিল কিংবা তাদেরই বংশধরগণ সেনা সদস্য হিসেবে ছিল হেতু তারা যাতে বাংলার সাথে আত্মিক সম্পর্ক না গড়তে পারে তাই হয়তো প্রতি বছর সৈন্য বাহিনীর সদস্যদের পরিবর্তন করা হতো।

কালিমা শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম দখল নিয়েও মতবিরোধ দেখা দেয়। কারণ ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম দখলের তথ্য পাওয়া যায় এবং সে সময় বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন পরবর্তী ইলিয়াছ শাহী বংশের সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের পুত্র সুলতান রুকন উদ্দীন বরবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে প্রাপ্ত শিলালিপি দ্বারা প্রমাণ হয় যে, চট্টগ্রাম পর্যন্ত তাঁর শাসন অক্ষুণ্ন ছিল।[৩৭] তবে রুকন উদ্দীন বরবক শাহের আমলে চট্টগ্রামের কোন অঞ্চল শাসনাধীন ছিল তার কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। যেহেতু উত্তর চট্টগ্রাম বাংলার সুলতানের অধীনে ছিল। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ-পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চল আরাকানের অধীনে গেলেও উত্তর চট্টগ্রাম তাঁর শাসনাধীনে ছিল এবং শিলালিপি দ্বারা নির্ণেয় চট্টগ্রাম বলতে উত্তর চট্টগ্রামই ধরে নেয়া সংগত হবে।

কালিমা শাহের (১৪৫৯-১৪৮২ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুর পর তার পুত্র মিনদৌলিয়া ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে মুখু শাহ (Mu Khu Shah) নাম ধারণ করে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চাচা বসাপিউ (Basawpyu) ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ শাহ বা মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে আরাকানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। মাত্র ২ বছর রাজত্বের পর কালিমা শাহের পুত্র ইয়েননাউং (Yanaung) নূরী শাহ পদবী নিয়ে পিতৃ সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু তিনি এক বছরও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন নি। ঐ বছরই তার মৃত্যু হলে চাচা সলিংথু (Salingathu) শেখ আবদুল্লাহ শাহ নাম ধারণ করে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ১৫০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।[৩৮] দীর্ঘ চল্লিশ বছর (১৪৫৯-১৫০১ খ্রি.) শাসনকালের মধ্যে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার হাবশী শাসনের সময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগে মুখু শাহ (১৪৮২-১৪৯২) কর্তৃক চট্টগ্রাম আক্রমণের কথা জানা যায়।[৩৯] তিনি চট্টগ্রাম দখল করে ক্ষমতা নিজের করায়ত্ত রাখতে পেরেছিলেন কিনা সে বিষয়টি সন্দেহমুক্ত নয়।

সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্দর হবার কারণে আরাকানে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সামগ্রিকভাবে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। শুধু তাই নয়, চট্টগ্রাম অঞ্চলটি বাংলা, ত্রিপুরা এবং আরাকান রাজ্যের ত্রিসীমানায় অবস্থিত হবার

কারণে এ অঞ্চল নিয়ে বিভিন্ন সময় দ্বিমুখী ও ত্রিদলীয় যুদ্ধও সংঘটিত হতো। এ কারণে চট্টগ্রামের কোন স্থিতিশীল দীর্ঘ স্বাতন্ত্রিক ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া কঠিন। এটি কখনো বাংলা, কখনো আরাকান, কখনো ত্রিপুরার অংশ হিসেবে আবার কখনো বা স্বাধীন চট্টগ্রামরূপে শাসিত হতো। সেই একই ধারাবাহিকতায় শেখ আবদুল্লাহ শাহের মৃত্যুর পর যখন ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে মিংরাজা (১৫০১-১৫২৩ খ্রিস্টাব্দ) ইলিয়াস শাহ (প্রথম) নাম ধারণ করে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তখনও চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে বাংলা, ত্রিপুরা ও আরাকান -এ ত্রিশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা ধন্য মানিক্য চট্টগ্রাম জয় করে 'চাটিগ্রাম বিজয়ী' উপাধি সম্বলিত মুদ্রা জারী করলেও বিজয়কে পূর্ণাঙ্গ করতে পারেননি। তাই তিনি পরের বছর ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে আবার চট্টগ্রাম আক্রমণ করলে বাংলার সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক প্রেরিত হৈতন খানের নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাবাহিনী এবং ছুটি খানের যৌথ প্রতিরোধে ত্রিপুরা রাজা পরাজিত হন এবং বাংলার সেনাপতি ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু দুর্গও দখল করেন।[৪০] চট্টগ্রামকেন্দ্রিক ত্রিপুরা-বাংলা যুদ্ধ হবার ফলে আরাকানও এ যুদ্ধ থেকে পিছপা ছিলনা। কেননা দক্ষিণ চট্টগ্রাম অর্থাৎ কর্ণফুলি নদীর পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল থেকে শুরু করে আধুনিক কক্স বাজার অঞ্চল পর্যন্ত আরাকান রাজের রাজ্যসীমা রক্ষার জন্যও ত্রিপুরার রাজা ধন্য মানিক্যের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে চট্টগ্রাম রক্ষা করতে পারলেও বাংলার সুলতান হোসেন শাহ চট্টগ্রামকে বেশিদিন শান্ত রাখতে পারেননি। আরাকানী শাসক ইলিয়াস শাহ ১৫১৬-১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে শক্তি সঞ্চয় করে ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম দখলের জন্য স্থল ও জলপথে বাহিনী প্রেরণ করেন। বাংলার অধীনে তৎকালীন চট্টগ্রামের শাসক মুরাসিন বা মীর ইয়াসিন পরাজিত হয়ে চাঁদপুর ঘুরে সোনারগাঁ বা নারায়ণগঞ্জে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকানের দিগ্বিজয়ী বাহিনী দক্ষিণ চট্টগ্রাম হয়ে সন্দিপ, হাতিয়া, লক্ষ্মীপুর ও ঢাকা অঞ্চল জয় করে লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং আরাকানী শাসক ইলিয়াস শাহ হাতির উপর সওয়ার হয়ে সন্দিপ, হাতিয়া, ঢাকাসহ চট্টগ্রামের বিজয়ী অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করতে আসেন।[৪১] আরাকানের শাসক ইলিয়াস শাহ ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন বলে জানা যায়। ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে চাকমা রাজা চনুই আরাকানের বশ্যতা স্বীকারপূর্বক ২টি শ্বেতহস্তিসহ ৪ জন মন্ত্রীকে আরাকান শাসকের নিকট প্রেরণ করলে চট্টগ্রামের আরাকানী শাসক ছেন্দু উইজা লক্ষ্য করলেন যে, হাতিগুলো সাদা নয় বরং হাতির গায়ে চুন মেখে সাদা করা হয়েছে। এতে প্রতারণার দায়ে ছেন্দু উইজা চাকমা মন্ত্রীদেরকে বন্দী করেন। চাকমাদের মধ্য থেকে কারণ দর্শানো হলো যে, শ্বেত হস্তি ছাড়া আরাকানী রাজার উপঢৌকন হয়না অথচ এ অঞ্চলে শ্বেতহস্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং বাধ্য হয়েই এটি করা হয়েছে। ছেন্দু উইজা মন্ত্রীগণসহ হাতিকে ঢাকায় প্রেরণ করলে রাজা তাদেরকে ভৎসনাপূর্বক রাজনীতিমালা শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দেন। অতঃপর ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে চাকমা রাজার কন্যা ছাজাং ইয়ুকে রাজার হাতে তুলে দিলে রাজা ঢাকা থেকে আরাকানে প্রত্যাবর্তন করেন।[৪২] এতে অনুমিত হয় যে, এ সময়

চট্টগ্রাম আরাকান রাজার অধীনে ছিল। কিন্তু পর্তুগিজ বনিক জোঁআ-দ্যা-সিলভেরা ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামকে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের অধীনে দেখেছিলেন।[43] যদি তাই হয় তবে, আরাকানের রাজা কর্তৃক চট্টগ্রাম দখল এবং ঢাকায় দুই বছর অবস্থান নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তবে উত্তরে বলা যায় যে, হয়তো পর্তুগিজ বণিকের বিবরণের পরে অর্থাৎ ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে আরাকান রাজা চট্টগ্রাম জয় করেছেন কিংবা তারা শুধুমাত্র দক্ষিণ চট্টগ্রামই জয় করেছিলেন - উত্তর চট্টগ্রাম নয়। এ অঞ্চল বাংলার অধীনেই ছিল।

বাংলার সুলতান ও আরাকানী শাসকের খণ্ডিত চট্টগ্রাম পুনরায় ত্রিপুরা রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহের মৃত্যুর পর সুলতান নসরত শাহ সালতানাতের অধিকর্তা হলে বাংলার ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পায়। এ সুযোগে ত্রিপুরার রাজা হোসেন শাহ কর্তৃক দখলকৃত ত্রিপুরার দুর্গসমূহ পুনরুদ্ধার করে নেন এবং ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা দেবমানিক্য চট্টগ্রাম দখল করে আরাকানীদের বিতাড়িত করেন। এ সময় আরাকানীরা এত দ্রুত পলায়ন করেছিল যে, তাদের প্রোথিত অর্থ সম্পদও নিয়ে যাবার সময় পায়নি। এরপর যখনই সময় সুযোগ পেত তখনই এসে প্রোথিত সম্পদ খনন করে নিয়ে যেত। মাত্র দু'বছরের মাথায় বাংলায় সুলতান নসরত শাহ পুনরায় চট্টগ্রাম দখল করেন।[৪৪] ত্রিশক্তি কর্তৃক আরাকান দখল পুনর্দখলের মধ্য দিয়ে বিশেষত ত্রিপুরা রাজা কর্তৃক আরাকান বিজিত হলে এখানকার অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার আরাকানে পাড়ি জমায় এবং পরবর্তীতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও দায়িত্ব পালন করেন।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্র কাসাবাদি ইলিয়াস শাহ (দ্বিতীয়) নাম ধারণ করে ১৫১৩-১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গতানুগতিক পদ্ধতিতে আরাকান শাসন করেন। অতঃপর আরাকানের প্রাক্তন শাসক শেখ আবদুল্লাহ শাহের ভাই জালাল শাহ নাম ধারণ করে ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে কয়েক মাস রাজত্ব করেন। তার মৃত্যুর পর আরাকানের প্রাক্তন শাসক মুখু শাহের পুত্র থাটাসা আলী শাহ নাম নিয়ে ১৫১৫-১৫২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন এবং মিং খং রাজা (Min Khoung Raza) ১৫২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩১ পর্যন্ত ইল শাহ আজাদ (El-Shah Azad) নাম ধারণ করে আরাকান রাজত্ব করেন।[৪৫] তারা মুসলিম নাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পূর্বের ধারাবাহিকতায় ইসলাম ও মুসলমান রীতিনীতির প্রতি তাদের সহযোগী মনোভাব বিদ্যমান ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর আরাকানী শাসকদের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী ছিলেন রাজা মিনবিন ওরফে সুলতান জবৌক শাহ (১৫৩১-১৫৫৩ খ্রি.)। তিনি নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। তার সময়ও আরাকান-বাংলার সম্পর্ক তেমন ভাল ছিল না; বিশেষত চট্টগ্রাম নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল চরমে। এ সময় সম্রাট হুমায়ুন ও শেরশাহের মধ্যকার দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে বক্সার নিকটবর্তী চৌসার যুদ্ধে (২৭ জুন ১৫৩৯ খ্রি.) হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্য লাভের পর আফগান বীর

শেরশাহ সুর বাংলার দিকে রওনা হন এবং অবিলম্বেই গৌড় পুনরাধিকার করেন। সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক নিযুক্ত গৌড়ের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী বেগ[৪৬] ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে শেরশাহের পুত্র জালাল খান ও হাজী খান বটনী কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। শেরশাহের সৈন্যদল বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে মোতায়েনকৃত মোগল সৈন্যদেরও পরাজিত করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে। কিন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চল তখনও সুলতান গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহের কর্মচারীদের অধীনে ছিল এবং এদের মধ্যে সেনাপতি খোদা বখশ খান ও হামজা খান চট্টগ্রাম অধিকার নিয়ে বিবাদ করছিলেন। এ সুযোগে শেরশাহের সেনাপতি নোগাজিল (Nogazil) চট্টগ্রাম অধিকার করে নেন। কিন্তু তিনিও চট্টগ্রামকে নিজ দখলে রাখতে ব্যর্থ হন। কেননা চট্টগ্রামের পর্তুগিজ শুল্ক সংগ্রহায়ক নুনো ফার্নান্দেজ ফ্রিয়ার (Nuno Fernandez Freire) নোগাজিলকে বন্দী করেন। এক পর্যায়ে নোগাজিল চট্টগ্রাম থেকে পলায়ন করেন। পর্তুগিজ নেতা নুনো ফার্নান্দেজ নোগাজিলকে বন্দী করলেও চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারেননি। সুলতান গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহের জামাতা ভাটি অঞ্চলের শাসক সোলায়মান বাইশিয়ার ফার্নান্দেজ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। চতুর্মুখী দ্বন্দ্বের সুবাদে আরাকান রাজা মিনবিন ওরফে জবৌক শাহ ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে অথবা ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের সূচনা লগ্নে চট্টগ্রাম জয় করেন।[৪৭] এরপর থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম জয়ের পূর্ব পর্যন্ত এটি আরাকানের অধীনেই ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক আবদুল করিম এ বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেননি। তাঁর মতে মিনবিন বা জবৌক শাহের মত একজন দুর্বল আরাকানী শাসকের পক্ষে পরাক্রমশালী সুলতান শেরশাহের সময় চট্টগ্রাম জয় করার তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।[৪৮] তবে একথা বলা যায় যে, শেরশাহ পরাক্রমশালী শাসক হলেও চট্টগ্রাম নিয়ে ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের সময়ে জবৌক শাহ কর্তৃক সুযোগ মতো চট্টগ্রাম দখল হতেও পারে।

জবৌক শাহ ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করলে স্বীয়পুত্র মিনদিখা (Min Dikha) দাউদ খান নাম ধারণ করে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি চট্টগ্রামে পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সফল হবার জন্য পর্তুগিজদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। এতে তার ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির ইংগিত পাওয়া যায়। কিন্তু এ সময় দিখা'র চেয়ে বাংলার সুলতানকেই শক্তিশালী বলে উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বাংলার সুর বংশীয় স্বাধীন সুলতান শামস উদ দীন মুহাম্মদ শাহ গাজী ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকান টাকশালের নাম উৎকীর্ণ করে মুদ্রা জারী করেন।[৪৯] এমনকি সুলতান শামস উদ দীনের পুত্র গিয়াস উদ্দীন মাহমুদও আরাকান টাকশাল উৎকীর্ণ করে মুদ্রা জারী করেন বলে অভিমত পাওয়া যায়।[৫০] ফলে লেনপুল, রজার্স রাইট প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেন যে, বাংলার সুলতান সে সময় আরাকান জয় করে ঐ মুদ্রা জারী করেছিলেন।[৫১] কিন্তু প্রফেসর এ বি এম হবিবুল্লাহ বাংলা কর্তৃক আরাকান জয় করে মুদ্রা জারীর ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে, মুদ্রায় অংকিত টাকশালের নাম 'আরাকান' স্পষ্ট নয় বরং ওটাকে রিকাব (Rikab)

পড়াই যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়ত; তৎকালীন সময়ে আধুনিক আরাকান নামটি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিলনা, বরং মুসলমানগণ রাখাং বা রোখাং উচ্চারণ করতেন। সর্বোপরি তৎকালীন আরাকান ছিল খুব শক্তিশালী রাজ্য। বাংলার দুর্বল সুলতানের পক্ষে প্রভাবশালী আরাকান রাজ্যকে জয় করা সম্ভব ছিলনা।[৫২] তবে এন. বি. স্যান্যাল, প্রফেসর হবিবুল্লাহর মতকে খণ্ডন করে বলেন, মুদ্রার আরাকান পাঠ সঠিক এবং ত্রিপুরা, বাংলা ও আরাকান এ ত্রিমুখী শক্তির মধ্যে বাংলাই সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল।[৫৩] স্যানাল এর দ্বিতীয় কথাটি গ্রহণযোগ্য হলেও মুদ্রার আরাকান পাঠকে সঠিক হিসেবে ধরে নেয়া যায়না। কেননা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগিজ ওলন্দাজ'রা আরাকান শব্দের ব্যবহার করলেও মুসলিম মণীষীগণ একে রাখাং বলে আখ্যায়িত করতেন। সুতরাং টাকশালে ব্যবহৃত নামটি রিকাব (Rikab) হওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং বাংলার সুলতান কর্তৃক আরাকান জয়ের বিষয়টিও সত্যায়ন করা দূরূহ।

আরাকানী রাজা দিখা ওরফে দাউদ খান ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে স্বীয় পুত্র সৌহলা (Sawhla) আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজা মেং সৌ-লা বা সোহনা মুদ্রিত কোন মুদ্রা না পাবার কারণে তার মুসলিম নাম জানা যায় না। এমনকি তিনি যে মুসলমানী নাম গ্রহণ করেছিলেন সে ব্যাপারে সন্দেহের কারণও রয়েছে। কেননা তার পিতা কিংবা পরবর্তী শাসক ভ্রাতা মিন সিথিয়ারও মুসলিম নাম পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী শাসকগণ মুসলিম নাম গ্রহণ করেছিলেন। যা হোক, সোহলার রাজত্বকালেও বাংলার সাথে সংঘর্ষ বাঁধে এবং বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর শাহ ৯৬৫ হিজরী মোতাবেক ১৫৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকান জয় করে সেখান থেকে মুদ্রা জারী করেন বলে জানা যায়।[৫৪] তবে অল্প সময়ের ব্যবধানে রাজা সৌহলা আরাকান পুনরাধিকার করে চট্টগ্রামসহ জয় করেন। তখন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন হোসেন শাহী আমলের উত্তর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হামজা খাঁর পুত্র নসরত খাঁ বা নসরত শাহ। তিনি পরাজিত হয়ে প্রয়োজনীয় উপঢৌকন দিয়ে আরাকানের রাজা সৌহলার আনুগত্য স্বীকার করে আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের উজির পদে নিযুক্ত হন।[৫৫] কিন্তু অন্যকোন তথ্য থেকে সুলতান গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর শাহ কর্তৃক আরাকান দখলের কথা জানা যায় না। এমনকি ইতিহাসবিদ আবদুল করিমও এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। সুতরাং বাংলার সুলতান আরাকান দখল করেননি বরং আরাকানী শাসক কর্তৃক দখলকৃত চট্টগ্রামের কিংয়দংশ তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন বলে ধরে নেয়া যায়। কেননা ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা সৌহলার মৃত্যুর পর স্বীয় ভ্রাতা মিনসিথিয়া (Minsetya) আরাকানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা উজির নসরত শাহের সাথে মিনসিথিয়ার দ্বন্দ্ব হয়। ফলে মিনসিথিয়া গোপনে পর্তুগিজদের দ্বারা ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে নসরত শাহকে হত্যা করেন।[৫৬] মূলত বাংলার সুলতান আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করে মুদ্রা জারী করেছিলেন এবং আরাকানের রাজা সৌহলা তা পুনর্দখল করেন। চট্টগ্রামের শাসক নসরত শাহ সৌহলার অনুগত হয়ে চট্টগ্রাম শাসন করলেও মিনসিথিয়ার সময় এসে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করলেই তিনি আরাকানী রাজার নির্দেশে পর্তুগিজদের হাতে নিহত হন। সেইসাথে চট্টগ্রাম আরাকানের হাতে চলে যায়।

আরাকানরাজ মিনসিথিয়ার মৃত্যুর পর মিনবিন ওরফে জবৌক শাহের পুত্র মিং ফালং (Minphalaung) সিকান্দর শাহ নাম ধারণ করে ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন আরাকানের একজন প্রভাবশালী শাসক। তার সময়কালেও বাংলার সাথে সম্পর্ক ভাল ছিলনা। সমসাময়িককালে ত্রিপুরাতেও অমর মানিক্য নামক একজন পরাক্রমশালী শাসকের অভ্যুদয় হয়। তিনি ১৫৭৭ থেকে ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন। আরাকানের রাজা ও ত্রিপুরার রাজা অমর মানিক্য উভয়েই সমসাময়িক এবং উভয়েই আফগানদের পতন এবং মোগল আধিপত্য বিস্তারের সমকালীন রাজনৈতিক বিশৃংখলার সুযোগে কক্স্‌বাজারসহ পুরো চট্টগ্রামে স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ত্রিপুরার রাজমালার উদ্ধৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক আবদুল করিম এ যুদ্ধের বিবরণী উল্লেখ করেন। বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, ত্রিপুরার রাজা অমর মানিক্য আরাকানে এক অভিযান প্রেরণ করেন, তিনি তাঁর জৈষ্ঠ পুত্র রাজধর নারায়ণকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। রাজধরের ছোট ভাই অমর দুর্লভ নারায়ণ, সেনাপতি চন্দ্রদর্প নারায়ণ, চন্দ্র সিংহ নারায়ণ এবং ছত্রজিত নাজীরকে প্রধান সেনাপতির সহকারী নিযুক্ত করা হয়। এ যুদ্ধে ত্রিপুরার রাজা অমর মানিক্য বাংলার বার ভূঁইয়াদের নিকট থেকেও সাহায্য লাভ করেন। ত্রিপুরা বাহিনী চট্টগ্রামে পৌঁছে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ তৈরী করে নদী পার হয় এবং আরাকান অধিকৃত ছয়টি থানা জয় করে রামুতে এসে শিবির স্থাপন করে। অতঃপর ত্রিপুরা বাহিনী দিয়াঙ্গ এবং উড়িয়া[৫৭] রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সময় আরাকানের সৈন্য বাহিনী ত্রিপুরার সৈন্য বাহিনীকে আক্রমণ করে। কিন্তু ত্রিপুরা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সৈন্য দেখে আরাকানীরা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং সম্মুখযুদ্ধে বিজয় হওয়া কঠিন ভেবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ত্রিপুরার ভাড়াটিয়া পর্তুগিজ সৈনিকদের বশীভূত করে। ফলে পর্তুগিজ সৈনিকগণ তাদের অধিকৃত থানাগুলো আরাকানীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে এবং থানাগুলো দখলে পেয়ে তারা সর্বশক্তি নিয়ে ত্রিপুরা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।[৫৮] যুদ্ধের মধ্যেই আরাকানীরা গুপ্তচর মারফত সংবাদ পায় যে, ত্রিপুরার বিশাল বাহিনীর হাতে পর্যাপ্ত রসদ মজুদ নেই। এ সুযোগে বাহিনীর কাছে রসদ পৌঁছানোর ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। ফলে ত্রিপুরা বাহিনী খাদ্যাভাবে অনাহারে অর্ধাহারে কিছুদিন যুদ্ধ করে অবশেষে পশ্চাদ পলায়ন করে উত্তর চট্টগ্রামে ফিরে আসে এবং পুনঃশক্তি সঞ্চয় করে আরাকানী বাহিনীতে হামলা চালিয়ে বহু আরাকানী সৈন্যকে হত্যা করে এবং আরাকানীরা পরাজিত হয়। এ প্রেক্ষিতে আরাকানের রাজা নিজের সামন্ত উড়িয়াতনের 'উড়িয়া' রাজার মাধ্যমে ত্রিপুরার রাজার কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। অমর মানিক্যও অভিযানে ব্যর্থতার দরুন যুদ্ধ বন্ধের জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। তাই তিনি প্রধান সেনাপতি যুবরাজ রাজ্যধর মানিক্যকে যুদ্ধ বন্ধ করে ত্রিপুরায় ফিরে আসার আদেশ দেন।[৫৯]

আরাকানের রাজা সিকান্দার শাহ কর্তৃক সন্ধির প্রস্তাব ছিল ছলনা মাত্র। তারা এ সুযোগে পর্তুগিজ ভাড়াটিয়া সৈন্যের সাহায্যে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পুনরায়

উত্তর চট্টগ্রামে আক্রমণ চালায়। ত্রিপুরার রাজা সিকান্দার শাহের ছলনা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন এবং আবারও যুবরাজ রাজ্যধর মানিক্যের নেতৃত্বে রাজকুমার অমর দুর্লভ, ঝুঝা মানিক্য ও অন্যান্য সেনাপতিগণ যুদ্ধে যাত্রা করেন। ত্রিপুরার রাজা কর্তৃক যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর পেয়ে আরাকানের রাজা চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর নেবার জন্য স্বর্ণমণ্ডিত একটি হাতির দাঁতের মুকুট উপহারসহ একটি চিঠি দিয়ে একজন দূত প্রেরণ করেন। তিন রাজকুমারের উপস্থিতিতে আরাকানী দূত রাজ্যধর মানিক্যের হাতে মুকুট ও রাজকুমার অমর দুর্লভের হাতে চিঠি খানি দেন। মুকুটটির প্রতি কনিষ্ঠ রাজপুত্র ঝুঝা মানিক্যের লোভ ছিল। তিনি কিছু না পেয়ে রাগান্বিত হয়ে বলেন- 'আমি মগদের শৃগালের মত হত্যা করে হাজার মুকুট ছিনিয়ে আনব।' দূত মারফত এ কথা শুনে আরাকানের রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ শুরু করার আদেশ দেন। যুদ্ধের শুরুতেই ত্রিপুরা রাজকুমার ঝুঝা মানিক্য হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে নিহত হন এবং প্রধান সেনাপতি রাজ্যধর মানিক্য আরাকানীদের শেলের আঘাতে আহত হন। এ ঘটনায় ত্রিপুরা বাহিনীর মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয় এবং সৈন্যরা দিকবিদিক পলায়ন করে। ফলে আরাকানী বাহিনী বিজয়ী হয়।[৬০] ত্রিপুরার সাথে বিজয়ের পর রামুর আরাকানী সামন্ত শাসক আদম শাহের সাথে আরাকানের রাজার মত বিরোধ দেখা দেয়। আদম শাহ আরাকান রাজার ভয়ে পলায়ন করে ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকানের রাজা অমর মানিক্যকে পত্র মারফত আদম শাহকে ফেরত চান। কিন্তু অমর মানিক্য আশ্রিত আদম শাহকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি দিয়ে স্বসৈন্যে স্বয়ং যুদ্ধ করার জন্য চলে আসেন। আরাকানী বাহিনীর দুলক্ষ সৈন্য সমাবেশ দেখে ত্রিপুরা বাহিনীর সৈন্যরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। যুদ্ধে ত্রিপুরা রাজা পরাজিত হয়ে অপমানে ত্রিপুরায় ফিরে পাহাড়ের আশ্রয় নিয়ে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন।[৬১] আরাকানী বাহিনী ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর অবরোধ করে পনের দিন ধরে লুণ্ঠন চালায়। অতঃপর মেঘনার তীর অবধি ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অঞ্চল অধিকার করে। এ যুদ্ধে সিকান্দার শাহের চট্টগ্রামের সামন্ত শাসক উজির জালাল খা গোপনে অমর মানিক্যের সহায়তা করেছিলেন। অমর মানিক্যের পরাজয়ে জালাল খাঁ ভয়েই প্রাণ ত্যাগ করেন। অতঃপর সিকান্দার শাহ ঢাকা পর্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে ঢাকা পরিদর্শনে আসেন।[৬২]

আরাকানের রাজা মিং ফালং ওরফে সিকান্দার শাহ কর্তৃক ত্রিপুরার রাজার সাথে উপরোক্ত যুদ্ধের বিবরণের মধ্য দিয়ে বুঝা গেল যে, সিকান্দার শাহ সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব থেকেই চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানের অধীনে ছিল। কেননা ত্রিপুরা বাহিনী যখন দিয়াঙ্গ ও উড়িয়া আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল ঠিক তখনই তার প্রতিরোধে আরাকানী বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালায়। এতে বুঝা যায় যে, দিয়াঙ্গ ও উড়িয়া অঞ্চল আরাকানের অধীনেই ছিল। সেইসাথে রামুর শাসক আদম শাহ এবং চট্টগ্রামের শাসক জালাল শাহও ছিল আরাকানের সামন্ত শাসক। সুতরাং এ অঞ্চলও আরাকানের অধীনে ছিল। তাদের অমর মানিক্যের পক্ষ নেয়ার বিষয়টি সিকান্দার শাহ

সম্পর্কে খানিকটা খারাপ ধারণার জন্ম দেয়। হয়তো তিনি ব্যাপকভাবে মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু তার আমলের নোয়াখালীর আলমদিয়ায় দুটি সংরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছিলেন এবং অসংখ্য রণতরী নিয়োজিত করে চট্টগ্রামকে রক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করেছিলেন তাতে অনেক মুসলমান সৈনিক ছিল। তবে বেশী সুযোগ-সুবিধা পাবার আশায় কিংবা আরাকানী রাজাকে দুর্বল ভেবেও পরাক্রমশালী ত্রিপুরা রাজাকে তারা সহযোগিতা করেছিলেন এটাও হতে পারে। যা হোক, ত্রিপুরা রাজার সাথে আরাকানের বিজয় মূলত পর্তুগিজদেরই বেশী কল্যাণ বয়ে এনেছে।

সিকান্দার শাহ ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলে স্বীয় পুত্র মিন রাজাগ্যী (Min Razagyi) সেলিম শাহ নাম ধারণ করে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। চট্টগ্রাম টাকশাল থেকে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে তার যে মুদ্রা অংকিত হয়েছিল তাতে আরবি, দেব নাগরি ও বর্মি অক্ষরে উৎকীর্ণ নামের শেষে তাঁকে আরাকান ও বাংলার রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৩] চট্টগ্রামসহ ঢাকা পর্যন্ত আরাকানীদের প্রভাব বলয় বিস্তারের ফলেই সম্ভবত তাকে আরাকান ও বাংলার সুলতান বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। তৎকালীন সময়ে বার্মার অন্তর্গত পেগুর তেলেইং বংশীয় রাজা ন্যানডা বায়েনিং চারটি শ্বেত হস্তীর মালিক ছিলেন। আরাকান রাজা মিনরাজিগ্যি শ্বেত হস্তীর লোভে পেগুরাজ্য আক্রমণ করেন। অভিযানে সফল হয়ে ৪টি শ্বেতহস্তী, রাজকন্যা সিনডোনং, রাজপুত্র মেং শোয়েপ্রু ও তার ছোট ভাই এবং কয়েক হাজার তেলেইং সৈন্য বন্দী করে ম্রোহংয়ে নিয়ে আসেন।[৬৪] পেগু থেকে বিজয়ী বেশে ম্রোহংয়ে আসার পর তিনি আরাকানী নাম ও মুসলিম নামের সাথে শ্বেত গজেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন।

পর্তুগিজরা যেমন জলদস্যুতায় কুখ্যাত ছিল তেমনই ছিল শ্রেষ্ঠ নাবিক ও নৌযোদ্ধা। মিনবিন বা জেবুকশাহ (১৫৩১-১৫৫৩ খৃ.) আরাকানী নৌবাহিনীর প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে পর্তুগিজদেরকে চট্টগ্রামে বাণিজ্য ও বসতি গড়ার অনুমতি দেন।[৬৫] এমনকি মিনবিন তাদেরকে সাদরে গ্রহণপূর্বক বসবাসের উপযোগী জমি দান করে সীমান্ত রক্ষার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। সেইসাথে আরাকানের রাজধানী ম্রাউক-উ'তে পর্তুগিজদের দ্বারা রাজার দেহরক্ষী একটি সৈন্যদলও গঠিত হয়েছিল।[৬৬] অতঃপর রাজা মিন রাজাগ্যি বা সেলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২ খৃ.) তাদেরকে চট্টগ্রামের দেয়াঙ্গ, সন্দীপ ও আরাকানের সিরিয়ামে উপনিবেশ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন।[৬৭] কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তারা স্বরূপ উন্মোচন করে দক্ষিণ ও পূর্ব-বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ডাকাতি ও মানুষ চুরির মাধ্যমে দাস ব্যবসা শুরু করে। মেঘনা নদীর মোহনা থেকে শুরু করে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এলাকায় নিষ্ঠুর জলদস্যুতার তাণ্ডব চালায়। তাদের অত্যাচারে এসব অঞ্চল জনবসতিহীন হয়ে গভীর জংগলে পরিণত হয়।[৬৮] তাদের অত্যাচারের কাহিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে ডি.জি.ই. হল বাটাভিয়ার ডাচ্-ফ্যাক্টরির ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের নথি থেকে লেখেন-

> Every year a devastating raids, often as far as Dacca and Murshidabad, were carried out and vast numbers of captives

> carried of to Mrohaung, Where the king, after setecting all the artisans for his own service, sold the rest to foreign traders at a few rupees a head. As there was a constant demand for staves in the Duch factories in the Archipelago. Duch merchants soon become the Kings chief customers for these unhappy human beings.[৬৯]

পর্তুগিজ জলদস্যুদের সফলতায় মগেরাও জল দস্যুতায় নেমে পড়ে। মগ ও ফিরিঙ্গিদের সমন্বয়ে গঠিত জলদস্যু বাহিনী জলপথে এসে বারবার বাংলায় লুণ্ঠনকার্য পরিচালনা করত। তারা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ধরে নিয়ে যেত। বন্দিদের হাতের তালু ছেঁদন করে পাতলা বেত চালিয়ে জাহাজের ডেকের নিচে পশুর মত বেঁধে রাখত এবং খাঁচাবদ্ধ মুরগির মত যৎকিঞ্চিৎ কাঁচা চাউল উপর হতে বন্দীদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিত তা খুটে খুটে খেয়ে জীবন বাঁচাতে হতো। এত কষ্ট ও অত্যাচারে যে ক'টা শক্ত প্রাণ বেঁচে থাকতো তাদের মধ্যে কাউকে ভূমি কর্ষণ ও অন্যান্য হীন কার্যে নিযুক্ত করত আর কাউকে দাক্ষিণাত্যের বন্দরসমূহে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের নিকট বিক্রি করত।[৭০] কখনো কখনো তাদেরকে উড়িষ্যায় নিয়ে যাওয়া হতো। অনেক সময় সমুদ্রোপকূল হতে কিছু দূরে নোংগর ফেলে তারা লোক মারফৎ সরকারি কর্মচারীদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে মুক্তিপণের মাধ্যমে বন্দীদের ছেড়ে দিত।[৭১] সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশের অসংখ্য লোক থেকে শুরু করে সতী-সাধ্বী সৈয়দজাদীও তাদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে যৌন উন্মাদনার বস্তু হিসেবে পরিগণিত হতো।[৭২] দেশে যেখানে সেখানে তারা অগ্নিসংযোগ, গৃহদাহ, জাতি বিধ্বংসী কাজ করে বাংলার শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে ছিল। মগদের অবাধ অত্যাচারে যেমন 'মগের মুলুক' তেমনি ফিরিঙ্গীদের কৃতকর্মের সাক্ষী হিসেবে 'ফিরিঙ্গী খালি' 'ফিরিঙ্গীর দেয়ানীয়া' 'ফিরিঙ্গী ফাড়ি' 'ফিরিঙ্গী বাজার' প্রভৃতি জায়গায় তাদের অত্যাচারের করুণ কাহিনী জড়িয়ে আছে।[৭৩]

মানুষ চুরি ও দাস ব্যবসার সাথে আরাকানী রাজাদের যোগসাজস থাকলেও পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের যুদ্ধ হয়েছে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আরাকানরাজ চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজদের উৎখাত করার উদ্দেশ্যে বাকলা রাজের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ দেয়াঙ্গের পর্তুগিজ উপনিবেশ আক্রমণ করে তাদের নৌ সেনাপতিকে আহত, অসংখ্য লোককে হত্যা ও বন্দী করে পর্তুগিজ বাণিজ্য কুঠি, দুর্গ এবং গির্জা ধ্বংস করেছিলেন। এ সংবাদ পেয়ে সন্দ্বীপের পর্তুগিজ উপনিবেশের অধিনায়ক কার্ভালো চট্টগ্রামের আরাকানী শাসনকর্তা সেনাবাদীকে হত্যা ও বন্দরের ১৪৯ আরাকানী রনতরী ধ্বংস করে চট্টগ্রামকে দখলে এনে নগরবাসীর উপর চরম অত্যাচার, নরহত্যা এবং জ্বালাওপোড়াও অভিযানে মেতে উঠে। আরাকানরাজ সিরিয়ামের পর্তুগিজ উপনিবেশের উপরও হামলা করেছিলেন। এ সময় মোগল নৌসেনাপতি ফতে খাঁ পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে সন্দীপ দখল করেন। পর্তুগিজ জলদস্যুদের সাথে আরাকানরাজের বহুবার যুদ্ধ হয়েছে এবং পর্তুগিজ বোম্বেট সিবাসটিয়ান গঞ্জালিশ ও গাভিনহারের নৌসেনাসহ অনেক রণতরীও ধ্বংস করেছিলেন।

আরাকানের রাজা মিনরাজাগ্যীর দুই পুত্র যথাক্রমে মিংখা মৌং ও অনাপুরামের মধ্যে সদ্ভাব ছিলনা। নিজের মৃত্যুর পর দুই পুত্রের মধ্যে গৃহ বিবাদ অনিবার্য ভেবে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র অনাপুরামকে আরাকান থেকে সরিয়ে চট্টগ্রামের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠান। অনাপুরাম বুঝতে পারেন যে, পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই মিংখা মৌং রাজা হয়ে তার উপর প্রতিশোধ নিবেন। তাই অনাপুরাম চট্টগ্রাম এসেই বড় ভাইয়ের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ শর্তে তিনি সন্দ্বীপের পর্তুগিজ শাসনকর্তা গঞ্জালিশের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন।[৭৪] কিন্তু পর্তুগিজরা এ সুযোগকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের পথ অনুসন্ধান শুরু করে।

মিন রাজাগ্যি ওরফে সেলিম শাহের মৃত্যুর পর ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে তার বড় ছেলে মিংখা মৌং (Minkha Maung) হুসাইন শাহ নাম ধারণ করে আরাকানের সিংহাসনে বসেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি অনাপুরামের মত স্বার্থান্ধ ছিলেন না। তিনি যুবরাজ অবস্থায় ডি ব্রিটো নামক এক জলদস্যুর হাতে কিছুদিন বন্দী ছিলেন। বন্দি অবস্থায়ও নিরীহ মানুষকে অন্যায়ভাবে লুণ্ঠন ও হত্যা করার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করেন। সেইসাথে সম্ভ্রান্ত, নিরপরাধী, নিরীহ বণিক ও সাধারণ মানুষকে বন্দি করে যে অমানবিক নির্যাতন চালানো হতো- তিনি তার জীবন্ত সাক্ষী ছিলেন। ফলে তিনি পর্তুগিজদের খুব ঘৃণা করতেন। আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি পর্তুগিজদেরকে সুনজরে দেখেননি। তাছাড়া পর্তুগিজরাও যুবরাজকে বন্দি রাখার অপরাধে নিজেরাও মিংখা মৌং এর কাছে প্রিয় পাত্র হবার কোন সুযোগ গ্রহণের পথ পায়নি। ফলে তারা কায়মনে আরাকানরাজ মিংখা মৌং এর পতন কামনা করতে থাকে। অন্যদিকে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা অনাপুরাম পর্তুগিজদের সহযোগিতা কামনা করায় পর্তুগিজরা তার সহযোগিতার মধ্য দিয়ে মিংখা মৌং এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের সুযোগ পায়। মূলত অনাপুরামও এ ধরনেরই সুযোগ অনুসন্ধান করছিলেন।

মিং খা মৌং ওরফে হুসাইন শাহ (১৬১২-১৬২২ খ্রিস্টাব্দ) আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করেই দেখলেন যে, তাঁর ছোট ভাই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা অনাপুরাম পর্তুগিজদের সাথে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। তার সৈন্য বাহিনীতে পর্তুগিজদের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। সেইসাথে তার দেহরক্ষী হিসেবে চারশো পর্তুগিজ সৈন্য মোতায়েন থাকে। অনাপুরাম শক্তি সঞ্চয় করে আরাকান আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে হুসাইন শাহ অনাপুরামকে শায়েস্তা করার জন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। পর্তুগিজদের সাহায্য নিয়ে অনাপুরাম আরাকানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত ও আহত হয়ে সপরিবারে সন্দ্বীপের পর্তুগিজ শাসক গঞ্জালিশের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। গঞ্জালিশ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনাপুরামকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তার বোনকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে বিয়ে করেন এবং ধনরত্নের লোভে কিছুদিন পর বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে অনাপুরামকে হত্যা করেন। অতঃপর গঞ্জালিশ অনাপুরামের বিধবা স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং স্বীয় ভাই এন্টনির সঙ্গে অনাপুরামের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে দেবার

চেষ্টা করলে তিনি (অনাপুরামের স্ত্রী) তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।[৭৫] অনাপুরামের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সমগ্র চট্টগ্রাম আরাকানের শাসনাধীনে অক্ষুণ্ন থাকে।

মূলত গঞ্জালিশ ছিল পর্তুগিজ জলদস্যুদের নেতা। হুসাইন শাহ পর্তুগিজদের ঘৃণা করলেও গঞ্জালিশ হুসাইন শাহের প্রধানতম শত্রু মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং অপর গৃহশত্রু আপন ভাই অনাপুরামকে হত্যা করার কারণে সাময়িকভাবে গঞ্জালিশ আরাকান রাজ হুসাইন শাহের শত্রুর শত্রু হওয়ায় খানিকটা মিত্র হিসেবে দেখা দেয়। সে মিত্রতার সুবাদে ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ হুসাইন শাহ সন্দ্বীপের পর্তুগিজ শাসক গঞ্জালিশের সঙ্গে আঁতাত করে মোগল অধিকৃত ভুলুয়া আক্রমণ করেন। এ অভিযানে গঞ্জালিশের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন কার্ভালোর নেতৃত্বে দেড়শত রণপোত, পঞ্চাশটি বড় রণতরী ও চার হাজার পর্তুগিজ সৈন্য যোগদান করে।[৭৬] এ অভিযানে আরাকানরাজ হুসাইন শাহ মোগলদের পরাজিত করেন এবং ভুলুয়ায় ব্যাপক লুণ্ঠন চালান। কিন্তু সেবাষ্টিয়ান গঞ্জালিশের মহা বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বিজয়ী আরাকানের রাজা অকস্মাৎ মোগলদের নিকট পরাজিত হন।[৭৭]

আরাকানের রাজা হুসাইন শাহ ও পর্তুগিজ নেতা গঞ্জালিশ পরস্পর বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে গঞ্জালিশ ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে আরাকান আক্রমণ করেন। কিন্তু এ অভিযানে গঞ্জালিশ আরাকান রাজার কাছে পরাজিত হন এবং তাঁর সেনাপতি নিহত হন।[৭৮] এভাবে গঞ্জালিশের ক্ষমতা খর্ব করে সন্দ্বীপ স্বীয় দখলে এলেও আরাকান ও মোগলদের দ্বন্দ্ব থেমে থাকেনি।

মোগলদের সাথে পরাজয়ের প্রতিশোধকল্পে হুসাইন শাহ তার চিরশত্রু বার্মার রাজা অনংগ পেতলুম (১৬০৫-১৬২৮ খ্রি.) এর সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন।[৭৯] সেইসাথে বাংলার সরহদ খান (শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ) যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত রয়েছেন বলে সংবাদ পেয়ে পুনরায় ১৬১৫ অথবা ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে ভুলুয়া আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বাংলার সুবেদার কাসেম খানের সহযোগিতায় আরাকানরাজ আবারও পরাজিত হন।[৮০] পরের বছর ১৬১৬ কিংবা ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের শীত মৌসুমে বাংলার সুবেদার কাশিম খান আরাকান আক্রমণ করলে আরাকানের রাজা বিজয়ী হয়।[৮১] অদক্ষতার অভিযোগে ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭ খ্রি.) কাশিম খানকে পদচ্যুত করে ইবরাহীম খান ফতেহ জঙ্গকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন।

সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের ভাই ইবরাহীম খান ফতেহ জঙ্গ বাংলা শাসনে উদারনীতি গ্রহণ করলেও ১৬২০ খ্রিস্টাব্দের বর্ষা মওসুমে আরাকানের রাজা হুসাইন শাহের সাথে যুদ্ধ বাঁধে। ইবরাহীম খান কর্তৃক আরাকানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার সংবাদ শুনে হুসাইন শাহ ম্রোহং থেকে বাংলা আক্রমণ করেন এবং ভুলুয়া অতিক্রম করে মেঘনা নদী দিয়ে ফরিদপুর অভিমুখে অনেক দূর অগ্রসর হন। মূলত তার লক্ষ্যস্থল ছিল ঢাকা। ইবরাহীম খান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ ও সৈন্য নিয়ে ঢাকা থেকে বের হয়ে বিক্রমপুর অতিক্রম করে ফরিদপুরের দিকে যান এবং আড়িয়াল খাঁ

নদী পথে আরাকানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সুবাদারের সৈন্য, নৌবল ও অবিচল সংকল্প দেখে আরাকান বাহিনী ঘাবড়ে যায় এবং যুদ্ধ না করে আরাকানে প্রত্যাবর্তন করে।[৮২] ফলে আরাকানের রাজা ভুলুয়া অধিকার করে নিলেও ইবরাহিম খান আরও দুই ক্রোশ সম্মুখে গিয়ে থানা স্থাপন করেন।

আরাকানের রাজা মিং খা মৌং ওরফে হুসাইন শাহ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী শাসক। তার সাহসিকতা ও স্বদেশ প্রেমের কারণে আরাকানী জনগণ অদ্যাবধি তাঁকে জাতীয় বীর হিসেবে শ্রদ্ধা করে থাকে।[৮৩] জবৌক শাহের মাধ্যমে যে পর্তুগিজরা আরাকানে স্বীয় অবস্থান তৈরী করেছিল এবং সময়ের ব্যবধানে মিনরাজাগ্যি বা সেলিম শাহের সময় তারা সুদৃঢ় অবস্থান তৈরী করে নিয়েছিল। রাজ্যের শৃংখলা বিধানের স্বার্থে কয়েক পর্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও তার সময় মুসলিম বিদ্বেষমূলক কোন সংঘাত হয়নি। চট্টগ্রামে নিয়োজিত আরাকানী মুসলিম সামন্ত শাসকদের ব্যাপারেও তার কোন বিদ্বেষমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়নি। সুতরাং মুসলমানগণ স্বাধীনভাবেই ইসলাম চর্চার সুযোগ লাভ করেছিল। হুসাইন শাহের মৃত্যুর পর ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় পুত্র থিরি থু ধম্মা সেলিম শাহ (দ্বিতীয়) নাম ধারণ করে আরাকানের সিংহাসনে বসেন। ইংরেজ মুদ্রাতত্ত্ববিদগণ থিরি থু ধম্মার মুসলমানী নাম দুষ্প্রাপ্য বলে অভিমত প্রকাশ করলেও পর্তুগিজ ইতিহাসবিদগণ তার মুসলমানী নাম সেলিম শাহ (দ্বিতীয়) বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৪] থিরি থু ধম্মার রাজত্বকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরাকানী সামন্ত দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করা হত। কথিত আছে যে, বাংলার সুবেদারের প্ররোচনায় ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের বার জন সামন্ত শাসক একযোগে থিরি থু ধম্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি কঠোর হস্তে তা দমন করে লক্ষ্য করলেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্র যুবরাজ শাহজাহানের বিদ্রোহের কারণে বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরী হয়েছে। এ সুযোগে তিনি এক অভিযান প্রেরণ করে ঢাকা নগরে প্রবেশ করেন। আরাকান বাহিনীর আগমনে আতঙ্কিত হয়ে মোগল প্রতিরক্ষা বাহিনীর দুই সেনাপতি মোল্লা মুরশীদ ও হামিদ হায়দার ঢাকা শহর ছেড়ে পলায়ন করেন। আরাকানী বাহিনী তিনদিন ধরে লুটতরাজ চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ নিয়ে যায়।[৮৫] এ বিবরণীতে বাংলার সাথে আরাকানের সংঘর্ষময় পরিস্থিতিতে বাংলার চেয়ে আরাকানকেই শক্তিশালী মনে হয়। অন্যদিকে আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মা কর্তৃক যুবরাজ শাহজাহানের সমীপে নাজরানা প্রেরণের তথ্যও পাওয়া যায়। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে যুবরাজ শাহজাহান বিদ্রোহ করে বাংলার সুবেদার ইবরাহীম খান ফতেহ জঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করেন। এতে থিরি থু ধম্মা এক প্রতিনিধির মাধ্যমে এক লক্ষ টাকার বহুমূল্যবান দ্রব্য নজরানা হিসেবে শাহজাহানের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেন। যুবরাজ শাহজাহান (খুররম) আরাকানের রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য বহু মূল্যবান পোষাক, মূল্যবান অন্যান্য দ্রব্য 'খেলাত' স্বরূপ পাঠান এবং এক ফরমান দ্বারা তার রাজ্যের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেন।[৮৬] এ বিবরণীর মীর্জা নাথান ছাড়া আর অন্য কোন সূত্র নেই। যদি এ তথ্যকে সঠিক ধরে

নেয়া যায়, তবে একদিক থেকে আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মাকে একজন দক্ষ কূটনৈতিক হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়; ভীতু, দুর্বল এবং নতজানু হিসেবে নয়। কেননা যুবরাজের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থানের কথা চিন্তা করেই হয়তো তিনি নজরানা পেশ করেছিলেন। এ ছাড়া রাজা থিরি থু ধম্মা ওরফে সেলিম শাহ দ্বিতীয় একজন মুসলিম অনুরাগী শাসক হিসেবেও পরিচিত। তার সময় আশরাফ খান নামক জনৈক মুসলিম ব্যক্তি লস্কর উজির বা সমর মন্ত্রীর পদ লাভ করে রাজ্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[৮৭] তার সময় প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশেষত আশরাফ খানকে মন্ত্রিত্ব দিয়ে রাজ্যের মৌলিক কার্যক্রম তার হাতেই সমর্পণ করেছিলেন বলে মুসলিম সংস্কৃতির বহুমুখী চর্চা এবং মুসলিম সভ্যতার বিস্তার ঘটে।

সেলিম শাহ দ্বিতীয় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আরাকানের শাসন কার্য পরিচালনা করলেও স্বীয় রানী নাৎসিনম (Natshinme) এবং মন্ত্রী নরপতিগ্যীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তার কোন যোগ্য উত্তরসূরী না থাকায় তার শিশুপুত্র মিনসানীকে (Minsani) রানীর অভিভাবকত্বে আরাকানের শাসন ক্ষমতায় বসানো হয়। কিন্তু মাত্র ২৮ দিনের মাথায় মন্ত্রী নরপদিগ্যী শিশু রাজা মিনসানীকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন।[৮৮] নরপদিগ্যী ছিলেন আরাকানের পূর্বতন রাজা থাটাজা (১৫২৫-১৫৩১ খ্রি.) এর প্রপৌত্র (Great grandson of Thatasa)। নরপদিগ্যীর মুদ্রায় মুসলমানী নামটি দুস্পাঠ্য হবার কারণে জানা যায়নি। অন্যায়ভাবে শিশু রাজা মিনসানীকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করার কারণে আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের শাসনকর্তাগণ এবং নিহত রাজার পিতৃব্য মেংগ্রী (Mengre) বাংলার মোগল সুবেদার ইসলাম খাঁর সহযোগিতায় বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু নরপদিগ্যীর নৌ শক্তির মজবুতির কারণে তারা সফল হতে পারেনি। মেংগ্রী পরাজিত হয়ে দলবলসহ নোয়াখালীর জুগিদিয়া মোগল ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় আরাকানে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং এ ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বাংলা থেকে অপহৃত বিভিন্ন জেলার প্রায় দশ হাজার লোক আরাকানী ও মগ পর্তুগিজদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজ বাসভূমি বাংলায় ফিরে আসে।[৮৯] সুবেদার ইসলাম খান মেংগ্রী ও তার অধীনস্ত আশ্রিত ব্যক্তিদেরকে ঢাকায় পুনর্বাসন করেন। রাজা নরপদিগ্যী এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিশাল নৌ বাহিনী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু মোগলদের কামানের গোলার মুখে টিকতে না পেরে তারা আরাকানে ফিরে যায়।[৯০]

রাজা নরপতিগ্যীর মুসলিম নাম উদ্ধার করা না গেলেও তিনি যে ইসলামের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা সেলিম শাহের (দ্বিতীয়) মত বড় ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত একজন মুসলমানকে তিনি লস্কর উজির বা সমর মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করেছেন।[৯১] বড় ঠাকুরের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নরপদিগ্যীর সহযোগিতায় আরাকানে মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ আরো ত্বরান্বিত হয়।

রাজা নরপদিগ্যী ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র (Nephew) থদো (Thado) আরাকানের রাজা হন।[১২] তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে মুসলমানী নাম গ্রহণ রীতি বর্জন করেন এবং নরপদিগ্যীর কন্যাকে বিয়ে করেন। তার সাত বছরের (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রি.) শাসনকালে তেমন কোন বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে থদোর মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্র সান্দা থু ধম্মা আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি মোট ৩২ বছর (১৬৫২-৮৪ খ্রি.) আরাকান শাসন করেন। সিংহাসনে আরোহণকালে তিনি পূর্ববর্তী আরাকানী রাজাদের সমস্ত উপাধি বাতিল করে 'সূবর্ণ প্রাসাদের অধীশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন। তার সময়ে ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বে বাংলার সুবাদার শাহ সুজা আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করলে রাজা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে সপরিবারে হত্যা করেন। এ ঘটনায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম দখল করে নেন। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা সুজা সপরিবারে নিহত হবার পর তার হতাবশিষ্ট দেহরক্ষীগণ কামানঞ্চি নামে খ্যাত হয়। আরাকানরাজ তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য তাদেরকে তার দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেয়। কিন্তু তারা এতেও শান্ত থাকেনি। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে সান্দা থু ধম্মার মৃত্যুর পর তারা এতটা উগ্র ও অস্থির হয়ে পড়ে যে, তারা সেখানে king maker এর ভূমিকা পালন করে। তারা মাত্র ২০ বছরে ১০ জন রাজাকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন এবং পদচ্যুত অথবা হত্যা করেছে। সান্দা থু ধম্মার মৃত্যুর পর আরাকানে আর শান্তি ফিরে আসেনি। পরবর্তী একশ বছর (১৬৮৪-১৭৮৪ খ্রি.) পর্যন্ত আরাকানে অস্থিতিশীল পরিবেশের মধ্য দিয়ে মোট ২৫ জন রাজা আরাকান শাসন করেছেন।[১৩] তারমধ্যে রাজা থিরি থুরিয়া, ওয়ারা ধম্মা রাজা, মুনি থু ধম্মা রাজা এবং সান্দা থুরিয়া ধম্মা কামানচিদের বেতনভাতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দানে ব্যর্থ হবার কারণে পদচ্যুত ও নিহত হন। তারা দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য রাজকোষ লুণ্ঠন, রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ এবং রাজাদের পদচ্যুতি ও হত্যার মধ্য দিয়ে দুই যুগের অধিককাল (১৬৮৪-১৭১০ খ্রি.) পর্যন্ত আরাকানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রাখে। কামানচি বাহিনীকে দমন করার জন্য মহাদণ্ডায়ু নামক এক দুঃসাহসী সামন্ত যুবক আরাকানের যুব সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করে। সংগঠিত যুবকদের সমম্বয়ে কামানচি বাহিনীকে তিনি সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে দেন এবং তাদেরকে আরাকানের বিভিন্ন পাহাড়িয়া এলাকায় নির্বাসিত করেন। কামানচিদের দমনের পর মহাদণ্ডায়ু সান্দা উইজ্যা নাম ধারণ করে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি আরাকানের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করেন এবং ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ব্যর্থ হন। অবশেষে পর্তুগিজ জলদস্যুদের দ্বারা বাংলায় লুণ্ঠন চালানোর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন।[১৪] আরাকানের রাজা সান্দা উইজ্যার প্রচেষ্টায় তেমন কোন ফল হয়নি। আরাকানের বিধ্বস্ত প্রশাসন আর শৃংখলার দিকে ফিরে আনা সম্ভব হয়নি। অরাজকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে থামাডার শাসনামলে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বার্মারাজা বোধাপায়া (১৭৮২-১৮১৯ খ্রি.) আরাকান অধিকার করে নেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আরাকানের ম্রাউক-উ বংশের শাসকদের মধ্যে শুধুমাত্র নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহ (১৪৩০-১৪৩৪ খ্রি.) বাংলার সুলতানদের করদরাজা হিসেবে রাজ্য শাসন করেছিলেন। তার পরবর্তী সুলতানগণ স্বাধীন ছিলেন। তদুপরি বাংলার অনুকরণে আরাকানে প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনে ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ মুদ্রায় কালিমা ও শাসকের মুসলিম নাম উৎকীর্ণকরণ, বিচারব্যবস্থায় কাজি নিয়োগ ও ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, দরবারকে অশ্লীলতা ও মদ-জুয়া মুক্ত রাখা, মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগ, হজ্জব্রত পালনের সুযোগ করে দেয়াসহ প্রজাদের ইসলাম চর্চার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। সেইসাথে ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানের অধীনে শাসিত হওয়ার ফলে সেখানে আগত অসংখ্য অলীয়ে কামিল কর্তৃক প্রচারিত ইসলামের আহ্বান চট্টগ্রাম থেকে আরাকানেও পৌছে। ফলে আরাকানী শাসকদের সহযোগী মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে মুসলমানগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সফল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২.২ আরাকান রাজসভায় মুসলিম অমাত্য

ম্রাউক-উ-রাজবংশ ছিল আরাকানের জন্য বিশেষত আরাকানী মুসলমানদের জন্য আশির্বাদ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ম্রাউক-উ-রাজবংশ বিশেষ করে ১৪৩০ থেকে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ অবধি দু'শো চুয়ান্ন বছর শাসনামলে শাসকদের বিজ্ঞতাও যেমন ছিল, তেমনি ছিল ইসলামের প্রতি সহযোগী মনোভাব। তাঁরা বাঙালী, আরবীয়, ইরানী, কিংবা আরাকানী সব অঞ্চলের মুসলমানকে প্রধানমন্ত্রী, সৈন্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, কাজী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দান করে রাজ্যের উন্নতি বিধানে তৎপর ছিলেন। নিম্নে তাদের সম্পর্কে সম্যক আলোচনা উপস্থাপন করা হলঃ

২.২.১ বুরহান উদ্দীন

আরাকান রাজসভার প্রধান আমাত্যগণের মধ্যে বুরহান উদ্দীন অন্যতম। তিনি বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের সপ্তম পূর্বপুরুষ। নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত 'নসবনামার' বিশ্লেষণ থেকে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানা যায়। নসবনামায় উল্লেখ করা হয় যে-

হামিদুদ্দীন- (গৌড়ের অধীন বাঙ্গালার উজীর)
বোরহানুদ্দীন- (আরাকানের [রোসাঙ্গে] লস্কর উজীর
ইবরাহিম (অশ্বরার কর্মে বিচক্ষণ)
সুজাউত উদ্দীন বা সুজা উদ্দীন (অস্ত্রেশস্ত্রে অনুপাম)
শেখরাজা বা বাবু খান (ফকির মোড়ল)
কাজী ইসহাক (ছিল দীন তা হন্তে উজ্জ্বল) বা (শরীয়ত খাদেম)
শরীফ মনসুর খোন্দকার (সৈয়দানী গর্ভে জন্ম)

নসরুল্লাহ খোন্দকার (কবি) [১৫]

শরীয়তনামা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এবং জঙ্গনামা কাব্যে প্রাপ্ত দ্বিতীয় আত্মবিবরণীতে কবির উপর্যুক্ত বংশ তালিকায় সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। কবি নিজের এবং তার ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষসহ মোট আট পুরুষের নাম এ আত্মবিবরণীগুলোতে পাওয়া যায়। কবির ঊর্ধ্বতন পুরুষ হামিদুদ্দীন যিনি গৌড় রাজ্যের বাংলা অঞ্চলের উজীর ছিলেন। তারপুত্র বোরহানুদ্দীন ছিলেন আরাকানের সমরমন্ত্রী বা লস্কর উজীর। কিন্তু প্রশ্ন হলো - হামিদুদ্দীন গৌড়ের কোন শাসকের উজীর এবং বোরহানুদ্দীন আরাকানের কোন রাজার মন্ত্রী ছিলেন এবং কোন দৈব কারণে তিনি বাংলা ছেড়ে আরাকানে পাড়ি জমান এ বিষয়ে কবি তেমন কিছুই উল্লেখ করেননি। অথচ এ ব্যাপারে তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন। আর এ তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য খোদ কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের সময়কালটিই আগে জানা জরুরী।

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করেন ১৫৬০ থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তিনি তার যুক্তিকে প্রমাণ করার নিমিত্তে কবির এই চরণকে উপস্থাপন করেন -

তখন রোসাঙ্গ দেশে / কিবা আদ্য কিবা শেষে
অশ্ব আরোয়ার না আছিল ॥
হয় গজ ব্যুহ সংখ্য / দেখি তানে নৃপমুখ্য
লস্কর উজীর তানে কৈল ॥[১৬]

উদ্ধৃত কবিতাংশের পাঠোদ্ধারে ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও ড. আবদুল করিমের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ড. আবদুল করিম 'হয় গজ বহুসঙ্গে - দেখি তানে নৃপরঙ্গে' উচ্চারণ করেছেন। অথচ এনামুল হক 'নৃপমুখ্য' উচ্চারণ করে তাকে নরমিখ্‌লা (Naramiekhlo) সাব্যস্ত করে কবির জন্মকাল নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে, নরমিখলা ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়ে ২৪ বছর বাংলার সুলতানদের আশ্রয়ে থেকে বাংলার সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সহযোগিতায় তার পিতৃরাজ্য আরাকান পুনরুদ্ধার করেন। সে সময় তার সাথে বাংলার সুলতান দু'পর্বে যে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) সৈনিক প্রেরণ করেছিলেন বুরহান উদ্দীন তাদের অন্যতম। পরবর্তীতে তিনিই আরাকানের লস্কর উজীর বা সৈন্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালন করে থাকবেন।[১৭] কিন্তু ড. আবদুল করিম এ তথ্যের সাথে একমত হতে পারেন নি। কেননা 'নৃপমুখ্য' যদি নরমিখলা হয় তাহলে কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের আবির্ভাব কাল হয় ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে। কেননা চার পুরুষে একশত বছর ধরলে কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের পূর্বে ৭ পুরুষে ১৭৫ বছর হয়। তাহলে নরমিখলার আরাকান বিজয় ১৪৩০+১৭৫=১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ হয়। অর্থাৎ এ সময় (১৬০৫ খ্রি.) নসরুল্লাহ খোন্দকার জীবিত থাকার কথা। কিন্তু শরীয়তনামা রচনার সময়কাল বিশ্লেষণ করলে নসরুল্লাহ খোন্দকারকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলে প্রমাণিত হয়।

প্রথমত, কবি শরীয়তনামা গ্রন্থে উল্লেখ করেন -

একদিন দোহাজারী শহরেতে রঙ্গে
বসেছিলুম কতজন অশ্বরার সঙ্গে ॥
তার মাঝে কহি এক অপূর্ব কথন
পণ্ডিতে জানিবা যেন অমূল্য রতন ॥[৯৮]

উল্লেখিত কবিতার চরণে 'দোহাজারী' শহরের নাম উল্লেখ আছে। দোহাজারী চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এখানে একটি রেল স্টেশন আছে। এ অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের পরে। অর্থাৎ ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সুবেদার শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম অধিকৃত হলে আরাকান রাজা সান্দা থু ধম্মা (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ) চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু আরাকানী রাজার মদদে মগেরা প্রায়ই দক্ষিণ চট্টগ্রামে আক্রমণ চালাতো। তাই সুবেদার শায়েস্তা খান শংখ নদীর তীরে আধু খান হাজারী ও লক্ষণ সিংহ হাজারীকে (লচমন সিংহ হাজারী) সীমান্ত পাহারার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেন।[৯৯] দু'জন হাজারীকে নিযুক্ত করায় ঐ স্থানের নাম দোহাজারী হয়েছে। সুতরাং কাব্যে দোহাজারী নামের উল্লেখ প্রমাণ করে যে, নসরুল্লাহ খোন্দকার ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের পরে তার শরীয়তনামা কাব্যটি রচনা করেন। ফলে ড. এনামুল হকের তথ্যের সাথে প্রায় ৬০/৭০ বছরের পার্থক্য বিবেচিত হয়। তবে যেহেতু সাত পুরুষের হিসাব ধরা হয়েছে তাই ব্যবধানকে ততটা অসামাঞ্জস্য বলে অনুমিত হয়না। কেননা প্রতি পুরুষে ২৫ বছর হিসাব অনুমানভিত্তিক। এ হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে কমবেশী হতে পারে।

দ্বিতীয়ত,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত 'শরীয়তনামা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে কবির নিজস্ব বিবরণেই গ্রন্থের রচনাকাল পাওয়া যায়। কবির ভাষায় -

এবে কহি তুমি সবে শুন মন দিয়া।
পুস্তক আদায় সন লওত গুনিয়া ॥
চন্দ্র ঋতু সিন্ধুপাশে গগনের বাস।
সমুদ্র দিবস আদি হইল ছয়মাস ॥[১০০]

কবির বিবরণ অনুযায়ী শরীয়তনামা গ্রন্থ রচনার তারিখ হয় চন্দ্র+ঋতু+সিন্ধু+পাশে গগণের বাস অর্থাৎ চন্দ্র =১, ঋতু=৬, সিন্ধু বা সমুদ্র =৭ (সাত সমুদ্র তের নদী) এবং গগণ=১ সুতরাং ১#৬#৭#১=১৬৭১ সাল হয় গ্রন্থ রচনার সময়কাল। ১৬৭১ সাল কি খ্রিস্টাব্দ না বাংলা না হিজরী কিংবা মঘী তার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু বিষয়টি উদ্‌ঘাটন করাও জরুরী। কেননা সাধারণত মধ্যযুগের কবিরা বিশেষত মুসলিম কবিরা হিজরী সন ব্যবহার করতেন, তবে চট্টগ্রামের কবিদের মধ্যে বাংলা সন এবং মঘী সন ব্যবহারেরও রেওয়াজ লক্ষ্যণীয়। কিন্তু ১৬৭১ সাল হিজরী, বাংলা বা মঘী সন হবার প্রশ্নই ওঠেনা। তবে ড. আবদুল করিম এটাকে নিশ্চিতভাবে শকাব্দ বলে উল্লেখ

করেছেন।[১০১] তাঁর হিসাব মতে শকাব্দ হলে ১৬৭১+৭৮=১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ হয়; কেননা শকাব্দ ও খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৭৮ বছরের ব্যবধান রয়েছে। অর্থাৎ শকাব্দের চেয়ে খ্রিস্টাব্দ ৭৮ বছর এগিয়ে থাকে। কিন্তু যদি ১৬৭১ সালকে ইংরেজি অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দ ধরা হয় তবে 'দোহাজারী' নামকরণের সময়কাল ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি দেখা যায়। অন্যদিকে ১৬৭১ সালকে শকাব্দ হিসেবে নিশ্চিতরূপে উপস্থাপন করার কোন যুক্তি তিনি উপস্থাপন করেন নি।

সুতরাং বুরহান উদ্দীন আরাকানের কোন শাসকের সৈন্যমন্ত্রী বা লস্কর উজীর ছিলেন তা সমসাময়িক কোন উপাত্ত না থাকায় সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা না গেলেও বলা যায়, ড. মুহম্মদ এনামুল হকের যুক্তির ভিত্তিতে তিনি আরাকানরাজ নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহের লস্কর উজীর ছিলেন। আর যদি ১৬৬৬ কিংবা ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দকে নির্ধারণ করা হয় তাহলে তিনি (১৬৬৬-১৭৫=১৪৯১) অর্থাৎ মিনদৌলাহ বা মুখু শাহ (১৪৮২-৯২) কিংবা বাসাউপিও ওরফে মাহমুদ শাহ বা মুহাম্মদ শাহের (১৪৯২-১৪৯৪) কিংবা সলিংথু ওরফে শেখ আব্দুল্লাহ শাহের লস্কর উজির ছিলেন। আর যদি ১৬৭১ সালকে শকাব্দ হিসাব করে গণনা করা হয় তবে তিনি (১৭৪৯-১৭৫)= ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ মিং ফালং ওরফে সিকান্দার শাহের লস্কর উজির ছিলেন। এছাড়াও বোরহান উদ্দীনের অধঃস্তন পুরুষ যথাক্রমে ইবরাহীম, সুজা উদ্দীন, শেখ রাজা, কাজী ইসহাক, শরীফ মনসুর খোন্দকার প্রমুখ রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

২.২.২ আশরাফ খান

আরাকান রাজসভার অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন আশরাফ খান। তিনি বর্তমান চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অধিবাসী ছিলেন। উক্ত থানার চারিয়া গ্রামে তার বিশাল ঐতিহ্যমণ্ডিত পাকা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। তার নিজ চারিয়া গ্রামের একটি পুকুর এবং রাউজান থানার কদলপুর গ্রামের লস্কর উজিরের দীঘিটিও তার স্মৃতি বহন করছে। উক্ত পুকুর দুটি তিনিই খনন করেছেন বলে কথিত আছে।

আশরাফ খানের জন্ম বৃত্তান্ত এবং পূর্ব পুরুষের তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তিনি আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মা (theri thudamma) ওরফে সেলিম শাহ ২য় (১৬২২-১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ) এর লস্কর উজির, সমরমন্ত্রী বা যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরাকানের রাজাগণ দেশী বিদেশী বহু মুসলমানকে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে যেমন মুসলিম প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করেছেন তেমনি তাঁদের বিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন করেছেন। সেই সূত্রে যেহেতু তৎকালীন চট্টগ্রাম আরাকানেরই অংশ ছিল তাই আরাকান প্রশাসনে মুসলমানরা দক্ষতার পরিচয়ে সহজেই স্থায়ী আসন গড়ে নিতে পারত।

বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাবান মধ্যযুগীয় কবি দৌলতকাজীই মূলত আশরাফ খান সম্পর্কিত তথ্য উপাত্তের উৎস। তিনি চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামের

অধিবাসী হেতু আশরাফ খান সম্পর্কে তিনি ভালভাবেই জানেন। আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মা ওরফে সেলিম শাহ (২য়) আশরাফ খানকে আরাকানের লস্কর উজীর পদে নিযুক্ত করেন। সমরমন্ত্রী হিসাবে আশরাফ খান ছিলেন আরাকান রাজসভার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যে, তিনি সাহিত্যের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন এবং তার এ সাহিত্য প্রেমের কারণেই আরাকানের অমাত্য সভায় কাজী দৌলতের মত বিখ্যাত কবির আবির্ভাব ঘটে এবং আরাকান হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্য চর্চার মহাকেন্দ্র। কবি দৌলতকাজীর ভাষায় -

শ্রীযুক্ত আশরফ খান অমাত্য প্রধান / ষোল কলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান ॥
নীতিবিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা রস চয় / পড়িলা শুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয় ॥
হেন মতে সভাকরি বসিয়া থাকিতে / কহেন্তে সানন্দ চিত্তে প্রসঙ্গ শুনিতে ॥
আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশ / বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ ॥
গুজ্রাতী গোহারী ঠেঁট ভাষা বহুতর / সহজে মহন্ত সভা আনন্দ সায়র ॥
শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি / শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী ॥
ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে / না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে ॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে / সকলে শুনিয়া যেন বুঝায় সানন্দে ॥
তবে কাজী দৌলৎ বুঝিয়া সে আরতি / পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥[১০২]

কবি দৌলতকাজীর কবিতায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আশরাফ খান ছিলেন আরাকানরাজ থিরি থু ধম্মা ওরফে সেলিম শাহের প্রধান অমাত্য বা শীর্ষ-স্থানীয় একজন মন্ত্রী। যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, শিক্ষা সংস্কৃতির লালন ও প্রজাবৎসলে তিনি ষোলকলা পূর্ণ অর্থাৎ পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। নীতিবিদ্যা ও কাব্য শাস্ত্রের প্রতিও তার প্রবল ঝোঁক প্রবণতা ছিল। তিনি নিজে যেমন জ্ঞানী ছিলেন তেমনি জ্ঞানের কদর ও জ্ঞান চর্চায় অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য প্রায়ই তিনি বিদ্বানদের সমম্বয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করতেন। বিদ্বানগণ আরবি, ফারসি, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় আলোচনা করতেন। কিন্তু মন্ত্রী আশরাফ খানের ইচ্ছে ছিল স্বদেশী বাংলা ভাষায় বক্তব্য এবং লিখিত বিষয় উপস্থাপিত করানোর জন্য। সে ইচ্ছে বাস্তবায়নের নিমিত্তেই মূলত দৌলতকাজী তার 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। উপরোদ্ধৃত কবিতাংশে কবি দৌলতকাজী আশরাফ খানকে অমাত্য প্রধান হিসেবে উল্লেখ করলেও কার অমাত্য প্রধান কিংবা রাজ্যের কোন বিভাগের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন তার কোন বিবরণ এখানে প্রদান করেননি। কিন্তু নিম্নোক্ত কবিতায় তার সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় -

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে একপুরী / রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী ॥
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার / নাম শ্রীসুধর্মা রাজা ধর্ম অবতার ॥[১০৩]

শ্রী সুধর্মা বলে আরাকান রাজার নাম উল্লেখ করেছেন কবি দৌলতকাজী। মূলত আরাকানী ভাষায় এ নামটি থিরি থু ধম্মা বা চন্দ্র সু ধর্মা নামে উচ্চারিত হয়। তাঁর মুসলিম নাম ছিল সেলিম শাহ (২য়)। কবি রাজাকে মগধের বংশ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ আরাকানের বৌদ্ধরা মগ নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন মগ

শব্দটি মগধ হতে এসেছে। ত্রয়োদশ শতকে ব্রাহ্মণ শক্তির অত্যাচারের মুখে মগ সম্প্রদায় মগধ হতে পালিয়ে এসে আরাকানে আশ্রয় নেয় এবং স্থানীয়ভাবে বসবাস শুরু করে। শ্রী সুধর্মা ছিলেন এ বংশেরই অধস্তন পূরুষ।[১০৪] তিনি আরাকানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ক্রমশ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন বলে কবি ক্রমে 'বুদ্ধাচার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং তার পূর্বের রাজাগণ ইসলামের প্রতি বেশী অনুরাগী ছিল তা সহজেই বুঝা যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল শাসক। তার রাজনৈতিক জীবনের শেষ পর্যায়ে আশরাফ খানের কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতায় আস্থা রেখে তাঁর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। কবি দৌলতকাজীর ভাষায় -

মহা রাজা আয়ু শেষ জানি শুদ্ধমন / তান হস্তে রাজনীতি কল্য সমর্পণ ॥[১০৫]

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আশরাফ খান বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তিনি বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য দ্বারা রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করলে রাজা তাঁকে আরো আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন। যে প্রেক্ষিতে রাজা তাকে পুত্রের মত স্নেহ দিয়ে অমাত্য সভার সদস্য করে নেন এবং আড়ম্বর অভিষেক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁকে রাজ্যের সৈন্য বিভাগের প্রধান দায়িত্ব দিয়ে লস্কর উজীর বা সমরমন্ত্রী উপাধিতে ভূষিত করে রাজ্যের সৈন্য বিভাগসহ প্রতাপশালী ক্ষমতা প্রদান করেন।[১০৬]

লস্কর উজীর আশরাফ খান ছিলেন অমাত্য সভার সদস্যদের মধ্যে রাজার বেশী আস্থাভাজন। বিশেষত তিনি লস্কর উজীরের দায়িত্ব পালনের কারণে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন অভিযানে রাজার সহযাত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। আরাকান রাজা সৈনিক বিভাগের বিষয় ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে আশরাফ খানের সাথে পরামর্শ করতেন। কবি দৌলত কাজীর ভাষায় -

নৃপতির সম্পাশে বৈসেন্ত দিবারাতি/ যথা যায় রাজা তথা চলেন্ত সঙ্গতি ॥[১০৭]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, আরাকানের শাসক মিংখা মং ওরফে হুসাইনশাহ (১৬২২-১৬২২ খ্রী.) এর উত্তরসুরী হিসেবে রাজপুত্র থিরি থু ধম্মাকে উত্তরাধীকারী মনোনীত করা হয়। আরাকানের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের সময় রাজাকে রাষ্ট্রীয় অভিষেকের মাধ্যমে সিংহাসনে বসানো হবে। কিন্তু রাজজ্যোতিষীগণ জানায় যে, ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মধ্যে রাজা থিরি থু ধম্মা মারা যাবেন। এত রাজমাতা রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান বন্ধ করে লস্কর উজীর আশরাফ খানের কাছে রাজ্যের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করেন।[১০৮] এভাবে রাজা নামেমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হলেও প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন মহাপাত্র আশরাফ খান।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে ডাচ বা ওলন্দাজদের আধিপত্যের ইতিহাস অত্যন্ত সুপরিচিত। বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে আরাকানে ডাচদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড চালু ছিল।' সে সূত্রে ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজধানী ম্রোহংয়ে তাদের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।[১০৯] ডাচরা আরাকানের রাজার সাথে একটি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সেখানে বাণিজ্যিক তৎপরতা চালাতো। তারা আরাকান থেকে চাল, কাপড়ের

রং, হাতির দাঁত এবং দাস-দাসী প্রভৃতি সংগ্রহ করত। মগ জলদস্যুরা বাংলার উপকূল থেকে যে সমস্ত লোকজনকে বন্দী করে নিয়ে যেত আরাকানের রাজা তাদের কিয়দংশকে দাস হিসেবে বিক্রি করত এবং অবশিষ্টদের আরাকানের অনাবাদী জমি আবাদ করে কৃষি উপযোগী করে গড়ার কাজে লাগাতেন।

ওলন্দাজরা ম্রোহংয়ে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও দুটি বিষয় তাদের কাছে বিব্রতকর বলে অনুমিত হতো। **প্রথমত,** আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মা'র সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ডাচরা ম্রোহংয়ের খোলা বাজার থেকে চাল ক্রয় করত। কিন্তু লস্কর উজীর আশরাফ খান তা বন্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও দাম অনুসারে লস্কর উজীরের কাছ থেকে ক্রয় করতে বাধ্য করেন।[১১০] এতে ডাচরা বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হলেও আশরাফ খান যখন লক্ষ্য করলেন যে, ডাচরা খোলা বাজারে চাল কিনতে গিয়ে জনসাধারণকে মূল্য কম দেয়াসহ এবং বিভিন্নভাবে প্রতারিত করছে পক্ষান্তরে তারা খোলা বাজারে লোহা ও লৌহ নির্মিত বিভিন্ন পদার্থ খুব বেশী দামে বিক্রি করছে। ফলে আরাকানী জনগণ প্রতারিত হচ্ছে। এ অবস্থা রোধে তিনি নির্ধারিত মূল্যে লস্কর উজিরের নিকট থেকে চাল ক্রয় এবং লৌহ ও লৌহ নির্মিত পদার্থ লস্কর উজীরের নিকট বিক্রি করতে বাধ্য করেন। ডাচরা এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে লস্কর উজীরের বিরুদ্ধে রাজার নিকট অভিযোগ করলেও রাজা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।[১১১] এতে আশরাফ খানের মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি এবং রাজপরিবারে তার গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, তৎকালীন সময়ে আরাকানের ভূমির তুলনায় জনবসতি ছিল কম। পাহাড়িয়া এলাকা হবার কারণে আরাকানের অধিকাংশ এলাকা ছিল অনাবাদী ও জনবসতিহীন। তাই সে সময় সেখানে একটি নিয়ম ছিল যে, যে কোন বিদেশী যতদিন ইচ্ছে আরাকানে থাকতে পারবে এবং সম্মতি সাপেক্ষে আরাকানী মহিলাদের বিয়ে করতে পারবে। তবে দেশ ছেড়ে যাবার সময় আরাকানী স্ত্রী ও তার গর্ভজাত সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু ইউরোপীয়রা নিজেদের স্ত্রী পুত্রদের আরাকানে রেখে যাওয়া পছন্দ করত না। তাই তারা আরাকান ছেড়ে চলে যাবার সময় তাদেরকে বড় মাটির মটকাতে লুকিয়ে নিয়ে যেতে চাইত। কিন্তু লস্কর উজির এ চাতুরী ধরে ফেলেন।[১১২] ইউরোপীয় সন্তানদের রেখে দেবার একটি কারণ যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি তেমনি সে সকল সন্তান ও মহিলাকে মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা হতো। লস্কর উজির আশরাফ খান এক্ষেত্রে সফল ভূমিকা পালন করেন।

আরাকানের রাজসভায় লস্কর উজির আশরাফ খানের প্রভাব ও আরাকান প্রশাসনে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় তার প্রচেষ্টার বিবরণ পাওয়া যায় পর্তুগিজ পরিব্রাজক Augustine monk sebastian Manrique এর বিবরণী থেকে।[১১৩] তিনি বর্ণনা করেন যে, বাংলা থেকে অপহৃত অর্ধশতাধিক হিন্দু ও মুসলিম বন্দী নিয়ে আরাকান অভিমুখী পর্তুগিজদের একটি নৌযানে করে তাদের ম্রোহং যাত্রা শুরু হয়। দাস বহনকারী এ

নৌযানে অনেক মুসলমান বন্দী ছিল। ম্যানরিক বহু কষ্টে হিংস্র জন্তু, নদী নালা, গভীর পাহাড়িয়া খাঁদ, বর্ষার অবিরল বর্ষণ, পানির বিপুল স্রোত এ সবের মধ্য দিয়ে ম্রোহংয়ে যাত্রা করেন এবং এ কষ্টকর পরিবেশের মধ্যে দাসদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।[১১৪] আরাকানে পৌঁছে ম্যানরিক দেখতে পান যে, এ সকল বন্দীদের মুসলিম গার্ড বেষ্টিত এক বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। তিনি আরাকানে এসে আরো লক্ষ্য করেন যে, রাজা থিরি থু ধম্মার একজন উপদেষ্টা বা চিকিৎসক আছেন- যিনি ধর্মে মুসলমান। ম্যানরিক তাকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভণ্ড দরবেশ বলে আখ্যায়িত করেন। ম্যানরিকের ভাষায় -

> A false prophet of the Maumetan faith, who in promissing to render him (the king thirithudhamma) invisible and invincible, undertook that he sould obtain the vast Empires of Delhi, Pegu and Siam, besides many other similar inanilies... ... [the Muslim doctor] having twice visited the hateful Mausoleum ... was held to be a saint by these Barbarians.[১১৫]

ম্যানরিকের বক্তব্য থেকে তাঁকে শুধু খৃস্টান ধর্ম প্রচারক হিসেবেই নয় বরং একজন উদ্ধত ও মনে প্রাণে ইসলাম এবং মুসলিম বিদ্বেষী ধর্মজাযক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি রাজার মুসলিম উপদেষ্টা বা চিকিৎসককে শুধুমাত্র মুসলিম হবার কারণে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভণ্ড দরবেশ (নবী) বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকি মহানবী (স.) এর সমাধিসৌধ তথা পবিত্র মদীনা নগরীকে 'Hateful Mausoleum' বা ঘৃণিত সমাধিসৌধ বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে যাকে রাজার উপদেষ্টা বা চিকিৎসক বলে উল্লেখ করেছেন তিনিই হলেন আরাকানের লস্কর উজীর আশরাফ খান। রাজা থিরি থু ধম্মা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন বলে ম্যানরিক তাঁকে রাজার উপদেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে রাজার সাথে তাঁর সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে, তিনি রাজার শারীরিক মানসিক তথা স্বাস্থ্যগত বিষয়েরও খোঁজ-খবর নিতেন বলে ম্যানরিক তাকে ডাক্তার বা চিকিৎসক হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আশরাফ খান অত্যন্ত মোত্তাকী ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী ছিলেন। তিনি দু'বার পবিত্র মদিনা নগরী ভ্রমণ করেছেন অর্থাৎ দু'বার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেছেন। সুতরাং সে সময় আরাকান থেকে মুসলমানদের হজ্জব্রত পালনের সুযোগ ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ম্যানরিকের বিবরণীতে আরও জানা গেল যে, মুসলিম বন্দীদেরকে মুসলিম গার্ড বেষ্টিত অবস্থায় একটি বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। তাহলে বুঝা যায়, পর্তুগিজ কর্তৃক অপহৃত বন্দীদের মধ্যে মুসলিম বন্দীগণ আরাকানের রাজার হস্তগত হলে তিনি তা মুসলমান সৈনিকদের হাতে ন্যস্ত করতেন এবং তারা তাদের বিশেষ স্থানে অর্থাৎ তুলনামূলক ভালো কোন স্থানে পুনর্বাসিত করেছেন বলে অনুমান করা যায়। এ চিন্তার ভিত্তিতেই কোন কোন গবেষক[১১৬] বর্তমান আরাকানের রোহিঙ্গাদের কৃষিজীবী একটি

অংশকে বাংলা থেকে পর্তুগিজ কর্তৃক অপহৃত এ সকল দুঃখী মানুষেরই অধস্তন পুরুষ বলে মনে করেন।

কবি দৌলত কাজীর কাব্য বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, রাজজ্যোতিষির কথামত রাজা থিরি থু ধম্মা সিংহাসনে আরোহণ করার সময় কোন অভিষেক করেননি। কিন্তু ম্যানরিক একটি অভিষেকের আনুষ্ঠানিকতার বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন - রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে (King's crowning ceremony) মুসলমান সৈনিকগণ সব'চে বেশী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কুচকাওয়াজ এর সূচনা হয় মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনীর মাধ্যমে; যার নেতৃত্বে ছিলেন জনৈক মুসলিম কমান্ডার। তার পেছনে ছিল ছয়শত সদস্য বিশিষ্ট অশ্বারোহী বাহিনী। ম্যানরিকের বর্ণনায় -

> This man, who was of Maumetan race and sect, was dressed in green velvet ornamented with plaques of silver, mounted upon a superb white horse from Arabia.... this Agarene commander led six hundred horsemen in those squadrons; the first composed of Mogors, who, confindet of future bless in the paradise of their false prophet, were clothed in silks of various textures, but all green in colour. they carried gilded bows decked out with green slung on the left shoulder. On the left side they also had slung from their cross-belts, handsome quivers, while curved scimitars, plated with silver hung from their belts. All the horses in the Agarene squadron were clothed in green silks of various kinds.[117]

উপরোল্লিখিত বিবরণে অভিষেক অনুষ্ঠানের নেতৃত্বদানকারী মুসলিম কমান্ডার, যাকে ম্যানরিক ভণ্ডপীর (false prophet) বলে উল্লেখ করেছেন, সেই লস্কর উজীর আশরাফ খান রৌপ্যখচিত অলংকারে সুশোভিত মখমলের সবুজ পোষাক পরিধান করে জাঁকজমকপূর্ণভাবে সাজানো সাদা একটি আরবীয় ঘোড়ার উপর আরোহণ করে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের সর্বাগ্রে অবস্থান নেন। আশরাফ খান ব্যবহৃত ঘোড়াটি আরবীয় ঘোড়ার মত তেজী এবং আরব মুসলিম সৈনিকদের মত আশরাফ খান সুসজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করেছিলেন বলে ম্যানরিক সম্ভবত আরবীয় ঘোড় সওয়ারের প্রতিচ্ছবিই সেখানে অনুভব করেছিলেন হেতু তিনি আরবীয় ঘোড়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অথবা ঘোড়াটি সরাসরি আরব থেকেও আমদানী করা হতে পারে। যা হোক, তার পেছনে ছিল ৬ শতাধিক অশ্বারোহী সদস্য সম্বলিত সেনাবাহিনী, যাদের চোখে আশরাফ খান কর্তৃক দেখানো বেহেস্তের স্বপ্নীল আনন্দ উদ্ভাসিত ছিল। এতে অনুমান করা যায় যে, ছয়শত সৈনিকই ছিল মুসলিম, তারা নিজেদের রাজ্যকে একটি মুসলিম প্রভাবিত রাজ্য অনুভব করে মন্ত্রী আশরাফ খানের নেতৃত্বে বেহেস্তী ইসলামি পরিবেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ছিল; যার শেষ ফলাফল জান্নাত। এছাড়া সৈনিকদের সবুজ পোষাক, বাম কাঁধে ঝুলন্ত সবুজ রঙে আচ্ছাদিত ধনুক, রূপার প্রলেপ দেয়া ঝকঝকে তলোয়ার ঝুলছিল বাম পার্শ্বে বাঁধাইকৃত সুদৃশ্য ক্রসবেল্ট থেকে। সেইসাথে সবুজ

সিল্কের কাপড়ে সাজানো হয়েছিল তাদের সাজোয়া ঘোড়াগুলোকে; যা সত্যিকারের একটি জমকালো অনুষ্ঠানের অপরূপ সাজ-সজ্জা হিসেবে কাজ করেছে। মূলত ধনুক, তলোয়ার ও ঘোড়ার সাজসজ্জা আরব মুসলিম যোদ্ধাদের কথাই স্মরণ করে দেয় বলেই মুসলিম বিদ্বেষী ম্যানরিক বার বার আশরাফ খানকে ভণ্ড পির বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি মুসলমানদেরকে যেভাবেই চিহ্নিত করুন না কেন এর মাধ্যমে যে আরাকান প্রশাসনে মুসলিম প্রভাবের একটি জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আরাকান রাজসভার সমরমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আশরাফ খান যে রাজ্যের উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানে ব্যাপক প্রশংসনীয় অবদান রাখেন তেমনি আরাকানে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ইসলামের চারি ইমামের মধ্যে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের ভিত্তিতে তিনি ইসলাম চর্চা করেছেন।[১১৮] তিনি নিজে যেমন ছিলেন একজন তৌহিদবাদী মুসলমান তেমনি রাজ্যে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উলামা পীর মাশায়েখ তথা সকল ধরনের ইসলাম প্রচারক দলকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। ইসলামের অনুসারী স্বদেশী-বিদেশী, আরবীয়, গৌড়ীয়, ভারতীয় কিংবা মোগল পাঠানের কোন ভেদাভেদ তিনি করেননি বরং সকলকে নিজের শরীরের মত মনে করে তাদের কাজে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে গেছেন।[১১৯] মুসলমানদের কল্যাণে তিনি পুকুর খনন করেছিলেন এবং মসজিদও নির্মাণ করে ছিলেন। কবি দৌলত কাজীর ভাষায় -

মসজিদ পুস্কর্নী দিলা বহুল বিধান / নানা দেশে গেল তান প্রতিষ্ঠা বাথান ॥[১২০]

কিন্তু তথ্যের অভাবে আশরাফ খান নির্মিত মসজিদের কোন বিবরণ উপস্থাপন করা যায়নি। তবে তাঁর প্রচেষ্টায় আরাকানে যে ইসলামের প্রসার ও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

২.২.৩ বড় ঠাকুর

আরাকানের সমরমন্ত্রী আশরাফ খানের পরে মুসলিম লস্কর উজীর বা সমরমন্ত্রী হন বড় ঠাকুর। তিনি আরাকানরাজ নরপদিগ্যীর (১৬৩৮-১৬৪৫ খ্রি.) শাসনামলে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।[১২১] আলাওল উল্লেখ করেন -

রাজ্যপাল সৈন্যমন্ত্রী আছিলেন তাত / শ্রী বড় ঠাকুর নাম জগৎ বিখ্যাত ॥
(সয়ফুল মুলক বদীউজ্জামাল)[১২২]

বড় ঠাকুর ছিলেন চট্টগ্রামের পটিয়া থানার চক্রশালা গ্রামের অধিবাসী। তার পিতামহ গৌড় থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন।[১২৩] তবে কোন প্রেক্ষিতে ও কত খ্রিস্টাব্দে তারা গৌড় থেকে চক্রশালায় এসে বসতি স্থাপন করেন তা জানা যায় না। সেইসাথে বড় ঠাকুরের মুসলিম নামও অদ্যাবধি অজ্ঞাত রয়ে গেছে। 'বড় ঠাকুর' মূলত আরাকানরাজ নরপদিগ্যী কর্তৃক প্রদত্ত কোন উপাধি। কেননা এ ধরনের বিভিন্ন উপাধি

বা পদধারী অনেক বংশ অদ্যাবধি চট্টগ্রামে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত আরাকান রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে রোয়াঝাঁ, পাঁঝা, সাধা, ছুয়ান, ঠাকুর, সাদিক নানা প্রভৃতি খেতাব বা পদবীধারী বংশ আরো বিদ্যমান। এঁদের নামে চট্টগ্রামের পটিয়া থানায় আজো পাঁঝার পাড়া (বরলিয়া গ্রাম), সাধার পাড়া (গৈড়লা গ্রাম) ছুয়ান পাড়া (লড়িহরা) প্রভৃতি এলাকা রয়েছে। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, বড় ঠাকুর আরাকানরাজ কর্তৃকই এ উপাধি পেয়েছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরাকান অঞ্চলে ডাচদের বাণিজ্যিক স্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে আরাকানের রাজনীতিতে একজন নতুন লস্কর উজিরের আবির্ভাব ঘটে। এ নতুন উজিরের আমলে তাদের চাল বিক্রির একচ্ছত্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে 'কামা নামক জনৈক মন্ত্রী তাদের (ডাচদের) ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব খাটাতে থাকে এবং ডাচ ব্যবসায়ী ও আরাকানের রাজার মধ্যে মধ্যস্থতার কাজে নিয়োজিত হয়।[১২৪] উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডাচদের মুসলিম নামসমূহ উচ্চারণ ও লিখনের বানান এতই ত্রুটিপূর্ণ যে 'কামা' নামটি দ্বারা অন্য কোন সূত্র ছাড়া তার আসল নাম আবিষ্কার করা সত্যই কষ্টকর। যেহেতু অন্য কোন সূত্র নেই তাই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে আরাকানের সমসাময়িক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উক্ত 'কামা' কে বড় ঠাকুরই মনে হয়। কেননা ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। নরপদিগ্যী কর্তৃক পরিচালিত সে ষড়যন্ত্রের অবস্থা পর্যালোচনা করলে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে এসে প্রভাবশালী মুসলিম লস্কর উজীর আশরাফ খান আরাকানের রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন কিংবা মারা গেছেন; কেননা তাঁর মৃত্যুর কোন সাল পাওয়া যায় নাই। রাজনীতিতে তার স্থানে সম্ভবত নরপদিগ্যী লস্কর উজীরের পদ নেন[১২৫] এবং সে সময় ডাচদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়। হয়তো তাঁর সময়ই আরাকান রাজার প্রাসাদ রাজনীতি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে এবং তারই ষড়যন্ত্রে রাজা থিরি থু ধম্মা নিহত হন এবং শিশু পুত্র মিনসানীকে রানীর অভিভাবকত্বে সিংহাসনে বসালেও মাত্র আটাশ দিনের মাথায় তাকে হত্যা করে রাজা নরপদিগ্যী আরাকানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন; যা ইতোপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। নরপদিগ্যী ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর লস্কর উজীর বা সৈন্যমন্ত্রী ছিলেন বড় ঠাকুর। সুতরাং ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে ডাচ ব্যবসায়ীগণ যাকে রাজা এবং তাদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি হিসেবে 'কামা' নামে যে মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন তিনি বড় ঠাকুর হতে পারেন বলে ধারণা করা যায়।

বড় ঠাকুর একজন উন্নতমানের মুসলিম ছিলেন। কেননা মহাকবি আলাওল তাঁর পুত্র মাগন ঠাকুর সম্পর্কে লেখেন -

সিদ্দীক বংশেতে জন্ম শেখাজাদা জাত / কুলে শীলে সৎকর্মে ভুবন বিখ্যাত ॥

(সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল)[১২৬]

মূলত সিদ্দিক বংশ বলতে খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর উপাধি ছিল সিদ্দিক। সেই ক্রমধারা অবলম্বনে তাকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর বংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন গবেষক[১২৭] 'সিদ্দিক বংশ' শব্দকে অতিরঞ্জিত উপস্থাপন বলে অভিযোগ করলেও এ কথা বলা যায়, তাদের কৃতকর্মে ইসলামের অনুশাসন ছিল বলেই কবি এ ধরনের শব্দ চয়ন করেছেন। সেইসাথে তাকে শেখজাদা জাত শব্দের দ্বারা রাজকীয় পরিবার এবং ইসলামি জ্ঞানে সুপণ্ডিত (শাইখ) বলে অনুমান করা যায়। সুতরাং একজন পরহেজগার ও ইসলামি জ্ঞানে সুপণ্ডিত (আলিম বা শাইখ) কর্তৃক ইসলামের প্রসার ও প্রভাব ঘটাই স্বাভাবিক।

২.২.৪ কোরেশী-মাগন ঠাকুর

আরাকান রাজসভার যে কজন প্রভাবশালী মুসলিম অমাত্যের সম্পর্কে জানা যায় তাদের মধ্যে কোরেশী মাগন ঠাকুর অন্যতম। কোরেশী মাগন ঠাকুরের পিতা বড় ঠাকুরও আরাকানের একজন মন্ত্রী ছিলেন যা আগেই আলোচিত হয়েছে। যেহেতু পিতা-পুত্র দু'জনই মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেছিলেন, সেহেতু চাকরি কিংবা রাজকীয় দায়িত্ব পালনের সুবাদেই তারা বংশানুক্রমে আরাকানের রাজধানী ম্রোহংয়ে বসবাস করতেন বলে অনুমান করা যায়। সুতরাং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সম্পদ বৈভবে নিঃসন্দেহে তারা উচ্চস্তরের লোক ছিলেন এবং এ ধরনের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লোক রাজধানীতেই বসবাস করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারা পূর্ব পূরুষ থেকে বংশানুক্রমে আরাকানের অধিবাসী ছিলেন না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরেশী মাগনের পিতা চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অধিবাসী ছিলেন। তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নিয়ে রাজধানীতে বসবাস করলেও কোরেশী মাগন চট্টগ্রামের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এমনকি তার রচিত চন্দ্রাবতী কাব্যের[১২৮] বিভিন্ন স্থানে খাস চট্টগ্রামী শব্দ ব্যবহার করেছেন; যা বাংলা ভাষার আর অন্য কোন কথ্য ভাষায় খুব কমই ব্যবহৃত হয়। যেমন কবি তার চন্দ্রাবতী কাব্যে উল্লেখ করেন -

> কাষ্টসব একত্র করিয়া ভুর বান্ধি/ বহুল প্রকার করি চতুর্দিকে ছান্ধি ॥
> তাহাত বসাইত কন্যা কুমার সুন্দর/ এড়ি দিল ভুর খানি সাগর ভিতর ॥[১২৯]

উপরোদ্ধৃত কবিতায় কবি ভেলা অর্থে 'ভুর', ঘেরা অর্থে ছান্ধা, ছেড়ে দিল অর্থে 'এড়ি দিল' শব্দের ব্যবহার করেছেন যা অন্য কোন স্থানে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং তিনি চট্টগ্রামের সংস্কৃতিকে ভুলতে পারেননি তা সহজেই বুঝা যায়।

কোরেশী মাগন ঠাকুর আরাকানের রাজা নরপদিগয্যীর (১৬৩৮-৪৫ খ্রি.) শাসনামলে অমাত্য সভার মন্ত্রী ছিলেন। নরপদিগয্যী ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবং মৃত্যুর পূর্বে তার একমাত্র কন্যা সন্তানকে অভিভাবকহীন অবস্থায় না রেখে মন্ত্রী মাগন ঠাকুরকে কন্যার অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেন। কবি আলাওল উল্লেখ করেন -

> কন্যার বৈভব দেখি ভাবে নরনাথে / এতেক সম্পদ সমর্পিমু কার হাতে ॥
> এক মহা পুরুষ আছিল সেই দেশে / মহাসত্য মুসলমান সিদ্দিকের বংশে ॥

(পদ্মাবতী)[১৩০]

কবি আলাওল সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল কাব্যে আরো স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন -

তাহান অমাত্য শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত মাগন / শিশুকালে বৃদ্ধ রাজা কৈলা সমর্পণ ॥[১৩১]

কিংবা

নানা গুণ পারগ মোহন্ত কুলশীল / তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিল ॥[১৩২]

উল্লেখ্য, কোরেশী মাগন ঠাকুর একজন চরিত্রবান ও আস্থাশীল মুসলমান ছিলেন বলেই নরপদিগ্যী তাঁর হাতে নিজ কন্যার দায়দায়িত্ব সমর্পণ করেছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আরাকানরাজ নরপদিগ্যীর কন্যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করাকে অর্থাৎ কবির ভাষায় *'শিশুকালে বৃদ্ধ রাজা কৈলা সমর্পণ'* চরণে 'সমর্পণ' শব্দ ব্যবহার করাতে কোন কোন গবেষক[১৩৩] এ শব্দকে কন্যা সম্প্রদান অর্থেই গ্রহণ করে কোরেশী মাগনকে রাজ জামাতা বলে বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু সমর্পিব, সমর্পণ ও সমর্পিলা শব্দ দ্বারা মূলত কবি হাতে তুলে দেয়া কিংবা লালন পালন করা, অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করেছেন।

'মাগন ঠাকুর' শ্রুতিগতভাবে সাধারণত অমুসলিম নামই মনে হয়। কারণ ভারতীয় উপমহাদেশে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলিম নামসমূহ সাধারণত আরবি ভাষার এবং ইসলাম তথা তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি সম্পৃক্ত করে রাখা হয়। পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ সাধারণত প্রতিমাদের সম্পৃক্ত করে নাম রাখেন। ঠাকুর, ব্রাহ্মণ, ঘোষ, বোস, দত্ত, সেন এ ধরনের উপাধি সাধারণত হিন্দুরাই ব্যবহার করে থাকেন। এ ধরনের একটি সাধারণ ধারণা থেকে ড. সুকুমার সেন মাগন ঠাকুরকে মুসলমান মনে করেন না। তিনি কখনো তাঁকে মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন[১৩৪] কখনো তাঁকে রাজকন্যার ও মুখ্য পাটেশ্বরীর যশস্বিনী পালিত পুত্র, প্রধান অমাত্য এবং জাতিতে হিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩৫] আবার কখনো তিনি তাঁকে আরাকানের রাজপুত্র এবং কখনো রাজজামাতা বলেও উল্লেখ করেছেন।[১৩৬] মূলত এ সবের উল্লেখের মূল লক্ষ্য হল তাঁকে অমুসলিম এবং মগ বলে প্রমাণ করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো।[১৩৭] কিন্তু এ কথা স্পষ্টত প্রমাণিত যে কোরেশী মাগন ঠাকুর মুসলমান ছিলেন। কেননা কবি আলাওল স্পষ্টভাবে তাকে সিদ্দিক বংশেতে জন্ম শেখজাদা জাত' কুলে শীলে সৎকর্মে ভূবন বিখ্যাত, এবং মহাসত্ত্ব মুসলমান সিদ্দিকের বংশে' বলে উল্লেখ করেছেন। কবিরা সাধারণ প্রশস্তির ক্ষেত্রে খানিকটা বাড়িয়ে বলেন বলে যে মন্তব্য পাওয়া যায়[১৩৮] তা যদি সত্য বলেও ধরে নেয়া হয় তবুও অন্তত এটুকু বলা যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.) এর বংশোদ্ভূত যদি নাও হয়ে থাকে তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে, তিনি একজন উন্নতমানের বিশ্বাসী ও খোদাভীরু মুসলমান না হলে কবি এ ধরনের

ভাষা ব্যবহার করতেন না। তাছাড়া একজন অমুসলমান এ ধরনের শব্দের মাধ্যমে স্তুতি করা মোটেও পছন্দ করবেন না। সেইসাথে আরো বলা যেতে পারে যে, আরাকানে বাংলা ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে যে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে তা মূলত আরাকান প্রশাসনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুসলমান অমাত্যগণের সহায়তাতেই হয়েছে। কোন আরাকানী অমুসলিম অমাত্য বাংলা সাহিত্যের বিকাশে কোন প্রকার পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় কোরেশী মাগন ঠাকুর একজন মুসলমান অমাত্য ছিলেন।

চন্দ্রাবতী কাব্যের পাঁচটি ভনিতায় কোরেশী মাগন ঠাকুরের নাম 'কোরেশী মাগন' বলে উল্লেখ রয়েছে।[১৩৯] সেইসাথে ছয়টি ভনিতায় শুধুমাত্র 'মাগন' নাম পাওয়া যায়।[১৪০] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ মাগন নাম থেকেই অনেকে তাঁকে হিন্দু, মগ প্রভৃতি উপাধিতে অমুসলিম মনে করে থাকেন। যেহেতু তাঁর সরাসরি কোন মুসলিম নাম পাওয়া যায় না তাই তারা এ বক্তব্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু বাস্তব কথা হলো - মাগন তাঁর মূল নাম নয়, এটি ছিল তার নেক নাম বা পিতামাতা কর্তৃক ডাকা একটি আদুরে নাম, এ প্রসঙ্গে কবি আলাওল তার সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল কাব্যে উল্লেখ করেন -

মহাদেবী মাগি পুত্র পাইলা প্রভুস্থান / ঠাকুর মাগন নাম থুইলা তেকারণ ॥[১৪১]

উপরোক্ত কবিতাংশে মহাদেবী বলে কোরেশী মাগন ঠাকুর এর মাকে বুঝানো হয়েছে। 'দেবী' শব্দটি সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের প্রতীমার 'দেবী সুন্দরীর' সৌন্দর্যের প্রেক্ষিতে সুন্দরী মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। সেই প্রেক্ষিতেও কেউ কেউ কোরেশী মাগন ঠাকুরের পিতা বড় ঠাকুর ও তার মাতাকে অমুসলিম মনে করতে পারেন। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক সংস্কৃতিই মুসলিম পরিবারে তৎকালীন সময়েও যেমন প্রচলিত ছিল তেমনি অদ্যাবধি তা চালু আছে। যেমন 'লক্ষ্মী' একটি প্রতীমার নাম; যাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী মনে করে পূজা করে থাকেন। আবার ছেলে মেয়েদের ভাল আচরণ এবং ভাল বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে তাদেরকে 'লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী মেয়ে' বলা হয়ে থাকে। এ বাক্যটি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ব্যবহার করলেও তা হিন্দু-মুসলিম সবাই সমভাবে ব্যবহার করে থাকে। ঠিক সেভাবেই সুন্দরী, সুশ্রী মহিলাদেরকে বলা হয়ে থাকে 'দেখতে যেন ঠিক দেবীর মতন'। এটাও হিন্দু মুসলিম সকলেই সমভাবে বলে থাকে। মাগন ঠাকুরের মাতা দেখতে খুবই সুন্দর ও সুশ্রী হবার কারণেই হয়তো কবি তাঁকে শুধু দেবী নয় বরং মহাদেবী বলে উল্লেখ করেছেন।

যা হোক, প্রভুর কাছে অনেকবার প্রার্থনা মেগে তাঁরা সন্তান পেয়েছিলেন বলেই তার নাম মাগন ঠাকুর রাখা হয়েছে। কবি আলাওল ঠিক একই পদ্ধতিতে পদ্মাবতী কাব্যেও কোরেশী মাগনের নামকরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন -

রাজসৈন্য মন্ত্রী ছিল বড়হি ঠাকুর / প্রভূত মাগিআ পাইল কুলদীপ সূর ॥
প্রভুস্থানে মাগি পাইল পরার্থনা করি / তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম ধরি ॥[১৪২]

ডক্টর সুকুমার সেন মাগন নামের কারণে যদি তাঁকে অমুসলিম বলে থাকেন তবে এ ধরনের সমজাতীয় নাম সম্বলিত সকল লোকেই তবে অমুসলিম হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। বিশেষ করে প্রাচীন পুঁথিসমূহের লেখক কিংবা পুঁথিতে মুসলিম চরিত্রের যেসব নাম মেলে যেমন শেখ সুরুজ, শেখ কালা, শেখ কালাচাঁদ, শেখ গোপাল, ধীর, মঙ্গল, হাঁচি, সিরু (শ্রীরূপ) সোনা, উধা, বুধা, সরু (স্বরূপ), শেখ বাবু, শেখ পাচু প্রভৃতি নাম চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্থানেই পাওয়া যায়। সেইসাথে মাগন চৌধুরী, টোনা ঠাকুর, গাভুর ঠাকুর, আলী হোসেন ঠাকুর, আজিজ খাঁ রোঁয়াঝা, হাবত রোঁয়াঝা, জি ঠাকুর, নানু রাজা, শেখ পরান, শেখ চাঁদ, আউল চাঁদ প্রভৃতি নামও পুরোনো পুঁথিতেই পাওয়া যায়।[১৪৩] তাই বলে তো তারা অমুসলিম হতে পারেন না। এমনকি আধুনিক যুগের অনেক লোক কিংবা কবি সাহিত্যিক এ ধরনের নাম ব্যবহার করে থাকেন, যেমন - আউয়াল ঠাকুর, টোকন ঠাকুর, মন্টু, পল্টু, পল্টন, মিল্টন প্রভৃতি। তাই বলে তো তাদের অন্তত অমুসলিম বলে আখ্যা দেয়া ঠিক হবে না। বিশেষ করে দক্ষিণ চট্টগ্রাম (কর্ণফুলীর দক্ষিণ পূর্ব তীর থেকে) দীর্ঘকাল ব্যাপী আরাকানের শাসনাধীনে থাকার কারণে তাদের নামের সংস্কৃতি খানিকটা একীভূত হয়েছে। এ সব অঞ্চলে রোঁয়াঝা, খোঁয়াঝা, সাঁঝা, সাধা, ছুয়ান, ঠাকুর প্রভৃতি খেতাবধারী বা পদবীসম্পন্ন মানুষের বংশধর অদ্যাবধি পাওয়া যায়। সাধারণত এগুলো ছিল আরাকানরাজা কর্তৃক প্রদত্ত খেতাব কিংবা প্রশাসকের পদবি। আজও ঐ অঞ্চলের বহু পরিবার ঐ সব খেতাব এবং পদধারীর বংশধররূপে সমাজে অভিজাত বলে স্বীকৃত।

অতএব, কবির 'সান্ত্বাইল কোরেশী মাগন গুণনাম' চরণ দ্বারা ইংগিত পাওয়া যায় যে, 'মাগন তার ধর্ম সংস্কৃতি সম্পৃক্ত পোষাকী নাম নয় বরং পিতা মাতার দেয়া আদুরে ডাক নাম অথবা তাদের প্রার্থনা কবুলের ইঙ্গিতবাহী তাৎপর্যপূর্ণ ঘরোয়া আটপৌঢ়ে নাম। সুতরাং বলা যায়, কোরেশী মাগন ঠাকুরের নামের শেষে ঠাকুর উপাধি ছিল আরাকানরাজ প্রদত্ত এবং তিনি ছিলেন মুসলমান।

কবি আলাওল কোরেশী মাগন ঠাকুরের নামের প্রসঙ্গ নিয়ে আরও একটি ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন। 'মান্য' শব্দের 'ম' 'গুরু' শব্দের 'গ' নক্ষত্রের 'ন' এ তিন অক্ষরের সম্মিলনেই 'মাগন' নাম হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[১৪৪] অর্থাৎ তিনি হবেন মান্যবর, সৌভাগ্যবান গুরু এবং নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল ও উন্নত মানুষ' এ আশা নিয়েই তার আব্বা আম্মা মহা উৎসব করে নাম রাখেন 'মাগন'। কবি আলাওল আরও মন্তব্য করেন যে, 'মহাগণ' অর্থাৎ অনেক মহা ব্যক্তির সমন্বয় মহাগণ> মাগন; কিংবা আল্লাহর প্রেমে মগন (মগ্ন) থাকলেই কেবল কোন অসাধ্য সাধন হয়, প্রভুর কাছাকাছি যাওয়া যায়। সেই 'মগন' শব্দের 'ম' বর্ণে একটি আ-কার দিয়ে মাগন রাখা হয়েছে।[১৪৫] কবি আলাওলের এ ধরনের বক্তব্যে অতিরঞ্জিত ও কল্পনা থাকলেও একটি বিষয়ের ধারণা পাওয়া যায় যে, মাগনের পিতা মাতা আল্লাহর দরবারে অতীব মগন থেকে আরাধনা

করে তাঁকে পেয়েছিলেন। সুতরাং মাগন নাম 'হিন্দুয়ানী' কিংবা অমুসলিম সংস্কৃতি ধারণ করছে না।

রাজনৈতিক জীবনে কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত সফল ব্যক্তি। আরাকানের রাজা নরপদিগ্যীর শাসনামলে মন্ত্রিত্বের সফল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যেমন তাঁর নাবালিকা কন্যার অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলেন তেমনি নরপদিগ্যীর মৃত্যুর পরও সে দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়ে আবার দুজন রাজার আমলে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিশেষ করে নরপদিগ্যীর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র থদো মিন্তার (সদউ মঙদার) এর সাথে নরপদিগ্যীর কন্যাকে বিয়ে দিয়ে তাঁকে আরাকানের সিংহাসনে বসান। সফলভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য রাজকন্যা আরাকানের প্রশাসনে মাগন ঠাকুরকে মূখ্যসচিবের পদে অধিষ্ঠিত করেন।[১৪৬] রাজা থদো মিন্তার শাসনামলে (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রি.) দীর্ঘ সাত বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই আরাকান প্রশাসনের মুখ্যসচীব (মুখ্যমন্ত্রী) হিসেবে দায়িত্ব পালনের কারণে আরাকানের প্রশাসন ও জনসাধারণের মধ্যে তেমন কোন অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়নি। বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চল ছিল পুরোপুরি বিদ্রোহ-বিক্ষোভমুক্ত।

রাজা থদো মিন্তার ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করলে আরাকানে পুনরায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়। থদো'র শিশুপুত্র সান্দা থু ধম্মাও তখন নাবালক। বিদ্রোহ ও বিক্ষোভমুখর চট্টগ্রামে আরাকানের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনার নিমিত্তে মাগন ঠাকুর প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে রাজপুত্র সান্দা থু ধম্মাকে আরাকানের সিংহাসনে বসিয়ে রানীকে তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত করে নিজে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় মূলত তিনিই প্রশাসনের মূল ব্যক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[১৪৭]

কোরেশী মাগন ঠাকুর একাধারে বিশ বছর (১৬৩৮-১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ) আরাকান প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে নিষ্ঠার সাথে রাজকীয় দায়িত্ব পালন করেছেন, যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি সম্পদে, সম্মানে, জ্ঞান চর্চা ও খ্যাতিতে আরাকানের সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন।[১৪৮] তিনি নিজে বহু ভাষাবিদ ছিলেন। আরবি, ফারসি, মগি, হিন্দুয়ানিসহ বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞান চর্চা করতেন তিনি। কবি আলাওলের ভাষায় -

> কর্তার সৃজিন রূপ কহিতে অনন্ত / তাহাতে করিল বিধি নানা গুণবন্ত ॥
> আরবী ফারসী আর মগী হিন্দুয়ানী / নানা গুণে পারগ সঙ্গীত জ্ঞাতাগুণী ॥
> কাব্য অলংকার জ্ঞাতা হস্তক নাটিকা / শিল্পগুণ মহৌষধি নানাবিধ শিক্ষা ॥[১৪৯]

কোরেশী মাগন ঠাকুর শুধুমাত্র আরাকানরাজের একজন অমাত্য প্রধানই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, কলা রসিক, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নাট্য-গীতিকা, শৈল্পিক মাধুর্যের বোদ্ধা এমনকি মহৌষধি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর প্রশাসনিক কাজের কৃতিত্বের পাশাপাশি একটি বড় কৃতিত্ব ছিল

'চন্দ্রাবতী' কাব্যের রচনা। যদিও কোন গবেষক কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর এবং মাগন ঠাকুরকে আলাদা ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন।[১৫০] তদুপরি নির্দিধায় তাঁকে কবি ও প্রশাসক তথা এক ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত। কেননা আরাকানের প্রধান অমাত্য কোরেশী মাগন ঠাকুর একজন মহাপণ্ডিত ও কাব্যরস পিপাসু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে শুধু নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তাই নয়, অধিকন্তু তিনি নানা শিল্প বিষয়েও বিশারদ ছিলেন। যিনি এতগুলো গুণের অধিকারী ছিলেন যে তিনি কবিত্বশক্তি সম্পন্ন লোক ছিলেন না তা বলা যায় না। যিনি কাব্য ও অলঙ্কার জানতেন, যার হাতে নাটক নাটিকা সুশোভিত হয় তাঁর পক্ষে কবি না হওয়ার চেয়ে কবি হওয়াই যুক্তিযুক্ত।[১৫১] কোন কোন গবেষক বলেন, মন্ত্রী মাগন বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন এবং বিদোৎসাহীও ছিলেন সন্দেহ নেই, তবে তিনি নিজে কাব্য রচনা করার কথা তার কাব্যে কোথাও উল্লেখ করেননি। তাছাড়া রাজ্যের সব দায়িত্ব পালন করে কাব্য চর্চা করা সম্ভব নয়।[১৫২] গবেষকের যুক্তির উত্তরে বলা যায় যে, কবির 'চন্দ্রাবতী' কাব্যখানা পূর্ণাঙ্গ নয় খণ্ডিত। তাছাড়া প্রশস্তি অংশ আজো উদ্ধার হয়নি। হয়তো তিনি সেখানে নিজের নাম পরিচয় উল্লেখ করেছেন। যেহেতু উক্ত অংশ পাওয়া যায়নি তাই সে যুক্তি না দেয়াই ভাল। তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, অন্যান্য সকল কবি নিজকে দীনহীন, অধীন প্রভৃতি শব্দ স্বীয় নাম পরিচয় পর্বে উল্লেখ করেছেন পক্ষান্তরে মাগন তার নিজস্ব ভনিতায় কখনো এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেননি; যা একজন মন্ত্রীর পক্ষেই মানানসই। তাছাড়া রাজ্যের দায়িত্ব পালন করে সাহিত্য চর্চা হয় না এমনটি বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারী চালিয়েও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বকবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। সুতরাং প্রশাসনিক কাজে যুক্ত থেকেও চন্দ্রাবতী কাব্য রচনা করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

কোরেশী মাগনের ভীকন নামে আরও এক ভাই ছিলেন। তিনিও রাজ কর্মচারী হিসেবে আরাকানে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাগন ও তার ভাই ভিকনের মৃত্যুর পর মাগনের পুত্র সুজাউল ইসলাম ভিকনের পুত্র মুজাহিদ কোন কারণে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মগ রাজকর্মচারীকে হত্যা করলে রাজরোষে নিপতিত হন। সেই প্রেক্ষিতে রাজরোষ এড়ানোর জন্য তাঁরা চট্টগ্রামে পালিয়ে আসেন এবং তাঁদেরই বংশধর এখন চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত নোয়াজিশপুরে (ফতেহনগর) বসবাস করছে।[১৫৩] মাগনের ভাই ভিকনও ছিলেন কবি। তাঁর রচিত 'রাধাকৃষ্ণ' পদাবলী পাওয়া গেছে। এঁদেরই অধস্তন বংশধর রইসউদ্দিনের বাসভবন থেকেই ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে আদ্যন্ত খণ্ডিত চন্দ্রাবতী পুঁথিটি ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর বন্ধু মারফত সংগ্রহ করেন। এ বংশের আবুল হোসেন চৌধুরীর জন্যই সুজাউদ্দিন চৌধুরী ঐ পুঁথির প্রতিলিপি তৈরী করেছিলেন।[১৫৪] উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, মাগনের ভাই ভিকনও কবি ছিলেন এবং তাঁদেরই অধস্তন বংশধর থেকেই চন্দ্রাবতী কাব্যের অংশ বিশেষ পাওয়া গেছে। সেইসাথে মাগনের পিতা, ভাই ও নিজেও আরাকান প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাদের

অধস্তন পুরুষ রাজরোষে আরাকান থেকে পালিয়ে চট্টগ্রামে এসেছেন। অতএব কবি মাগন ঠাকুর এবং অমাত্য মাগন ঠাকুর এক ও অভিন্ন।

কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন বিনয়ী, উদার, ও মহৎ ব্যক্তি। তাঁর বদান্যতা, বিদ্যোৎসাহীতা এবং উদারতায় দরিদ্রেরা সাহায্য পেত, সহায়হীন আশ্রয় পেত এমনকি রাজরোষে নিপীড়িত নির্দোষ ব্যক্তিগণ উদ্ধার লাভ করত।[১৫৫] বিশেষ করে বাংলা থেকে অপহৃত মুসলমানদেরকে তিনি আরাকানী মুসলিম সৈনিকদের হাতে সমর্পণ করে তুলনামূলক কম কষ্টসম্পন্ন অঞ্চলে পুনর্বাসন করতেন।[১৫৬] মৌলিক মানবীয় গুণসম্পন্ন মাগন ঠাকুর তাদের দ্বারা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা তৈরীতে সহায়তার মাধ্যমে আরাকানে ইসলামের প্রসার ও প্রভাব বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক হযরত শাহ মাসুম এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন।[১৫৭] তাঁর অনুপ্রেরণা থেকেই তিনি আরাকানের আলেম, বিদ্বান ও ইসলামের সেবকদেরকে এ কাজে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।[১৫৮] মহাকবি আলাওলও তারই পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে 'পদ্মাবতী ও সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল' কাব্যের অংশবিশেষ রচনা করেন।

২.২.৫ সোলায়মান

আরাকান অমাত্য সভার অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন শ্রীমন্ত সোলায়মান। আরাকানরাজ সান্দা থু ধম্মার শাসনামলে (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রি.) আরাকানের মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুর ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তিনি আরাকান প্রশাসনের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১৫৯] মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় কবি আলাওল কর্তৃক রচিত কাজী দৌলতের অসমাপ্ত কাব্য 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের সমাপ্তাংশ ও তোহফা কাব্য রচনার সময়কাল বিবেচনা করে অনুমান করা যায় যে, সোলায়মান কোরেশী মাগন ঠাকুরের ইন্তেকালের পর ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু মুহাম্মদ এনামুল হক সোলায়মানকে শুধুমাত্র অর্থমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করেননি। তাঁর মতে কোরেশী মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর সোলায়মান নামক জনৈক মুসলমান ঠাকুরের শূন্যপদ পূর্ণ করেন অর্থাৎ আরাকানের রাজা সান্দা থু ধম্মার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তবে দেশের রাজকোষ এবং সাধারণ শাসনের ভারও এ মুসলমান প্রধানমন্ত্রীর উপরই ন্যস্ত ছিল।[১৬০]

মন্ত্রী সোলায়মানের আদি নিবাস সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। চট্টগ্রামের স্থানীয় ইতিহাস গবেষক আবদুল হক চৌধুরী তাঁকে অনুমান ভিত্তিতে চট্টগ্রামের লোক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৬১] যেহেতু আরাকান রাজসভার অধিকাংশ মুসলিম অমাত্য ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের সেই ধারণা থেকেই তিনি তাঁকে চট্টগ্রামের অধিবাসী হিসেবে অনুমান করেছেন। কিন্তু কবি আলাওলের কথা -

'শ্রীমন্ত সোলেমান মহাগুণবন্ত / পরদেশী গুণি পাইলে সাদরে পোষন্ত ॥
মহা হরষিত হৈল পাইয়া আম্মারে/ অন্নবস্ত্র দানে নিত্য পোষন্ত আদরে ॥[১৬২]

কবি আলাওলের উপরোদ্ধৃত মন্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, সোলায়মানের আদি নিবাস চট্টগ্রামে নয় বরং আরাকানে। কেননা তিনি পরদেশী লোক পেলে তাদেরকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সাদরে গ্রহণপূর্বক লালন পালনের ব্যবস্থা করতেন। সেই সূত্রেই আলাওলকে পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন এবং তাঁকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আরাকান অমাত্যসভায় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চার পথ সুগম করেছিলেন। যেহেতু আলাওল আরাকানের অধিবাসী নন সেহেতু তিনি তাঁর কাছে পরদেশী। যদি সোলায়মান আরাকানের অধিবাসী না হতেন তবে অবশ্যই তিনি আলাওলকে স্বদেশীই মনে করতেন। সুতরাং বলা যায় যে, মহামন্ত্রী সোলায়মান চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন না বরং তিনি আরাকানেরই লোক। তবে হতে পারে যে তাঁর কোন পূর্বপুরুষ চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

মন্ত্রী হিসেবে সোলায়মান যেমন খ্যাতিমান ছিলেন তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞানেও পিছিয়ে ছিলেন না। তিনি পরদেশী কোন বিদ্বান, ইসলাম প্রচারক, আলিম, কবি সাহিত্যিক মুসলমানদেরকে যেভাবে আশ্রয় দিয়ে, পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আরাকান অঞ্চলে ইসলামের প্রচার প্রসারে ভূমিকা পালন করেছিলেন তেমনি নিজেও জ্ঞানের চর্চা করে মুসলমানদের জ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করেছিলেন। আরাকানের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ, ইসলামি শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে অর্থনৈতিক সহযোগিতাসহ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। কবি আলাওলের ভাষায়-

> 'তান মহা পাত্র শ্রীমন্ত সোলেমান / নানা বিদ্যা শাস্ত্রে গুণে শত অনুপাম ॥
> পরম সুন্দরও অঙ্গ অনঙ্গ নিন্দিত / সর্বদেশে দানধর্ম তান প্রতিষ্ঠিত ॥[১৬৩]

আলাওল আরও উল্লেখ করেন,

> তানপাত্র দিব্যজ্ঞান/ শ্রীযুক্ত সোলায়মান
> শুভক্ষণে সৃজিলা বিধাতা ॥
> নানা শাস্ত্র অবধান/ দৌত্য-সত্য-শক্তিমান
> গুণবন্ত গুণিগণ জ্ঞাতা ॥[১৬৪]

মহাকবি আলাওল মহামন্ত্রী সোলায়মানের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত দুটি কাব্যেই বিভিন্ন শাস্ত্রের পণ্ডিত হিসেবে তাঁকে উল্লেখ করেছেন। তার বিদ্যা-জ্ঞান দেশের জ্ঞানী গুণি পণ্ডিতগণও স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ মহান জ্ঞানী মুসলিম পণ্ডিত ও প্রধানমন্ত্রী জ্ঞানের কদর জানতেন বলেই আলাওলকে সাহিত্য রচনায় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। তিনি যেমন পরদেশী জ্ঞানী-গুণির সমাদর করতেন তেমনী স্বীয় বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বদেশী আরাকানী মুসলমানদেরও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইসলামের ধর্মীয় অনুশাসনসমূহও সঠিকভাবে পালন করতেন। কবি আলাওলের ভাষায়

> শাস্ত্রের বিহিত আচারেন্ত ধর্মকর্ম / অপ্রকাশে বুঝেন্ত মুনির মন মর্ম ॥[১৬৫]

কিংবা অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেন -

ইষ্টমিত্র বন্ধুজন / জ্ঞাতি পালে অনুক্ষণ
পরদেশী সন্তোষন্ত নিত ॥
মহিমা তাহান যথ / আমি বা কহিব কথ
শান্তি মূর্তি উদার চরিত ॥[১৬৬]

উপরোদ্ধৃত কবিতায় লক্ষ্যণীয় যে, মন্ত্রী সোলায়মান উদার ও পরোপকারী অমাত্য ছিলেন। তিনি জনতার সমস্যা সহজেই অনুধাবন করে সমাধানের জন্য তৎপর থাকতেন। ধর্মীয় বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রেও তিনি যত্নবান ছিলেন।[১৬৭] শাহ মাসুম (রহ.) এর ঈমানী চেতনার সাথে সম্পৃক্ত রেখে নিজেকে সত্যবাদী ও সত্যপিয়াসী করে গড়ে তুলেছিলেন। কবির ভাষায় -

শ্রীযুক্ত ছোলেমান সত্যে রত্নাকর / শুনিতে সতীর কথা হরিষ অন্তর ॥[১৬৮]

সত্যিকার অর্থে আরাকান রাজসভার মহামত্য সোলায়মান আরাকানে ইসলামের প্রসার ও মুসলিম সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনন্য নজীর। তিনি ইসলামের প্রসার ঘটানোর জন্য দেশী বিদেশী আলিমগণকে সম্মান করতেন। বৌদ্ধ শাসিত প্রশাসনে সম্পৃক্ত থেকে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে রাজ্যের শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন।

২.২.৬ অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ

আরাকানের সান্দু থু ধম্মার শাসনামলের আরও কয়েকজন অমাত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সৈয়দ মুহাম্মদ খান, নবরাজ মজলিশ, সৈয়দ মুসা প্রমুখ প্রধান। এদের মধ্যে সৈয়দ মুহাম্মদ খান আরাকানের সমরমন্ত্রী বা লস্কর উজির ছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় কবি আলাওল 'সপ্তপয়কর' কাব্য রচনা করেন। সপ্তপয়কর কাব্যের রচনার কাল অনুসন্ধান করলে সাধারণত ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি বলে জানা যায়।[১৬৯] কেননা বাংলার সুবেদার শাহজাদা শুজা ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দেই আরাকানে পালিয়ে যান এবং ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে আরাকানের রাজার হাতে নিহত হন। কাব্যটি সে সময়েই লেখা। সুতরাং সৈয়দ মুহাম্মদ আরাকানের রাজা সান্দা থু ধম্মার শাসনামলের ষাটের দশকে লস্কর উজিরের দায়িত্ব পালন করেছেন। কবি আলাওল তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন -

হেন মহারাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ / তান মুখ্য সৈন্য মন্ত্রী সৈয়দ মুহাম্মদ ॥
অঙ্গ দুর্বাদল শ্যাম মুখ পূর্ণ শশী / অমিয়া মিশ্রিত বাক্য মৃদুমন্দ হাসি ॥
নানা শাস্ত্র পরাগ বিদ্বান বিদগ্ধ / আরবী ফারসী আর হিন্দুয়ানী মগধ ॥[১৭০]

সৈয়দ মুহাম্মদ খানের আদি নিবাস সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন গবেষক তাঁকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭১] কবির ভনিতাতেও এ ব্যাপারে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

সৈয়দ মুসা ছিলেন সান্দা থু ধম্মার অন্যতম প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েই মূলত কবি আলাওল সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামালের অবশিষ্টাংশ রচনা করেন।[১৭২] অত্র কাব্যে শাহজাদা শ

াহ সুজার আরাকান আগমন ও আরাকানরাজ কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিবরণে অনুমিত হয় যে, এ কাব্যটি ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে রচিত। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আরাকানের প্রভাবশালী মুসলিম প্রধানমন্ত্রী কোরেশী মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর তিনি এ পদে স্থলাভিষিক্ত হন। কেননা কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন সৈয়দ মুসার বন্ধুসজন। কবি আলাওলের ভাষায় -

একদিন ডাকিয়া যে আপন আলএ / বহুল করিয়া কহিলা যে মহাশএ ॥
পুস্তকর আজ্ঞাকারী শ্রীযুক্ত মাগন / আছিল তোমর শিষ্য মোর বন্ধু জন ॥[১৭৩]

সৈয়দ মুসার আদি নিবাস ছিল সিলেট হবিগঞ্জের তরফ পরগনার লস্করপুর গ্রামে। তিনি সিলেট বিজয়ী সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দিনের বংশধর।[১৭৪] তবে যেহেতু তিনি কোরেশী মাগন ঠাকুরের বন্ধুসজন ছিলেন সেহেতু অনুমান করা যায় যে, তার পিতৃপুরুষ আগেই আরাকানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আরাকান প্রশাসনের কোন দায়িত্ব পালন করেছেন বলে অনুমান করলেও ভুল হবে না।

আরাকানের রাজা সান্দা থু ধম্মার শাসনামলের আর একজন প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নবরাজ মজলিশ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে কবি আলাওল 'সিকান্দর নামা' কাব্যটি ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ মুসার মৃত্যুর পর নবরাজ মজলিশ আরাকান প্রশাসনে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কবি আলাওলের ভাষায়

হেন ধর্মশীল রাজা অতুল মহত্ত / মজলিশ নবরাজ তান মহামাত্য ॥
রোসাঙ্গ দেশে আছন্ত যত মুছলমান / মহাপাত্র মজলিশ সবার প্রধান ॥[১৭৫]

নবরাজ মজলিশের আদি নিবাস সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আবদুল হক চৌধুরী তাকে চট্টগ্রামের অধিবাসী হিসেবে অনুমান করেছেন।[১৭৬] কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারেন নি। যা হোক, নবরাজ মজলিশ একজন ইসলামের একনিষ্ট সেবক হিসেবে কাজ করেছেন। মুসলমানগণ তাঁকে দ্বীনের উজ্জ্বল প্রদীপ মনে করত। তিনি মুসলমানদের ইবাদতের জন্য মসজিদ, সরাইখানা, পুকুর প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু তথ্যের অভাবে তাঁর নির্মিত স্থাপনাসমূহ সম্পর্কে কোন বিবরণ দেয়া যায়নি। এ সম্পর্কে কবি আলাওল উল্লেখ করেন -

আনন্দের স্থল মাত্র তোম্মার সমীপ / মুসলমানি দ্বীনে তুম্মি উজ্জ্বল প্রদীপ ॥
মসজিদ পুস্কর্নী আদি কৈলা পূন্যকাম / স্বদেশ বিদেশ পূর্ণ তোম্মা কৃতিনাম ॥[১৭৭]

নবরাজ মজলিশ যেমন খাঁটি মুসলমান, ইসলামের সেবক, ইসলামি অনুশাসনের অনুরাগী ছিলেন তেমনি তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তিনি লেখাপড়া ও গ্রন্থ রচনা করার ক্ষেত্রে যে

ধরনের মন্তব্য করে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন - তা আরাকানের ইতিহাসে মুসলমানদের গৌরবের অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কবি আলাওলের ভাষায় -

মসজিদ পুস্কর্নী নাম নিজ দেশে রহে / গ্রন্থ কথা যথা তথা উক্তিভাবে কহে ॥
গ্রন্থ পড়ি সকলের তুষ্ট হয় মন / নাম স্মরি মহিমা কহএ সর্বজন ॥[১৭৮]

বিদ্যোৎসাহী নবরাজ মজলিশের এরূপ কথার ভিত্তিতেই আলাওল সিকান্দার নামা কাব্যটি রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, আরাকান প্রশাসনের ১৪৩০-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের বিশাল সময়ের মধ্যে মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে অল্প সংখ্যক মুসলিম অমাত্যের কর্মকাণ্ড ইতিহাসে পাওয়া গেছে। যারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, সেই কাব্যে কেবল তারই প্রশস্তি এসেছে। এ প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, মহাকবি আলাওলের সুবাদে সপ্তদশ শতাব্দীর কিছু সংখ্যক মুসলিম অমাত্যের অনুসন্ধান মিলেছে। এমনকি শুধুমাত্র সান্দা থু ধম্মার ৩২ বছরের শাসনামলে (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রি.) পাঁচজন অমাত্যের বিবরণ পাওয়া গেছে, যারা কবি সাহিত্যিকগণকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সাহিত্য চর্চা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাহলে যারা সাহিত্য চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেননি এমন সংখ্যা আরো অনেক হবে।

২.৩ বিচারব্যবস্থায় ইসলাম ও মুসলিম কাজী

নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহ কর্তৃক ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে আরাকান পুনরুদ্ধার করার পর আরাকানে মুসলিম রীতিতে বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এবং মুসলমান বিচারক (কাজি) নিয়োগের মাধ্যমে আরাকানের বিচার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু হয়।[১৭৯] কবি দৌলত কাজী আরাকানের প্রখ্যাত বিচারকদের অধস্তন পুরুষ। শুধু তাই নয় তিনি নিজে একজন কবি এবং আরাকানের বিচারকও বটে।[১৮০] অনুরূপভাবে কাজী সৈয়দ সউদ শাহও আরাকানের কাজী ছিলেন। কবি আলাওলের ভাষায় -

সৈয়দ মসউদ শাহা রোসাঙ্গের কাজী / জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজি ॥
দয়াল চরিত পীর অতুল মহত / কৃপা করে দিলেক কাদেরী খিলাফত ॥[১৮১]

উল্লেখ্য, সিকান্দর নামার সম্পাদক আহমদ শরীফ কাব্যে ব্যবহৃত প্রথম চরণে, মসউদ শব্দটি ছৌদ, শহীদ শাহা এবং মসউদ তিনটি নামে উচ্চারণ করেছেন। সে যাই হোক, কবি কবিতায় কাজী সৈয়দ মসউদ শাহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরেছেন। এ কবিতা থেকে বুঝা যায় যে, কাজীগণ শুধু বিচারকই ছিলেন না বরং ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রচারক অলীয়ে কামেলও ছিলেন। এছাড়াও পরবর্তীকালে শুজা কাজী, গাওয়া কাজী, নালা কাজী, কাজী আবদুল করিম, কাজী মুহাম্মদ হোসেন, কাজী ওসমান, কাজী আবদুল জব্বার, কাজী আবদুল গফুর, কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ, কাজী নুর মোহাম্মদ, কাজী রওশন আলী প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। উল্লেখিত কাজীদের মধ্যে সুজা কাজী সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি আরাকানের ম্রাউক-উ-শাসনের শেষ পর্বে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের বিচারক ছিলেন। এ সময় বোদাপায়া কর্তৃক আরাকান আক্রান্ত হলে তিনি তার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তাঁর সৈনিকদের পথপ্রদর্শনে সহায়তা

করেন। এতে আরাকান বিজিত হলেও তাঁকে দক্ষিণ আরাকানের আচিরাং (বিচারক বা কাজী) হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কিছু দিন তিনি রাম্রীতে বসবাস করলেও পরে ক্যাইমে তার সদর দফতর প্রতিষ্ঠিত হয়[১৮২]। আরাকানের সাদা পাড়ায় শুজা কাজীর পাকা মসজিদ ও পাকা ঘাট সম্বলিত দিঘীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বর্তমান আছে। মসজিদের নিকটে তার কবরও রয়েছে।

বাংলায় বিশেষত চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হবার সমসাময়িক কালেই আরাকানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে। সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধানের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে নরমিখলা বা সোলায়মান শাহের আরাকান পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে আরাকানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের প্রভাব বিস্তার শুরু হয়। রাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদ, বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ইসলামের প্রসার ও প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট দুইশত পনের বছর ধরে আরাকানী শাসকগণ মুসলিম নাম ব্যবহার করেছেন। ইসলামি আদর্শকে তারা পছন্দ করতেন এবং এর প্রসার ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রচারক, মুসলিম নাবিক, বণিক এমনকি আরাকান প্রশাসনে কর্তব্যরত মুসলিম অমাত্যদেরকেও সহযোগিতা করেছেন। তবে চট্টগ্রাম থেকে আরাকানে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটলেও চট্টগ্রামের দখল নিয়ে বাংলার মুসলিম শাসকদের সাথে সংঘটিত বিরোধ ও সংঘর্ষ আরাকানে ইসলামের প্রসার ও প্রভাব বিস্তার খানিকটা ব্যাহত করেছে। তদুপরি বলা যায়, আরাকানের রাজসভায় ইসলামের প্রভাব অমাত্য কেন্দ্রিক হলেও আরাকানী মুসলমানদের জন্য তা ইসলামের অনুশাসন বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল।

পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জি

---

১ বিংশ শতাব্দীর আধুনিক গণতন্ত্রের যুগেও ষাট ও নব্বই দশকের সূচনালগ্ন ছাড়া অদ্যাবধি সেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি Union of Burma স্বাধীনতা লাভের পর কিছু দিন যাবৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ বার্মার সেনাপতি নে উইন রক্তপাতহীন এক বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রকে হত্যা করেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে মুক্ত বিশ্বের চাপ এবং গণতন্ত্রী ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ তথা অভ্যন্তরীণ আন্দোলনের মুখে স মং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন এবং বার্মায় ৩০ বছর পর এ সাধারণ নির্বাচনে গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী অং সান সুকির National League for Democracy (NLD) এর প্রার্থীরা ৯০% আসনে বিজয়ী হন। রোহিঙ্গা মুসলমানরা রুদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুকির NLD এর তালা মার্কায় একচেটিয়া ভোট দেয়। আরাকানের ২৬টি নির্বাচনী এলাকার মধ্যে ৫টিতে মুসলমানগণ National Democratic League for Human Rights (NDLHR) এর ব্যানারে ব্যাপক ভোটে বিজয়ী হন। সামরিক এলিটদের পছন্দসই প্রার্থীরা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে নতুন ফন্দি ফিকির এঁটে নানা টালবাহানা করে স মং ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বরং সুকিকে গৃহবন্দী করে রাখে। (দ্র: *SLORC Announcement*, No. 1/90, July 27, 1990; *Human Rights Watch/Asia*, Vol. 8, No.

9(c), Sept., 1996, p. 11.; মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, পৃ. ৬৬-৬৭; *দৈনিক বাংলা*, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২; *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২।)

২ উল্লেখ্য, প্রাচীনকালে বার্মার একক কোন অস্তিত্ব ছিলনা। সে সময় থেটন (Thaton) পেগু (Pagu) পগাঁ (Pagan) আভা (Ava) প্রোম (Prom) প্রভৃতি পাঁচটি রাজ্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে আনওয়ারাথা কর্তৃক ১০৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পগাঁ রাজ্য মাত্র পনের বছরের মধ্যে বিশাল শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। [আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭]

৩ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭।

৪ মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, "ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মুসলমান" *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) পৃ.২৩৬; উল্লেখ্য, উক্ত গৃহশিক্ষকের নাম পাওয়া যায়না।

৫ আনওয়ারাথা'র পুত্র সউলুর দুধমা ছিলেন আবদুর রহমান খানের মা। সেইসাথে তাঁর পিতা ছিলেন সউলুর গৃহশিক্ষক। দুধ ভাই হিসেবে বাল্যকাল থেকেই সউলু ও আবদুর রহমান খানের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। বর্মী ভাষায় তাকে Yamankan বলা হয়েছে। [Harvey, *History of Burma, op. cit.* p. 30]

৬ Harvey, *History of Burma, op. cit.* p. 34-38.

৭ Harvey, *History of Burma, op. cit.* p. 139-40; মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, (চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫) পৃ. ৫২।

৮ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- *British-Burma Gazetteer, Akyab district,* Vol. A. 1917, p. 64.

৯ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪।

১০ মুহম্মদ সিদ্দিক খান, *ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মুসলমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১।*

১১ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭।

১২ *তদেব*, পৃ. ৫৫-৫৬।

১৩ Bisvesuar Bhattacharya "Bengali influence in Arakan" *Bengal Past & Present, Journal of the Historical Society,* Vol. XXXIII, Part. 1. Serial No. 65, January-March, 1927, p. 141; Harvey, *History of Burma, op. cit.* p. 140.

১৪ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৮) পৃ. ১৯।

১৫ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মোগল আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৮; সৈয়দ আহমদুল হক, "বাংলার সামন্ত রাজ্য হিসাবে আরাকানের একশত বৎসর" মুহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী সম্পাদিত, *আরাকানের মুসলমান : ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (চট্টগ্রাম: আরাকান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ২০০০) পৃ. ১৩৩-১৩৭; M.S. Collis, "Arakans Place in the Civilization of the Bay: A Study of Coinage and Foreign Relations" *Journal of the Burma Research Society,* Vol. XV, Part 1. 1925, p. 37-38.

১৬ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, "আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য", *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

১৭ Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* vol. IB, (Ryadh : Imam Muhammad Ebn Soud Islamic University, 1985), p. 865 ; মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।

১৮ ফকিরগাজী, রকমফের, *দৈনিক সংগ্রাম*, ২১ জানুয়ারি, ১৯৯০।

১৯ মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯।

২০ Yunus, *A History of Arakan*, pp. 33-37; Nur Kamal, "Chittagon-Arakan : A Rigion of a People; A Cronicle Studies of Medieval Period", *Annual Magazine 1995-96*, AHS., Chittagon, 1996, p. 84.

২১ *Ibid.*

২২ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

২৩ রাজাদের মুসলমানী নামসহ তালিকা পরিশিষ্টে দেখুন।

২৪ Harvey, *History of Burma*, p. 40.

২৫ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪।

২৬ *তদেব।*

২৭ *তদেব।*

২৮ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস* পুরানা আমল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮।

২৯ মিনখারী'র নাম নিয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে এ. পি. ফেয়ার তাকে Meng Khari ও Ali Khan বলে উল্লেখ করেছেন। [দ্রষ্টব্য: A.P. Pheyere, *History of Burma, op. cit.* p. 78]

৩০ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১।

৩১ মুহম্মদ ইউনুছ, *আরাকানের স্বাধীন ঐতিহ্য ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রাম*, (আরাকান: প্রচার ও তথ্য বিভাগ, আরএসও, ১৯৮৯) পৃ. ৪।

৩২ A.P. Pheyere, *History of Burma, op. cit.*, p. 78.

৩৩ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭। উল্লেখ্য, তিনি বলেন- থিনখারী রামু পুনরাধিকার করে নেন। চাকমাগণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হয় কিন্তু সুলতান জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ শাহের অযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী শামসুদ্দীন আহমদ (১৪৩২-১৪৩৫) তাদিগকে কোনরূপ সাহায্য না পাঠানোর কারণে তারা পরাজিত হয়ে রামুর কিয়দংশ ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করতে রাজি হয়। রামুর সন্নিহিত রাজারকুল এবং চাকমারকুল গ্রাম এখনও এ সন্ধির সীমারেখা নির্দেশ করছে।

৩৪ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

৩৫ G. E. Harvey, *History of Burma, op. cit.*, p. 140.

৩৬ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪।

৩৭ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৯।

৩৮ G. E. Harvey, *History of Burma, op. cit.*, p. 371; Abdul Karim, *The Rohinga: A Short Account of Their History and Culture, op. cit.*, p. 23.

৩৯ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭।

৪০ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৯।

৪১ ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৯৮৯) পৃ. ২৯।

৪২ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮।

৪৩ J.J. Campos, *History of Portugues in Bengal*, (Patna : Janaki Prakashan, 1974), p. 28.

৪৪ ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯-৩০; আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪২।

৪৫ Abdul Karim, *The Rohinga: A Short Account of Their History and Culture, op. cit.*, p. 923.

৪৬ ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুনের ভাই মির্জা হিন্দল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজ নামে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে দিল্লী অবরোধ করেন। সম্রাট হুমায়ুন এ সংবাদ শুনে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শের শাহের সঙ্গে মোকাবেলা ও স্বীয় ভ্রাতা মির্জা হিন্দলকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার নিমিত্তে গৌড় ছেড়ে দিল্লী অভিমুখে রওনা দেন। এ সময় তার বিশ্বস্ত অমাত্য জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে গৌড়ের

শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন এবং তার সাহায্যার্থে আরও কিছু অমাত্য রেখে যান। [দ্রষ্টব্য: আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৩৭৪]

৪৭ J.J. Campos, *History of Portugues in Bengal, op. cit.*, p. 42.

৪৮ ড. আবদুল করিম, "ইতিহাস" *কক্সরাজারের ইতিহাস*, (কক্সবাজার : কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, ১৯৯০), পৃ. ৩৪।

৪৯ Abdul Karim, 'Was Chittagong Ever a Capital city? A fresh study of some rare coins of Chittagong' *JASB*, Vol. XXXI(I), June 1486, p. 13, note 23; H.N. Wright: *Catalogue of the coins in the India Museum*, Calcutta, Vol. II, p. 180, No. 229.

৫০ আবদুল করিম, 'ইতিহাস' *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

৫১ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।

৫২ Abdul Karim, 'Was Chittagong Ever a Capital city, *op. cit.*, p. 13.

৫৩ *Ibid.*

৫৪ M. Robinson & Shaw, *op. cit.*, p. 52.

৫৫ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৫।

৫৬ *তদেব।*

৫৭ উড়িয়ার রাজা প্রসঙ্গে ড. আবদুল করিম কালী প্রসন্ন সেনের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন উড়িষ্যা হতে আগত কোন ব্যক্তি আরাকান রাজ্যের অধীনে দেয়াঙ নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। রাজা উড়িষ্যাবাসী ছিলেন বলে তাকে উড়িয়া রাজা বলা হত। কিন্তু কালী প্রসন্ন সেন উড়িষ্যাবাসী ছিলেন বলে তাকে উড়িয়া রাজা নাম দিয়ে দেয়াঙ্গ ও উড়িয়া একস্থান বলে চিহ্নিত করলেও জোওয়াও ডি, বেরসের মানচিত্রে কক্সবাজারের সমুদ্র উপকূলে 'উড়িয়াতন' নামে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা চিহ্নিত আছে। মূলত এ উড়িয়াতনের রাজাকে উড়িয়া রাজা বলা হয়েছে। [দ্রষ্টব্য: আবদুল করিম, 'ইতিহাস' *কক্স বাজারের ইতিহাস, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮)।

৫৮ আবদুল করিম, 'ইতিহাস' *কক্সবাজারের ইতিহাস, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

৫৯ *তদেব*, পৃ. ৩৭।

৬০ *তদেব।*

৬১ *তদেব।*

৬২ *তদেব।*

৬৩ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭

৬৪ *তদেব।*

৬৫ এন.এম. হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস,পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

৬৬ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৯।

৬৭ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭।

৬৮ *তদেব*, পৃ. ১১৯-২০।

৬৯ Hall, "Studies in Duch relation with Arakan," *op. cit.*, pp. 3-5.

৭০ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ., ১১৯-২০।

৭১ *তদেব।*

৭২ *তদেব।*

৭৩ অমৃতবালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫।

৭৪ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭-৫৮।

৭৫ *তদেব;* আহমদ শরীফ *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ৪৯-৫০।

৭৬ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন - মির্জা নাথান - *'বাহারীস্তান-ই-গায়বী'* ২য় খণ্ড, খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৭০-১২১।

৭৭ কেউ কেউ আরাকানরাজ হুসাইন শাহকেই গঞ্জালিশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগ করেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন - আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: মোগল আমল*, ১ম খণ্ড, (রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২), পৃ. ৩৪৭-৪৮।

৭৮ আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মোগল আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪৯-৫০।

৭৯ Harvey, *History of Burma, op. cit.*, p. 189.

৮০ আরাকানের রাজা পরাজিত হয়ে পলায়নকালে জলাবদ্ধতায় আটকে যান। এ সময় সরহদ খান আরাকান রাজাকে কোমল ভাষায় সংবাদ প্রেরণ করলে উত্তরে আরাকানের রাজা সংবাদ পাঠান "আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, আমি আপনাকে পিতৃতুল্য মনে করি।" যতদিন জীবিত থাকব ততদিন নিজেকে বদান্যতা, দয়া ও অনুগ্রহের স্বার্থমূল্যে আপনার কেনাব্যক্তি বলে মনে করব। তাই আপনার পুত্র মনে করে আমাকে মুক্তি দিন। আমি আমার সমস্ত হাতী, রণসম্ভার, ভৃত্য এবং সমস্ত দ্রব্যাদি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। এছাড়া আরও যা কিছু চাইবেন আমি রাখাজ হতে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব এবং আমি আমার সারা জীবনের জন্য বাধ্যতামূলক বিষয় বলে গণ্য করব। আমার জীবন ভিক্ষাকে আল্লাহর দয়া এবং বিশেষ করে আপনার মহান স্বভাব বলে মনে করব।' এভাবে তিনি প্রাণে বেচে যান। [দ্রষ্টব্য: *বাহারীস্তান-ই-গায়বী*, ২য় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪-২৫।]

৮১ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন - আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মোগল আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪২-১৫৬।

৮২ *তদেব*, পৃ. ৪২৮।

৮৩ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৬।

৮৪ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২।

৮৫ *তদেব।*

৮৬ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০-৪১।

৮৭ এ অধ্যায়ে 'আরাকান রাজসভায় মুসলিম অমাত্য' উপশিরোনামের মধ্যে আশরাফ খান সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করা হয়েছে।

৮৮ Harvey, *History of Burma, op. cit.*, p. 145.

৮৯ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২।

৯০ *তদেব*, পৃ. ৮২-৮৩।

৯১ বড় ঠাকুর সম্পর্কে 'আরাকান রাজসভায় মুসলিম অমাত্য, উপ শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৯২ Harvey, *History of Burma, op. cit.*, p. 372.

৯৩ রাজাদের তালিকা পরিশিষ্ট ৪ এ সংযোজিত হয়েছে।

৯৪ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫-৮৬।

৯৫ নসরুল্লাহ খোন্দকার তাঁর শরীয়তনামা কাব্যে নিজ বংশ পরিচয় বর্ণনা করতে উল্লেখ করেন -

ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত / মর্য্যাদার নাহিঅন্ত
নামে হামেদ্দীন মতির মান।
গৌড়দেশ বাঙালা নাম / বসে কহে অনুপাম
শৈবুহ পাল উজীর প্রধান॥
তান পুত্র গুণবান / অস্ত্রে শস্ত্রে পূজ্যমান
জগে ঘোষে বুরহানুদ্দিন নাম
দৈবগতি দেশ ছাড়ি / ইস্টমিত্র সঙ্গে করি
রোসাঙ্গ দেশত কৈল্য ধাম॥
তখনে রোসাঙ্গ দেশে / কিবা আদ্যে কিবা শেষে
অশ্ব অছোয়ার ন আছিল।
হয় গজ বহুসঙ্গে / দেখি তানে নৃপরঙ্গে
লস্কর উজীর তানে কৈল্য॥

ইবরাহীম তান সুত/ রূপে গুণে অদ্ভুত
অশ্বরার কর্মে বিচক্ষণ
সুজাত উদ্দীন নাম / অস্ত্রেশস্ত্রে অনুপাম
নাম ধরে তাহান নন্দন ॥
শেখ রাজা তান পুত্র / প্রভু গতে সুপবিত্র
লোকে ঘোষে ফকির মোড়ল।
তান সুত গুণধাম / কাজী ইসহাক নাম
ছিল দীন তা হন্তে উজ্জ্বল ॥
তাহান ঔরসে কর্ম / সৈয়দানীর গর্ভে জন্ম
শরীফ মনসুর খোন্দকার
নসরুল্লাহ সুত জান / হীনবুদ্ধি পশু জ্ঞান
রচিলেক পঞ্চালী পয়ার।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারস্থ শরীয়তনামার পাণ্ডুলিপিটি ড. আব্দুল হকের পাঠোদ্ধারের সাথে মিল অমিল পরিলক্ষিত হলেও কবির সাত পুরুষের বিবরণের মৌলিক কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। [দ্রষ্টব্যঃ আবদুল করিম সম্পাদিত নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত '*শরীয়তনামা*' (চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫), পৃ. ৮-১০।

৯৬ মুহাম্মদ এনামুল হক, "মুসলিম বাংলা সাহিত্য," *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ৩১৪।

৯৭ *তদেব।*

৯৮ নসরুল্লাহ খোন্দকার '*শরীয়তনামা,*' *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩।

৯৯ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন -S.M. Ali, *History of Chittagong,*(Dhaka : ....1964,) pp. 63-65.

১০০ নসরুল্লাহ খোন্দকার '*শরীয়তনামা,*' *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২২।

১০১ *তদেব*, পৃ. ২৯।

১০২ মযহারুল ইসলাম ও মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত দৌলত কাজী বিরচিত, *সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী*, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯), পৃ. ৫৩।

১০৩ *তদেব*, পৃ. ৫০।

১০৪ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫২।

১০৫ দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।

১০৬ তদেব, উল্লেখ্য কবির ভাষায়:

মহাদেবী অনেক ভাবিল সুনিশ্চিত / রাজপুত্র হন্তে অধিক সুপাত্র পণ্ডিত ॥
নৃপতিহ পুত্রভাবে হরিষে সাদরে / মহামাত্য করিলেন আশরফ খানেরে ॥
সৈন্য সনে অভিষেক করিল রাজন / মহামাত্যে করিলেক রাজ্যের ভাজন ॥
মঙ্গল বিধানে সর্ব কৈলা সমর্পণ / বিবিধ প্রসাদ দিলা কল্যাণ কারণ ॥
ছত্র সমে দিলা সৈন্য পতাকা দুন্দুভি / স্বর্গ অঙ্গরাগ আর বহুমূল্য জমি ॥
দশ হস্তী প্রধান দিলেক বহু ঘোড়া / রাজ খড়্গ সমর্পিলা লস্করী কাপড়া ॥
সেনাপতি হৈলা নানা সৈন্য অধিপতি / আশরাফ নামে শোভা নাম হৈল অতি ॥
শ্রী আশরফ খান লস্কর উজীর / যাহার প্রতাপ বজ্রে চূর্ণ অরি শির॥

১০৭ *তদেব*, পৃ. ৫১।

১০৮ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪।

১০৯ *তদেব*, পৃ. ৫৩।

১১০ *তদেব।*

১১১ *তদেব*, পৃ. ৫৪।

১১২ *তদেব।*

১১৩ অগাস্টিন মনক সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক ছিলেন একজন পর্তুগিজ পাদ্রী। তিনি পর্তুগালের ওপার্টো অঞ্চলে ১৫৯০-১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার পর্তুগিজ উপনিবেশ হুগলীতে প্রেরিত হন। মূলত তাঁর লক্ষ্য ছিল পর্তুগিজদের বাণিজ্যিক মিশনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ও প্রসার করা। অচিরেই হুগলী থেকে দিয়াঙ্গ এবং পরে আরাকানে গমন করেন। আরাকানে তিনি ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেন। বিভিন্ন স্থানে ঘটনা বহুল জীবন কাটিয়ে তিনি ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে নিজ দেশ পর্তুগালে ফিরে যান এবং স্পেনীয় ভাষায় দীর্ঘ ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করেন। [দ্রষ্টব্য: ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৩৯৬, বাংলা), পৃ. ৩৩। বইটি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মি. মরিচ কলিস (Maarice Collis)'The land of the Great Emage' নামে উক্ত বইয়ের কিয়দংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। প্রধানত সেখানে আরাকানের বর্ণনাই স্থান পেয়েছে। পরবর্তীতে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে লে. কর্নেল লুয়ার্ত ও ফাদার হোস্টেন ম্যানরিকের পূর্ণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। ম্যানরিক প্রচণ্ডভাবে ইসলাম বিদ্বেষী হলেও তার ভ্রমণ কাহিনীটি আরাকানের ইতিহাস চর্চায় বিশেষত আরাকান প্রশাসনে মুসলিম প্রভাবের বিবরণের জন্য কিছু সময়ের চাক্ষুস প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যায়।

১১৪ চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের পথ পাড়ি দেয়া বিশেষত বর্ষাকালে খুব দুর্গম ও কষ্টকর হয়ে পড়ে। দিয়াঙ থেকে রামু পর্যন্ত সমুদ্র তীর ঘেঁষে পথ ও ছোট ছোট নদীর মুখ পেরিয়ে রামুতে পৌঁছলে রামুর আরাকানী সামন্ত তাকে বাংলার ঐতিহ্যবাহী 'মসলিন' উপহার দিয়ে স্বাগত জানালে তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন। অতঃপর বর্ষার অবিরাম বর্ষণের মধ্যে নদীর মুখসমূহে দুর্বার স্রোতের মধ্যে ৫৩ জন বন্দী ও ৩০ জন পর্তুগিজ সমেত তারা ম্রোহং যাত্রা করেন। রামুর গভর্নর ম্যানরিক ও পর্তুগিজ ক্যাপ্টেনকে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য দুটি হাতী দেন। তারা হাতীতে চড়ে যাত্রা করলেও বন্দীরা শিকল পরা ও গলায় লোহার কলার বেল্ট পরিহিত অবস্থায় হেঁটে হেঁটে না খাওয়া অবস্থায় ম্রোহং অভিমুখে যায়। পাহাড়ী জঙ্গলী পথে হাঁটু পর্যন্ত কাদা পানি, প্রবল স্রোত এমন ভয়াবহ অবস্থায় না খেয়ে তাদেরকে মাইলের পর মাইল হেঁটে নিয়ে যাওয়া হয়। ম্যানরিক এ বিভৎস অবস্থার মধ্যেও খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা নেবার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন।[দ্রষ্টব্য: ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, পৃ. ৩৭-৩৮]

১১৫ Sebastian Manrique, *Travels of Fray...* 1629-1643: A Translation of the "Itinerario de las Missiones Orientales," Introduction and notes by Lt Col. Eckford Juard, assited by Father H. Hosten, Vol. I., 'Arakan', (Oxford: Hakluyt Society, 1927), pp. 351-352.

১১৬ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০।

১১৭ Sebastian Manrique, *op. cit.,* p. 373.

১১৮ কবির ভাষায় -

ধর্মপাত্র শ্রীযুক্ত আশরফ খান / হানাফী মোজাব ধরে চিস্তি খান্দান
ইমাম রতন পালে প্রাণের ভিতর / ইসলামের অলংকার শোভে কলেবর।
[দ্রষ্টব্য: দৌলত কাজীর *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।]

১১৯ কবি দৌলত কাজী স্বীয় কাব্যে উল্লেখ করেন -

সৈয়দ কাজী শেখ মোল্লা আলীম ফকির / পুজেন্ত সে সবে যেন আপনার শরীর ॥
বিদেশী আরবি রুমী মোগল পাঠান/ পালেন্ত সে সবে যেন শরীর সমান ॥
[দ্রষ্টব্য: *তদেব*]

১২০ *তদেব।*

১২১ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।

১২২ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন, ২০০৩), পৃ. ২০৩।

১২৩ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৭।

১২৪ হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫।

১২৫ ইতিহাস গবেষক আবদুল হক চৌধুরী ক্ষমতা জবর দখলকারী নরপদিগ্যীকে (১৬৩৮-১৬৪৮ খ্রি.) 'রাজা থিরি থু ধম্মার স্ত্রী রানী নাৎসিনম এর প্রণয়ী এবং আরাকানের মন্ত্রী' বলে উল্লেখ করেছেন। [দ্রষ্টব্যঃ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, পৃ. ৮২।] তিনি কি মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন তা উল্লেখ না থাকলেও যেহেতু তিনি মন্ত্রী ছিলেন সেহেতু তাকে আশরাফ খানের স্থলাভিষিক্ত সমর মন্ত্রী বলেও তাকে অনুমান করা যেতে পারে। তবে তিনি লঙ্গিয়েতের সুবেদার ছিলেন বলেও তথ্য পাওয়া যায়।

১২৬ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১।

১২৭ মোহাম্মদ ইদরিস আলী,"ঠাকুর মাগন বনাম কোরেশী মাগন" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ১১৭, পৃ. ১১৬।

১২৮ মন্ত্রী মাগন ঠাকুর ও কবি মাগন ঠাকুর এক ব্যক্তি কিনা এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। সে বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

১২৯ কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, (ঢাকাঃ বাঙালা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ১৯৬৭), পৃ. ২৭।

১৩০ আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০০), পৃ. ৪৯।

১৩১ কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ভূমিকা, ঋ।

১৩২ আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯।

১৩৩ আবদুল গফুর ছিদ্দিকী ও ড. সুকুমার সেন এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। [দ্রঃ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৭৪।]

১৩৪ *তদেব*, পৃ.৩০০।

১৩৫ *তদেব*, পৃ. ৩৩৫।

১৩৬ *তদেব*, পৃ. ৩৪৩।

১৩৭ Abdul Karim, *The Rohingyas op.cit.*, p. 53

১৩৮ মোহাম্মদ ইদরিস আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭।

১৩৯ পাঁচটি ভনিতা নিম্নরূপ -

ক. শুন শুন চন্দ্রসেন রাজা গুণধাম / সাত্ত্বাইল কোরেশী মাগন গুণনাম।
(কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯।)
খ. গলাগলি করিয়া কান্দ এ দুইজন / রচিল পঞ্চালী ছন্দে কোরেশী মাগন॥
(কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪।)
গ. কোরেশী মাগন কএ/ তুম্মি প্রভু দয়ামএ / তুম্মি বিনে গতি নাহি আর॥
(কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯।)
ঘ. বিক্রমে মারিল সেই রাক্ষস দুর্জন / কহিব সে সব কথা কোরেশী মাগন॥
(কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮।)
ঙ. কোরেশী মাগন বাণী/ তুম্মি প্রভু জগমনি / যথ-ইতি কার্য ব্যবহার॥
(কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮।)

১৪০ যে ছয়টি ভনিতায় মাগন নাম পাওয়া যায় তা হলঃ

ক. শুন শুন বীরভান শান্ত কর মন / চন্দ্রাবতী তোর নারী কহিল মাগন॥
(কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫।)
ক্ষেমা কর বীরভান না কর কান্দন / ক্ষেমাত সদয় প্রভু কহিল মাগন॥
(কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।)
আছুক কান্দিব সে বিরহে দুঃখ মন / শুনি উথলিয়া দুঃখ কান্দ এ মাগন॥
(কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২।)
শুনহ কুমার তোর পূরিব বাসন / পূরিব বাঞ্ছিত তোম্মা কহএ মাগন
(কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪।)

চিত্রমধ্যে না দেখিলা স্বপন / বিলাপ করিয়া কান্দে কহিল মাগন।।
(কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫।)
চন্দ্রবতী আরাধএ দেব ত্রিলোচন / পাইব দেবের বরে কহিল মাগন ॥
(কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩।)

১৪১ কোরেশী মাগন বিরচিত *চন্দ্রাবতী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ভূমিকা খ।

১৪২ আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯।

১৪৩ কোরেশী মাগন বিরচিত *চন্দ্রাবতী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ., ভূমিকা, ক।

১৪৪ কবির উক্তি -
'মান্যের 'ম' কার আর গুরুর 'গ' কার / শুভ যোগে 'নক্ষত্রের' আনিল 'ন' কার
এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভব / রাখিলেন্ত মহাজন করিয়া উৎসব।
[দ্রষ্টব্য: আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০।]

১৪৫ কবির ভাষায় -
আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল / কাব্য-শাস্ত্র ছন্দমূল পুস্তক পিঙ্গল।
পিঙ্গলের মধ্যে অষ্ট 'মহাগণ' মূল / তাহাত মগন আদ্যে শুন কবিকুল।
নির্ধিস্থির কল্প প্রাপ্তি মগন ভিতর / 'মগন মাগন' এক আকার অন্তর।
আকার সংযোগে নাম হৈল মাগন / অনেক মঙ্গল ফল পাই তেকারণ।
[দ্রষ্টব্য: আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০-৫১।]

১৪৬ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৩।

১৪৭ *তদেব*। কবি আলাওলের ভাষায়:
নৃপতিগিরির কন্যা পরম সুন্দরী / চন্দো নৃপতির ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী ॥
চন্দো উমংসার যদি গেল পরলোকে / ব্রতধর্ম আচারি রহিল স্বামী শোকে।
শ্রীচন্দ্র সুধম্মা নৃপতি শিশু দেখি / সকল অমাত্যগণ হইল একমুখী।
দণ্ডবৎ হৈয়া মহাদেবীর গোচর / কহিতে লাগিলা সবে বিনয় উত্তর ॥
শিশু নৃপে কেমতে পালিব বসুমতী / পুত্রে রাজা করিয়া আপনে পাল ক্ষিতি ॥
মুখ্য পাটেশ্বরী যদি হইল যশস্বিনী / মুখ্য অমাত্য হৈল মাগন গুণমনি ॥
(সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল)
[দ্র: -*মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, *২য় খণ্ড*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪।]

১৪৮ *তদেব*।

১৪৯ আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০।

১৫০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মরহুম মোহাম্মদ ইদরিস আলী ' ঠাকুর মাগন বনাম কোরেশী মাগন' প্রবন্ধে দুজনকে ভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এমনকি ড. আবদুল করিমও দুই মাগনকে আলাদা মনে করেন। কিন্তু তাদের অভিমতসমূহ প্রমাণভিত্তিক নয়।

১৫১ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, *২য় খণ্ড*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১।

১৫২ মোহাম্মদ ইদরিস আলী,"ঠাকুর মাগন বনাম কোরেশী মাগন" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ১১৭, পৃ.

১৫৩ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৩।

১৫৪ *তদেব*।

১৫৫ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, *২য় খণ্ড*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৫।

১৫৬ Sebastian Manrique, *op.cit.*, p. 351

১৫৭ কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী*, পৃ. ভূমিকা ঐ।

১৫৮ মহাকবি আলাওলের ভাষায় -
ওলামা সৈয়দ শেখ যথ পরদেশী / পোষন্ত আদর করি বহু স্নেহবাসি
কাহাকে খতিব কাকে করন্ত ইমাম / নানাবিধ দানে পুরায়ন্ত মনস্কাম।
[দ্রষ্টব্য: আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯।]

১৫৯ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, "আলাওলের তোহফা" *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা,* কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৩৬৮, পৃ. ১১০।

১৬০ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪১।

১৬১ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১০২।

১৬২ আলাওল বিরচিত '*সতী-ময়না লোর চন্দ্রানী,* মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৬। কবি অন্য চরণে বলেন "পরদেশী আলীম ফকির গুণবন্ত / ভক্ষ বস্ত্র দিয়া নিত্য সাদরে পোষন্ত" [তদেব, পৃ. ৫।]

১৬৩ *তদেব,* পৃ. ৪।

১৬৪ আলাওল বিরচিত *তোহফা,* আহমদ শরীফ সম্পাদিত, (ঢাকা: বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃ. ১৪০।

১৬৫ আলাওল বিরচিত '*সতী-ময়না লোর চন্দ্রানী,* পৃ. ৫। উল্লেখ্য, কবিতার দ্বিতীয় চরণে সম্পাদক মুনির স্থলে গুণির বা মনির শব্দ লিখেছেন।

১৬৬ আলাওল বিরচিত *তোহফা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৪০।

১৬৭ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, "আলাওলের তোহফা", *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৪০।

১৬৮ আলাওল বিরচিত '*সতী-ময়না লোর চন্দ্রানী, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৯।

মহামত্য সোলায়মানের সদাচারণে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কবি তার জন্য দোয়া করেন এভাবে -

তেকারণে শিরে মনে করো আশীর্বাদ / বিধি পুরাউক মনে আছে যেই সাধ।।

সপ্তবিংশ আয়ু হোক পুরাউক যশ / দেব আর শত্রু হোক তোমা প্রেমে বশ ॥

[দ্রষ্টব্য: আলাওল বিরচিত '*সতী-ময়না লোর চন্দ্রানী, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫।]

১৬৯ কবি আলাওলের উক্তি:

দিল্লীশ্বর বংশ আসি / যাহার শরণে পশি

তার সম কাহার মহিমা।।

[আলাওল বিরচিত, *তোহফা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১১০।]

১৭০ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২২১।

১৭১ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১০০।

১৭২ কবি আলাওলের ভাষায় -

সৈয়দ মুসা নামে এক পুরুষ মহন্ত / অভিন্ন বদন রূপ মহাগুণবন্ত ॥

আমি বৃদ্ধ ফকিরেরে অতিবহুতক / তালিম আলিম বলি করএ আদর ॥

[দ্রষ্টব্য: আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২২৪।]

১৭৩ *তদেব।*

১৭৪ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১০০।

১৭৫ আলাওল বিরচিত '*সিকান্দর নামা,* আহমদ শরীফ সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭), পৃ. ২৬।

১৭৬ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১০০।

১৭৭ আলাওল বিরচিত *তোহফা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৯।

১৭৮ *তদেব,* পৃ. ৩০।

১৭৯ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৪।

১৮০ Abdul Karim, *The Rohinga: A Short Account of Their History and Culture, op. cit.,* p. 72.

১৮১ আলাওল বিরচিত '*সিকান্দর নামা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৮।

১৮২ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৫।

অধ্যায় ৩
আরাকানী সমাজে মুসলমান

রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে সামাজিক ইতিহাসের পরিধি অনেক বিশাল, অনেক ব্যাপক। তাই যে কোন অঞ্চল বা দেশের সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠন অতীব কঠিন কাজ। মূলত একটি দেশের প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে অতীতের দৈনন্দিন জীবনে এর সকল মানুষের চিন্তা ও কর্মকাণ্ড। সমাজে ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মকাণ্ড রূপ লাভ করে পরিবারে, জাতিগোষ্ঠীতে, শ্রেণীতে, গ্রামে বা শহরে তথা সমগ্র দেশে এবং সর্বস্তরে ঐ ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মকাণ্ড অবধারিতভাবে প্রভাবিত হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস, জাত, শ্রেণী, আচার-প্রথা, শিক্ষা, সংগঠন-সমিতি, সংস্কার-কুসংস্কার, সংস্কার আন্দোলন, সাহিত্য সংগীত, আনন্দ উৎসব, স্থাপত্য-শিল্পকলা, লোকগাঁথা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, আন্তঃশ্রেণী সম্পর্ক, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা প্রভৃতিই সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যাতে সমাজে সুশৃংখলভাবে বসবাস করতে পারে সেজন্য প্রণীত হয় নানা রকম আইন-অনুশাসন, রীতিনীতি এবং গড়ে ওঠে বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্বাতন্ত্রিক আচার প্রথা। সামাজিক স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনের ধারায় এ সকল প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতির ভূমিকা মূল্যায়ন করাও সামাজিক ইতিহাস চর্চার অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু এ কাজ নিখুঁতভাবে পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কেননা পরিবার, গোষ্ঠী, জীবনচিন্তা, কর্মকাণ্ড, সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠানসমূহ, ভোগ বিলাস, আনন্দ উৎসব, সংস্কার পদ্ধতি, বহির্জগতের সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে অঞ্চল ভেদে ভিন্নতর দীর্ঘ ইতিহাস থাকে। অঞ্চল ও রাষ্ট্র তো বটেই একই অঞ্চলের একটি গ্রামের বিশ্বাস ও অবকাঠামোগত পার্থক্য থাকার কারণে এ পাড়া ও পাড়ার মধ্যে সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের সঠিক চিত্র উপস্থাপন করা প্রায় অসম্ভব। এ সকল সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেই অত্র অধ্যায়ে আরাকানের সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইসলাম কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তা উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হল।

৩.১ ইসলামপূর্ব আরাকানের সমাজ ব্যবস্থা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকেই আরাকানে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোগত ভাবে সংঘবদ্ধ সমাজ জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অস্ট্রো-এশীয় এবং

ভোট-চীনা গোত্রীয় মানুষই আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের খ্রিস্টপূর্ব যুগের আদিবাসী বলে অনুমান করা হয়।[১] মারু বংশীয় রাজাগণ বংশ পরম্পরায় তখন আরাকান শাসন করত। অযোধ্যা ও বিহার অঞ্চলের জৈন এবং পরবর্তীতে জড়বাদী হিন্দু কর্তৃক

প্রভাবিত ছিল তৎকালীন আরাকানের সমাজ ব্যবস্থা।[২] ক্রমশ এতে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়, এমনকি ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকেরা আরাকানের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মগধ থেকে আগত চন্দ্র-সূর্য বংশের রাজাদের প্রভাবে আরাকানে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। এভাবে পুরোপুরিভাবে ভারতীয়কৃত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আরাকানের বিভিন্ন স্থানের নাম ভারতীয় অনুকরণে আমরাপুর, রামাবতী, ধন্যাবতী, বৈশালী, হংসবতী প্রভৃতি নামকরণ হয়। রাজবংশের নামও ছিল ভারতীয় অনুকরণে মারু, কানরাজগজি, চন্দ্র-সূর্যবংশ, পিনসা প্রভৃতি এবং আরাকানে রাজাদের নামও রাখা হতো ভারতীয় প্রথা অনুসারে। সেখানে ভারতীয় বর্ণমালা ব্রাহ্মীলিপিতে সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি ও শিবাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা ছিল এবং মুদ্রায় বৃষমূর্তি, ধ্বজ, লাঞ্ছন প্রভৃতি অংকিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত চট্টগ্রাম ও আরাকান একটি অখণ্ড রাজ্য হিসেবে চন্দ্রসূর্য রাজাগণ কর্তৃক শাসিত হলেও সময়ের ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামের সমাজ গড়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের আলোকে এবং আরাকানী সমাজ গড়ে ওঠে বৌদ্ধ ধর্মীয় চেতনার আলোকে।

প্রাচীন চট্টগ্রাম ও আরাকানের হিন্দু সম্প্রদায় মূলত ভারতবর্ষের হিন্দু জাতিরই অংশ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শুদ্র এই চার প্রধান বর্ণ ও ছত্রিশ জাত নিয়ে এখানকার হিন্দু সম্প্রদায় গঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত অর্থে ৪১টি উপবর্ণের সমন্বয়ে তা গঠিত ছিল।[৩] প্রাচীনকালে গোত্রগত পেশার ভিত্তিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেণীবিন্যাস হয়েছিল। পূর্বে উল্লেখিত খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে আর্যবংশীয় হিন্দুদের সাথে স্থানীয় আদিম জনগোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

তৎকালীন সময়ে আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের হিন্দু সমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রবল ছিল। বিয়ে-শাদী-নৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণে সামাজিক সিঁড়ি প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তা কড়াকড়িভাবে পালন করা হতো। সামাজিক বৈঠকে কৌলীন্যের মান অনুযায়ী বংশের প্রধান ব্যক্তিরা সিঁড়ি বা লাইনের প্রথম স্থানে বসত। এরপর কৌলীন্যের মান অনুযায়ী সবাই পরপর লাইনে বসত। তাদের মধ্যে ছুৎবাই ছিল খুব বেশী। কুলীনরা অকুলীন বাড়িতে নিমন্ত্রণ গ্রহণই করত না, যদিওবা বিশেষ কোন কারণে দাওয়াত নিতো তবে সেখানে যাবার সময় পারিবারিক গোলাম বা দাস দ্বারা নিজেদের থালাবাটি সঙ্গে নিয়ে যেত।[৪]

আরাকানের শাসকগোষ্ঠী হিন্দু ধর্মের অনুসারী হলেও সাধারণ জনগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। বিশেষত হিন্দুদের বর্ণ প্রথার কারণে ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ত্রিপুরা হয়ে আরাকানে এসে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়ে যেত। ক্রমশ আরাকানের শাসকগণও সামাজিক পরিবেশের আলোকে নিজেদেরকে বৌদ্ধ মতাবলম্বী হিসেবে প্রকাশ করতে থাকে। বিশেষ করে আরাকান রাজা ছান্দা থুরিয়া (Sanda Thuriya- 146 -198 AD)

আরাকানের সমাজে বৌদ্ধ প্রভাবের বিস্তার ঘটান।[৫] এভাবে ইসলাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানী সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় একচেটিয়া প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৩.২ আরাকানী সমাজ ও ইসলাম : প্রাথমিক পর্ব

পঞ্চম শতাব্দীর শেষ থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের হাতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যেমন নির্যাতিত হচ্ছিল ঠিক একই প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধরাও ব্যাপকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। আরাকানের শাসকগণ হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হলেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী হবার কারণে আরাকানে বৌদ্ধ ধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আরব মুসলিম বণিকগণ চট্টগ্রাম-আরাকান অঞ্চলে বাণিজ্য ব্যাপদেশে মিশন নিয়ে যাতায়াত শুরু করলেও অষ্টম শতাব্দীতে তাদের আগমন আরও বৃদ্ধি পায়। এ সময় চট্টগ্রাম ও আরাকানে আগত আরব বণিকদের সংস্পর্শে এ এলাকার মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অবগত হবার সুযোগ পায়। বণিকরা কেউ সপরিবারে আসেননি। অন্যদিকে মৌসুমী বায়ুর জন্য তাদেরকে প্রায় ৫/৬ মাস অপেক্ষা করতে হতো।[৬] এ সময় তারা স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহিলাদের বিয়ে করতেন।[৭] বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ মহিলাগণ যেমন ইসলাম গ্রহণ করতেন তেমনি তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানরাও ইসলামের সুমহান আদর্শকে গ্রহণ করেই বেড়ে ওঠে। এভাবে ক্রমশ আরব বণিক, বহিরাগত মুসলিম দরবেশ, সুফি, উলামা ও ইসলাম প্রচারকদের উৎসাহ উদ্দীপনায় চট্টগ্রাম ও আরাকানে বসবাসরত নিম্নবর্ণের নির্যাতিত হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে চট্টগ্রামসহ মুসলিম পরিবারের সমন্বয়ে একটি মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে।[৮] দশম শতাব্দীতে সেখানে মুসলিম সমাজের প্রভাব এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কোন কোন গবেষক এটাকে ছোটখাট মুসলিম রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করে এর আমীরকে 'সুলতান' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৯] এ সুলতানের অধীনস্ত এলাকা ছিল মেঘনা নদীর পূর্বতীর থেকে নাফ নদীর উত্তর তীরবর্তী সমুদ্রোপকূলবর্তী ভূভাগ পর্যন্ত। আরাকানের জাতীয় ইতিহাস রাজোয়াং এর সূত্রে তারা উল্লেখ করেন যে, আরাকানরাজ সুলতইঙ্গ-ৎ-চন্দ্র (Chulataing chandra- 951-957) ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য জয়ে বের হন। তিনি নিজ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে 'খুরতনকে' পরাজিত করে চেত্তাগৌং - এ একটি প্রস্তর নির্মিত বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করে পাত্র মিত্রের অনুরোধে তিনি স্বরাজ্যে ফিরে যান। এ 'চেত্তাগৌং'; অর্থ যুদ্ধ করা অনুচিত। এ শব্দ থেকেই চট্টগ্রাম নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[১০] উল্লেখ্য যে, এখানে 'খুরতনকে' পরাজিত করা বলতে অর্থাৎ সেই মেঘনা অববাহিকায় প্রতিষ্ঠিত নব ইসলামি রাজ্যের সুলতানকে বুঝানো হয়েছে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন। কিন্তু এ বিষয়টি বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। তবে বাংলায় ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা হবার অনেক আগেই যে চট্টগ্রাম আরাকানে ইসলামি পরিবেশ সম্বলিত সামাজিক অবকাঠামো নির্মিত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর তা যে আরও সুদৃঢ়রূপ লাভ করেছিল তা সহজ কথায়ই বলা যায়।

আরাকানের মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম-আরাকানে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে এবং চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার ক্রমশ অধঃপতিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[১১] অন্যদিকে ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে তুর্কী, পাঠান ও গৌড় থেকে আগত মুসলমানদের সংস্পর্শে আরাকানী সমাজে ইসলামের প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং গৌড়ের মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতির সাথে চট্টগ্রাম-আরাকানের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ স্থাপিত হয়।[১২] চতুর্দশ শতাব্দীর মরক্কোর পর্যটক আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে বতুতা ১৩৪৬ সালে যখন চট্টগ্রাম-আরাকান সফর করেন তখন তিনি সেখানে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার দেখেছিলেন।[১৩] মূলত পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে আরাকানী সমাজে ইসলামের যে প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে তার প্রধান বিষয় হচ্ছে পর্দা প্রথা। তৎকালীন আরাকানী সমাজে মুসলমান নারীদের পর্দা পালনের প্রভাবে আরাকানের অমুসলিম নারীদের মাঝেও এর বিস্তার ঘটে।[১৪] এটি যে মুসলমানদের আদর্শিক বিজয় এতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া প্রাচীনকালে আরব মুসলমান বণিকরা নৌবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তাঁদের সংস্পর্শে চট্টগ্রাম-আরাকানের মুসলমানরাও নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। সেই সাথে চট্টগ্রাম-আরাকানের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন স্থানের আরবি নাম, খেলাধুলা, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারে আরবীয় প্রভাব এমনকি কথা বার্তায় আরবী ভাষার অনুকরণে 'লা' (না বোধক শব্দ বাক্যের সূচনালগ্নে 'আঁই ন যাইয়ুম') ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে আরব প্রভাবের ফল এতে কোন সন্দেহ নেই।

৩.৩ আরাকানী সমাজে মুসলমানদের গোত্রগত শ্রেণী বিন্যাস

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আরাকানী সমাজের প্রাচীন ভিত্তি ছিল জড়োপসনা ও বস্তুবাদকেন্দ্রিক। সময়ের প্রেক্ষিতে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে হিন্দু এবং পরবর্তীকালে ক্রমশ বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয় আরাকানী সমাজ। অষ্টম শতাব্দীতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সামাজিক রীতির মধ্যেই ইসলামি রীতিনীতির বিকাশ শুরু হয় এবং ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা নরমিখলা সোলায়মান শাহ্ নাম গ্রহণ করে মুসলমানদের প্রতি অনুরাগী হলেও আরাকানী মুসলিম সমাজ বাংলা কিংবা আরবের মত পুরোপরিভাবে ইসলামের অনুসরণে গঠিত হয়নি। কারণ আরাকানী মুসলমানদের উত্থানই হয়েছে বর্ণসংকর জাতি হিসেবে। কেননা আরাকানের প্রাচীন জনগণ বলতে মোঙ্গলীয়, ভোট চীনা, মুরং, খুমী, চাক, সিন, সেন্দুজ, ম্রো, খ্যাং, উইনাক, মারূ, পিউ প্রভৃতি কিরাত উপজাতির জনগোষ্ঠীকে বুঝায়।[১৫] আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শতাব্দীতে আরব, ইরানী, গৌড়ীয় ও ভারতীয়সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিম বণিক, নাবিক, ইসলাম প্রচারক, পরিব্রাজক প্রমুখ আরাকানে এসে এখানকার এ সকল জনগোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতো। তাদের ঔরস ও গর্ভজাত আরাকানী মুসলমানগণের মধ্যে বর্ণসংকর জনগোষ্ঠীর আকার আকৃতি এবং দৈহিক গঠনে বৈচিত্রের সৃষ্টি হয়। আকার আকৃতিতে তারা যেমন কেউ বেটে,

খাটো, কেউ মধ্যম আকৃতির, লম্বাটে, নাক চেপ্টা, চক্ষু আয়ত ও ক্ষুদ্র ও দাঁড়ি বিহীন, চুল তামাটে এবং সজারু কাটার মত খাড়া আবার কেউবা আরব ও ইরানীদের মত সুঠাম দেহের অধিকারী, ঠিক তেমনি বিশ্বাস ও রুচিবোধের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বিবাহের সময় ভিনদেশী কোন কোন মুসলমান প্রস্তাবিত মহিলাকে আগে ইসলামে দীক্ষা দিত, আর কেউবা ইসলামে দীক্ষিত না করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ঈমানিয়াত বা বোধ-বিশ্বাস ও রুচির ক্ষেত্রে ভিন্নতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আর এ বিশ্বাস ও রুচিবোধের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন রীতিপ্রথা ও কুসংস্কার প্রবেশ করেছে।

৩.৩.১ থাম্ভইক্যা

থাম্ভইক্যা বা থাম্ভুকেয়া (Thambukya) আরাকানী শব্দ। এর অর্থ জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষা প্রাপ্ত।[১৬] অর্থাৎ দুর্ঘটনাবশত জাহাজ ডুবে যাবার পর যে সকল মুসলমান প্রাণে রক্ষা পেয়ে আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তারাই থাম্ভইক্যা নামে পরিচিত। আরাকান অঞ্চলে আরব বণিকদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কথা যেহেতু প্রমাণিত বিষয়, সেহেতু থাম্ভইক্যা শব্দের অর্থগত দিক বিবেচনা করে অনেকে এ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আরাকানের প্রাচীন ও প্রাথমিক পর্যায়ে আগমনকারী আরব মুসলমান হিসেবে অনুমান করেন। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস রাজোয়াং এর উদ্ধৃতি দিয়ে কোন কোন গবেষক উল্লেখ করেন যে, আরাকানের বৈশালী রাজা মহতইঙ্গ চন্দ্রের রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১০ খ্রি.) কয়েকটি আরব বাণিজ্যিক জাহাজ দক্ষিণ আরাকানের রনবী বা রামরী দ্বীপে বিধ্বস্ত হয়। ডুবন্ত জাহাজের আরব বণিক ও নাবিকগণ স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়। উদ্ধার প্রাপ্ত আরব নাবিক এবং বণিকদেরকে রাজা মহতইঙ্গ চন্দ্রের দরবারে উপস্থিত করা হলে রাজা তাদের দুরাবস্থার কথা শুনে দয়া পরবশ হয়ে তার রাজ্যের পল্লী অঞ্চলে বসবাস করার অনুমতি দান করেন। তারা স্থানীয় মহিলাদের বিয়ে করে আরাকানেই বসতি স্থাপন করে।[১৭] ঠিক একইভাবে স্থানীয় ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বার্মা গেজেটিয়ারেও অনুরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়।

> About 788 A.D. Maha-taing Sanday ascended the throne, founded a new city on the site of the old Ramawati and died after a reign of tweenty two years. In this reign, several ships were wrecked on Ramree Island and the crews said to have been Mahomedans, were sent to Arakan proper and settled in villages.[১৮]

উপরোদ্ধৃত বিবরণসমূহে প্রতীয়মান হয় যে, নবম শতাব্দীতে আরব বণিকদের জাহাজ ডুবে যায় রামরী দ্বীপের পার্শ্বে। সেখান থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে আরাকানের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়। বৃটিশ-বার্মা গেজিটিয়ারেও এ ধরনের বিবরণ উল্লেখ আছে - যেমন

> The local histories relate that in the ninth century, several ships were wrecked on Ramree Island and the Mussalman crews sent to Arakan and placed in villages there.[১৯]

কিন্তু এখানেও শুধু উল্লেখ করা হয়েছে জাহাজ ভাঙ্গার কথা এবং তাদেরকে আরাকানে বসতি স্থাপনের অনুমতি দানের কথা। কিন্তু তারাই যে থাম্ভইক্যা গোত্রের লোক তা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। যেহেতু আরাকানী থাম্ভইক্যা শব্দের অর্থ জাহাজডুবি থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী। সেহেতু রামরী দ্বীপের পার্শ্বে বিধ্বস্ত হওয়া জাহাজের বেঁচে যাওয়া মুসলমানদেরকে থাম্ভইক্যা মনে করে কেউ কেউ তাদেরকে আরাকানের প্রথম আগমনকারী এবং প্রথম বসতি স্থাপনকারী মুসলিম জনগোষ্ঠী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[২০] কিন্তু এ বক্তব্যের স্বপক্ষে তেমন কোন যুক্তি নেই। আরাকান মুসলিম কনফারেন্স এর সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে জহিরউদ্দীন আহমদ ও নজির আহমদ আরাকানে বসতি স্থাপনকারী থাম্ভইক্যাদের সম্পর্কে লিখেছেন- A few hundreds of Muslims along the sea-shore near Akyab, known as thambuky.[২১] সুতরাং থাম্ভইক্যারা আকিয়াবের সমুদ্রোপকূলে বসবাসকারী জেলে সম্প্রদায় হলেও এরাই যে প্রথম বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠী কিংবা মহতইঙ্গ চন্দ্রের সময়কালে আগত জাহাজ ডুবি সেই মুসলিম সম্প্রদায় তা শুধুমাত্র অর্থগত বিষয় চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। তবে হতে পারে এরা অন্য কোন সময়কালে আরাকানে আগমনকারী জাহাজডুবি থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিম জনগোষ্ঠী।

থাম্ভইক্যারা মুসলিম হিসেবে পরিচিত হলেও বিশ্বাস ও সামাজিক দিক থেকে প্রায় আরাকানী মগদের মত। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং রীতিনীতি ছাড়া আরাকানী মগদের সাথে তাদের তেমন কোন পার্থক্য নেই। তারা আরাকানী মগদের মত পোষাক পরে এবং আরাকানী মগদের মতই আরাকানী ভাষায় কথা বলে।[২২] এ গোত্রের লোকসংখ্যা মাত্র কয়েকশত। বর্তমানে এরা আর্থ-সামাজিকভাবে অনেক পিছিয়ে। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারা আরাকানের মগদের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরে অবস্থান করছে। সমুদ্রোপকূলে বসবাস করে মৎস শিকার করাই তাদের একমাত্র পেশা। ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠা হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিম্ন শ্রেণীর জনগণ হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করছে। মুসলিম প্রভাবিত আরাকানের ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে তাদের ভাষা-ধর্ম ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা খানিকটা উন্নত থাকলেও সময়ের ধারাবাহিকতায় তারা নিজস্ব ভাষা ভুলে পুরোপুরি আরাকানী ভাষাভাষী ও আরাকানী সমাজের সাথে মিশে গেছে। কিন্তু কৌলীন্যগত দিক থেকে তারা নিম্নশ্রেণির মুসলমান হিসেবে পরিচিত।

বর্তমান বাংলাদেশের কক্সবাজার অঞ্চলে 'থাম্ভরগ্যা' নামে পরিচিত একটি মুসলমান গোত্রের বসবাস রয়েছে। তারা আরাকানী বর্ণসংকর জাতি বলে পরিচিত এবং পেশায় তারা জেলে। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে তারা আরাকান অঞ্চল থেকে কক্সবাজারে এসে এখানকার বিভিন্ন নদী ও সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন

করে। অনুমান করা যায় যে, তারা ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা বোধাপায়া কর্তৃক আরাকান দখলের সময় কিংবা তারও আগে এরা কক্সবাজার অঞ্চলে বসতি শুরু করে। কোন কোন গবেষক এদের সম্পর্কে বলেন- প্রাচীনকালে তারা আরাকান থেকে কক্সবাজার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে।[২৩] এ থেকেও অনুমান করা যায় যে, চট্টগ্রাম যখন আরাকানের অন্তর্ভুক্ত ছিল অর্থাৎ শায়েস্তা খান কর্তৃক ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চল বাংলার সীমান্তভুক্ত করার পূর্বেই হয়তো তারা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলে বসতি শুরু করেছে।

'থাম্ভরগ্যা মুসলমানরা আকার-আকৃতিতে আরাকানী মগদের মত। তৎকালীন সময়ে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি এমনকি গৃহনির্মাণ পদ্ধতিও ছিল আরাকানীদের মত।[২৪] শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসগত পার্থক্য ছাড়া আরাকানী মগদের সাথে তাদের কোন পার্থক্য ছিল না। ফলে এরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন গোত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কক্সবাজার অঞ্চলের মুসলমানরা ঘৃণা করে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ কিংবা সামাজিকভাবে মেলামেশা করত না। ফলে তারা কক্সবাজারের সমাজ-সংস্কৃতি থেকে আলাদাভাবে জীবন চালাত এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সামাজিক মেলামেশা নিজেদের গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখত।[২৫] জেলে পেশায় নিয়োজিত থাকার কারণে শুধুমাত্র মাছ ধরার জালই ছিল তাদের একমাত্র সম্পত্তি।

চিটাগাং ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ারে কক্সবাজার অঞ্চলে সাম্বনীজ (shambunis) নামে একটি গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে তাদের যে জীবিকার বিবরণী, আকার আকৃতি, সামাজিক মর্যাদা, ভাষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের বিবরণ দেয়া হয়েছে তা পুরোপুরি কক্সবাজারের থাম্ভরগ্যাদের সাথে মিলে যায়।[২৬] এজন্য সাম্ভুনী বলতে 'থাম্ভরগ্যাদেরকেই বুঝানো যেতে পারে। মূলত আরাকানের থাম্ভইক্যা, কক্সবাজার থাম্ভরগ্যা কিংবা 'সম্ভুনী' এরা সবাই আরাকানের থাম্ভইক্যা মুসলমান বলে অনুমান করা যায়।

৩.৩.২ জেরবাদী

জেরবাদী আরাকানের অন্য আর একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী। বর্মী মুসলমানদেরকে সাধারণত জেরবাদী নামে আখ্যা দেয়া হয়।[২৭] এরা মূলত বাংলা, ভারতীয় এবং বর্মী তথা আরাকানীদের সমন্বয়ে একটি বর্ণসংকর মুসলিম জনগোষ্ঠী। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আরাকানের বিতাড়িত শাসক নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহ কর্তৃক আরাকান পুনর্দখলের পর সেখানে মুসলমানগণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করে। এ প্রেক্ষিতে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে মুসলমানগণ ভাগ্যান্বেষণে আরাকানে পাড়ি জমায়। বাংলার মুসলমান ছাড়াও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকজন আরাকানে গিয়ে স্থানীয় মগ মেয়েদের বিয়ে করার ফলে যে বর্ণসংকর মুসলিম জনগোষ্ঠীর উদ্ভব

হয়, এরাই জেরবাদী নামে পরিচিত। জেরবাদী শব্দটি ফারসি ভাষাজাত। জেরবাদ শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জেরবাদ শব্দটি 'জিরবাদ' বলে উচ্চারিত হিসেবে। এক্ষেত্রে জির+বাদ = জিরবাদ অর্থাৎ বায়ুর নিম্নদিকে তথা অনুবাত। জেরবাদ নৌবিদ্যায় ব্যবহৃত একটি শব্দ। সাধারণত পূর্বদিকে অবস্থিত দেশসমূহকে এ বিশেষ নামে অভিহিত করা হতো। এ হিসেবে কতিপয় ভারতীয় দ্বীপকে বায়ুর অনুবাত ও অপর কতিপয় দ্বীপকে প্রতিবাত স্থান বলে চিহ্নিত করা হতো। এক্ষেত্রে লঙ্কা দ্বীপ বা শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং সকোত্রা প্রভৃতি দ্বীপকে প্রতিবাত স্থান বলা হতো বলে অনুমিত হয়।[২৮] তবে এ সম্পর্কে সঠিক কোন প্রমাণ নেই। অপরপক্ষে মালাক্কা, সুমাত্রা, টেনাসেরিম, বাংলা, মার্তাবান, পেগু প্রভৃতি দেশ ছিল অনুবাত স্থলের অন্তর্ভুক্ত, ফলে এ আঞ্চলিক সমুদ্রে পরিভ্রমণকারী নাবিকদিগকে বুঝাতে 'জিরবাদী' শব্দটি ব্যবহৃত হতো।[২৯] অন্যদিকে 'জেরবাদ' শব্দটি মালয়ী ভাষা হতে উৎপত্তি হয়েছে বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। এ সকল অনুমানের উপর ভিত্তি করে আরব বণিকগণ অনুবাত অঞ্চলের দেশ হিসেবে মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশকেও অনুবাত অঞ্চল হিসেবে দেখেন। সে ভিত্তিতেই বর্মী কিংবা আরাকানী মুসলমানদেরকে জেরবাদী বলা হয়ে থাকে।

আরাকানে বসবাসকারী জেরবাদ নামে খ্যাত মুসলমানদের সংখ্যাও খুব কম। এরা উর্দু ভাষাভাষী হলেও সময়ের ধারাবাহিকতায় আরাকানী ভাষাকেই গ্রহণ করে। আরাকানী মগদের সাথে বেশী পরিমাণে সম্পৃক্ত হবার কারণে 'জেরবাদী' মুসলমানদের বিশ্বাস ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে বৌদ্ধ ও মগ প্রভাব খুব বেশী।

৩.৩.৩ কামানচি

'কামানচি' আরাকানের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম জনগোষ্ঠী। এরা মূলত মোগল সুবেদার শাহ মুহাম্মদ শুজার সাথে আরাকানে আশ্রিত শুজার অনুগামী বিশ্বস্ত অনুচর এবং তাদের আত্মীয় স্বজন। কামান ফারসি শব্দ। পারস্যে ধনুক'কে কামান নামে আখ্যা দেয়া হতো।[৩০] এ ধনুক ব্যবহারকারী মুসলিম সৈনিকদেরকে কামানচি নামে অভিহিত করা হয়।

বাংলার মোগল সুবেদার শাহজাদা মুহাম্মদ সুজা উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে স্বীয় ভাই আওরঙ্গজেবের সাথে পরাজিত হয়ে আরাকান শাসক সান্দা থু ধম্মার দরবারে আশ্রয় প্রার্থী হয়েছিলেন। রাজা সান্দা থু ধম্মা লোভের বশবর্তী হয়ে সহযোগিতার পরিবর্তে সশস্ত্র বিদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে সপরিবাবে হত্যা করেন। এ ঘটনার পর শাহ সুজার অনুসারীগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে রাজা সান্দা থু ধম্মা তাদের সকলকে রাজার দেহরক্ষী এবং প্রাসাদরক্ষী বাহিনীতে চাকরি দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।[৩১] এ মোগল সৈনিকগণ তীরন্দাজ বাহিনী ছিলেন এবং আরাকানের রাজার প্রাসাদ রক্ষী ও দেহরক্ষী বাহিনীতেও তীরন্দাজ বাহিনী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার কারণে এদেরকে 'কামান বাহিনী' বা 'কামাঞ্চী' বলে অভিহিত করা হতো।

শাহ সুজা হত্যার ঘটনায় সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মোগল সুবেদার শায়েস্তা খানের পক্ষ থেকে ৬৫,০০০ নৌসেনা দুইশত আটাশি খানি রণপোত মগ দস্যুদের সমূলে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। তারা অতি সহজেই মগদের প্রধান ঘাঁটি চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের রামু দখল করে নেয়।[৩২] বিজয়ী মোগল বাহিনী ২,০০০ আরাকানীকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে এবং ১০২৬টি জিঙ্গল কামান (cannon, mostly Jingals throwing a one pound ball) দখল করে নেয়। ১৩৫টি আরাকানী রণপাত বিজয়ীদের অধিকারে আসে এবং অবশিষ্ট আরাকানী রণপোতগুলি যুদ্ধ চলাকালীন এবং পরবর্তীতে পলায়নকালে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। আরাকানীদের দুটি হাতি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। আরাকানী বাহিনী প্রাণ ভয়ে স্বদেশ অভিমুখে পালানোর চেষ্টা করলেও পথিমধ্যে তারা তাদের পূর্বতন মুসলমান কৃতদাসগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অনেকে নিহত হয় কিংবা আহত হয়ে স্বদেশ ফিরে যায়।[৩৩]

আরাকানের রাজা কর্তৃক শাহ সুজার হত্যাকাণ্ড এবং সে প্রেক্ষিতে সংঘটিত মোগল আরাকান যুদ্ধের ফলে আরাকানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সামরিক শক্তিও ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। এ ঘটনার পর আরাকান রাজ্যের গৌরব ও সমৃদ্ধির উপর যে আঘাত আসে তা আর কোন দিন দূরীভূত হয়নি। তবে শাহ সুজার অনুচরবর্গ কামানচি নামে পরিচিত হয়ে বরং সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে থাকে। কামানচি বাহিনী গঠিত হবার পর এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিশেষত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক মর্যাদা পাবার আশায় এ সময় উত্তর ভারত থেকে অনেক মুসলিম যোদ্ধা আরাকানে পাড়ি জমায় এবং কামানচি বাহিনীতে যোগদান করে।[৩৪] ফলে কামানচি বাহিনীর শক্তি দিন দিন বাড়তে থাকে।

কামানচিগণ আরাকানী সমাজে নয়া গণ্যমান্য (এলিট) শ্রেণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ বাহিনীর প্রত্যেক সৈন্য মাসিক চার টাকা হারে বেতন পেত।[৩৫] বেতন ভাতার মাধ্যমে যেমন অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা বোধ করে তেমনি রাজ্যের প্রাসাদরক্ষী ও রাজার দেহরক্ষী বাহিনী হিসেবে দায়িত্ব পালনের কারণে আরাকানী সমাজে তারা নিজেদের প্রভাব বলয় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এমনকি কামানচিরা দেশের রাজা কিংবা জনসাধারণকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তোয়াক্কাই করত না। তারা আপন খেয়াল খুশি মত রাজাকে নিজেদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করত। কোন রাজা তাদের অবাধ্য হলে তাঁকে হত্যা করে নিজেদের পছন্দমত রাজপরিবার থেকেই পুনরায় রাজা নির্বাচন করত। তবে তারা নিজেরা কখনো রাজা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করত না। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা সান্দা থু ধম্মার মৃত্যুর পর কামানচিরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা নব নিযুক্ত রাজা থিরি থুরিয়ার (১৬৮৪-৮৫ খ্রি.) নিকট বেতন ভাতা বৃদ্ধির দাবী করে। তিনি বেতন বৃদ্ধিতে অপারগতা প্রকাশ করলে কামানচিরা ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি

প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রাজা, রানী ও রাজপরিবারের বহু নর-নারীকে হত্যা করে এবং রাজকোষ লুণ্ঠন করে।[৩৬] অতঃপর স্বীয় ভ্রাতা ওয়ারা ধম্মা রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে তার নিকট বেতন বৃদ্ধির দাবী জানালে তিনিও এতে অপারগতা প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে কামানচিরা প্রাসাদ অবরোধ করে। রাজা পালিয়ে গিয়ে কোন মতে প্রাণে বেঁচে গেলেও কামানচিরা প্রাসাদ পুড়িয়ে দেয় এবং রাজপ্রাসাদও লুণ্ঠন করে।[৩৭] এভাবে ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র ২৫ বছরে কামানচিরা তাদের খেয়াল খুশিমত রাজ পরিবারের দশজন লোককে সিংহাসনে বসায় এবং স্বীয় দাবী পূরণে ব্যর্থতার অভিযোগে তাদের হত্যা কিংবা পদচ্যুত করে। অবশেষে মহাদণ্ডায়ু নামক জনৈক আরাকানী সামন্ত আরাকানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সান্দা উইজা নাম ধারণ করে কামানচিদের বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি পরিচালনা করেন। এমনকি তিনি কামানচিদেরকে চাকরি থেকে পদচ্যুত করে আরাকান অধিকৃত দক্ষিণ চট্টগ্রামের শংখ নদীর তীর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। তিনি কামানচিদের ক্ষমতা খর্ব করে আরাকানের রাম্রী, দুলে, লেড়ুং, আরাগাঁও, সিক্কেবীন, সিন্দবিন, নদোবিন প্রভৃতি স্থানে নির্বাসিত করে তাদের শক্তি চিরতরে শেষ করে দেন।[৩৮] পরবর্তীকালে এ সকল স্থানেই কামানচিদের আবাসিক পল্লী গড়ে ওঠে।

কামানচিরা রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদা এবং ক্ষমতাধর হিসেবে আবির্ভূত হলেও সফল হতে পারেনি। তারা শাসক নির্বাচন ও পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলেও 'রাজশক্তি' দখলের চেষ্টা করেনি। কারণ তারা মনে করেছিল যে, রাজশক্তি হাতে নিয়ে জনতার বিরাগভাজন হবার চেয়ে বরং প্রশাসনের বাইরে থেকে রাজক্ষমতা প্রয়োগ ও সুবিধাসমূহ আদায় করাই শ্রেয়। এতে জনগণও রুষ্ট হবেনা পক্ষান্তরে তাদের স্বার্থও হাসিল হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মালয়ের বুগিজ শ্রেণী কিংবা মোগল প্রশাসনে ইংরেজ অথবা আরো আগে আব্বাসীয় খিলাফতে বুয়াইয়া ও সেলজুকদের মত সুবিধা আদায় এবং ক্ষমতার প্রয়োগ তাদের লক্ষ্য থাকলেও তারা কিছু দিনের জন্য আরাকান প্রশাসনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু তারা নিজেদের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি। কামানচিদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি শেষ হলেও এদের পরবর্তী বংশধরগণও কামানচি নামেই খ্যাত হয়। তারা ইসলামে বিশ্বাসী হলেও অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আরাকানীদের অনুকরণীয় জাতি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। পোষাক পরিচ্ছদে তারা আরাকানী মগদের মত. তারা উর্দু ও আরাকানী ভাষায় কথা বলে। প্রাথমিকভাবে ফারসি ভাষা চালু থাকলেও তারা আর সংরক্ষণ করতে পারেনি। আকার-আকৃতি ও স্বভাবগত দিক থেকে তারা মোগল কিংবা আফগানদের মতো। এদের সংখ্যা খুব বেশী নেই। ১৯৩১ সালের আদমশুমারী মোতাবেক এদের সংখ্যা পাওয়া যায় ২৬৮৬।[৩৯] সময়ের প্রেক্ষিতে ক্রমশ তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হবার কারণে সামাজিকভাবেও পিছিয়ে পড়ে।

৩.৩.৪ রোহিঙ্গা

রোহিঙ্গা বর্তমান বিশ্বের আলোচিত ও ভাগ্য বিড়ম্বিত একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর নাম। আরাকান রাজ্যের মুসলিম সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসেবে রোহিঙ্গাদের ভূমিকা ছিল প্রধান। কেননা আরাকানের সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর ৯০% রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। অথচ মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা মুসলমানদের নৃতাত্ত্বিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে আরাকান অঞ্চল থেকে মুসলিম সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্যকে স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।[৪০] এমনকি আরাকানের মগ সম্প্রদায় রোহিঙ্গাদেরকে আরাকানী হিসেবে পরিচয় দিতেও নারাজ।

রোহিঙ্গাদের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনায় বহুমুখী বিতর্ক ও মতামত রয়েছে। এক্ষেত্রে রোহিঙ্গারাই আরাকানের প্রথম বসতি স্থাপনকারী আরব মুসলমান হিসেবে প্রচ্ছন্নভাবে দাবী করে বলা হয়েছে যে, রহম শব্দ থেকেই রোহিঙ্গা নামের উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীতে আরাকানে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শাসনামলে বৈশালী ছিল তাদের রাজধানী। সে সময় চন্দ্রবংশীয় রাজা মহৎ-ইঙ্গ-চন্দ্রের রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১০ খ্রি.) কয়েকটি আরব মুসলিম বাণিজ্য বহর রামব্রী দ্বীপের পার্শ্বে বিধ্বস্ত হলে জাহাজের আরোহীরা রহম (দয়া) রহম বলে চিৎকার করে। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে এবং আরাকানরাজ তাদের বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত আচরণে মুগ্ধ হয়ে আরাকানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের অনুমতি দান করেন। আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ স্থানীয় লোকজন তাদেরকে 'রহম' গোত্রের লোক মনে করে 'রহম' বলে ডাকতো। ক্রমশ শব্দটি বিকৃত হয়ে রহম>রোঁয়াই>রোয়াই> রোয়াইঙ্গা বা রোহিঙ্গা নামে খ্যাত হয়।[৪১] কিন্তু আরাকান মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে জহির উদ্দিন আহমদ ও নাজির আহমদ এ বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা মনে করেন যে, রহম রহম বলে চিৎকারকারী জাহাজ ডুবি মুসলমানদের ঘটনা সত্য। তবে তা রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়ে থাম্ভইক্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কেননা আরাকানী থাম্ভইক্যা শব্দের অর্থ হলো জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষা পাওয়া। অথচ থাম্ভইক্যাগণ নিজেদের রোহিঙ্গা হিসেবে দাবী করে না। কিংবা অন্যরাও তাদেরকে রোহিঙ্গা নামে ডাকে না। যদি রোহিঙ্গা শব্দটি আরবি রহম থেকেই উদ্ভূত হতো তবে থাম্ভইক্যারাই রোহিঙ্গাদের প্রথম দল বলে পরিচিত হতো।[৪২] মূলত লেখক খলিলুর রহমান উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আরাকানের রোহিঙ্গাদেরকে কুলীন প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে তাদেরকে জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত বসতি স্থাপনকারী আরব নাবিকদের বংশধর হিসেবে দাবী করেছেন বলে তারা মন্তব্য করেন। তারা আরো উল্লেখ করেন যে, রোহিঙ্গারা আফগানিস্তানের অন্তর্গত 'ঘোর' প্রদেশের রোহা (Ruha) জেলার অধিবাসীদের বংশধর। মূলত তারা তুর্কী কিংবা আফগানী। কেননা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খল্‌জীসহ বাংলার মুসলমান বিজেতা ও শাসকগণ ইসলাম প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে আফগানিস্তানের রোহার অঞ্চলের কিছু ব্যক্তিকে আরাকানে প্রেরণ করেছিলেন। উক্ত রোহার অঞ্চলের মুসলমানরা আরাকানের নামকরণ করেছিলেন

রোহাং। এ রোহা ও রোহাং শব্দ থেকেই রোহিঙ্গা নামকরণ হয়েছে বলে তারা মনে করেন।[৪৩] তারা আরও উল্লেখ করেন যে, আরাকান ও চট্টগ্রামে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় সাধু ভাষার শ,ষ,স, মৌখিক উচ্চারণে 'হ' উচ্চারণ শোনা যায় এবং 'হ' কে শ, ষ, স, উচ্চারণ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে হয়তো রোহাং>রোসাঙ্গ হয়েছে। রোহার অঞ্চলের মুসলমানরা যেহেতু নিজেদের রোহাইন বলে পরিচয় দেয় সেহেতু আরাকানে এ রোহাইন শব্দ থেকেই রোহিঙ্গা হয়েছে বলে তারা মনে করেন।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে রোহিঙ্গাদের উৎপত্তিগত বিষয়ে দুটি মতামত পাওয়া গেল, প্রথমত; রহম>রোহিঙ্গা, দ্বিতীয়ত; রোহাইন>রোহিঙ্গা। প্রথম যুক্তিকে খণ্ডন করে দ্বিতীয় যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন লেখকদ্বয়। তারা মন্তব্য করেন যে, থাম্ভইক্যা অর্থ যেহেতু জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষা প্রাপ্ত, অতএব তারাই প্রথম বসতি স্থাপনকারী প্রথম আরব বণিক গোষ্ঠী এবং তারাই রহম বলে চিৎকারকৃত ব্যক্তিবর্গ, রোহিঙ্গারা নয়। তাদের বক্তব্যের মধ্যে যুক্তির অবতারণা থাকলেও কোন তথ্যের সন্নিবেশ নেই। তাছাড়া আরাকানে যে মাত্র একবার জাহাজ ডুবেছে তারই বা কি প্রমাণ আছে? এ ধরনের ঘটনা একাধিক বারও ঘটতে পারে। সুতরাং রহম থেকে রোহিঙ্গা কিংবা থাম্ভইক্যা জনগোষ্ঠী জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান দুটি বক্তব্যকেই আপাতত মেনে নেয়া যায়। তবে থাম্ভইক্যাদের বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসন মান্য করা কিংবা আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে তারাই যে জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষা প্রাপ্ত আরাকানে বসতি স্থাপনকারী আরব নাবিক ও বণিক তা মেনে নিতে সংশয় মুক্ত হওয়া যায়না। কেননা যদি তারা আরব বণিক ও নাবিকই হবেন তবে তাদের গোত্রের সকল লোক মাছ ধরা কিংবা জেলে হিসেবে পেশা গ্রহণের কারণ থাকতে পারেনা। তাদের মধ্য থেকে অনেকে ব্যবসায়ী ও উচ্চবিত্তশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মন্তব্য 'রোহার' অধিবাসী হেতু রোহাইঙ্গা' কথাটিও সহজে মেনে নেয়া যায় না। কেননা বখতিয়ার খলজী নদীয়া ও গৌড় বিজয় করলেও তা সর্বোচ্চ বরেন্দ্র অঞ্চল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ আরাকান সংলগ্ন অঞ্চল তখনও লক্ষ্মণ সেন এবং পরবর্তীতে অন্যান্য অমুসলিম শাসকদের হাতেই ছিল। সুতরাং শত্রুরাজ্যের উপর দিয়ে রোহার অঞ্চলের মুসলমানগণ আরাকানে ইসলাম প্রচারের জন্য যাবেন তা একটু কঠিনও বটে। তাছাড়া এটাকে যদি যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নেয়া হয় তবে লেখকদ্বয়ের কথার মধ্যে দ্বৈততা লক্ষ্য করা যাবে। কেননা তারা বলেছেন যে, খলিলুর রহমান সাহেব রোহিঙ্গাদের কুলীন বানানোর জন্য এমন কথা বলেছেন। যদি তাই হয়ে থাকে তবে আফগানিস্তানের রোহার অঞ্চলের লোক হলে কি রোহিঙ্গাদেরকে কুলীন প্রমাণ করেনা?

দক্ষিণ ও পূর্ববাংলার অপহৃত কৃতদাসদের বংশধরগণই আরাকানের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বলেও মন্তব্য পাওয়া যায়।[৪৪] ষোল শতক থেকে পর্তুগিজরা বাংলায় বাণিজ্য করার অজুহাতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। বাংলায় খুব বেশী সুবিধা করতে না পেরে

সপ্তদশ শতকে আরাকানকে তাদের কেন্দ্রস্থল হিসেবে মনে করে। আরাকানীরাও নৌবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনে পর্তুগিজদেরকে ঠাঁই দেয়। পর্তুগিজদের সংস্পর্শে ক্রমশ তারা নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে আরাকানী রাজার মৌন সম্মতিতে আরাকানী স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি পর্তুগিজদের সাথে আঁতাত করে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার নদী এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি ও মানুষ অপহরণের ব্যবসা শুরু করে। তারা প্রতি বছর জলপথে এ সব অঞ্চলে ডাকাতি করতে আসত এবং মুসলিম, হিন্দু, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র যাকেই পেত বন্দী করে নিয়ে যেত। তারা স্বীয় কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছার জন্য নৌকা ব্যবহার করত। বন্দীরা যাতে বিদ্রোহ করতে না পারে কিংবা পালিয়ে যেতে না পারে সে জন্য তারা বন্দীদের হাতের তালু ছিদ্র করে তার মধ্যে পাতলা বেত চালিয়ে তাদেরকে নৌকার ডেকের নীচে বেঁধে রাখত। এতে অনেকেই মৃত্যু বরণ করত। তদুপরি যারা বেঁচে থাকত সে সব শক্তপ্রাণ মানুষকে কৃষি কাজসহ অন্যান্য কঠিন কাজ করানোর জন্য প্রেরণ করা হতো আর কাউকে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের নিকট দাক্ষিণাত্যের বন্দরসমূহে দাস হিসেবে বিক্রি করত।[৪৫] এমন কোন অপকর্ম ছিল না যা মগ-পর্তুগিজ জলদস্যুরা করতে পারতো না। পর্তুগিজরা ও মগরা নামেই শুধু খৃস্টান এবং বৌদ্ধ ছিল। খুন, জখম, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অপহরণ প্রভৃতি পৈশাচিক ও জঘন্য কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তাদের কেউ সমকক্ষ ছিল না। তারা হাট বাজারের দিন কিংবা ধর্মীয় ও অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠানের দিনসহ যে কোন দিন তারা গ্রামে হানা দিয়ে ইচ্ছেমত লুণ্ঠন, খুন, ধর্ষণ কিংবা অপহরণ কর্মকাণ্ড পরিচালিত করত। অনেক সময় তারা গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত।[৪৬] মূলত মগ-ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারে বাংলার অনেক অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন আলেকজ্যাণ্ডার হ্যামিলটন মন্তব্য করেন -[৪৭]

> Unfortunately many of the islands near the sea had been deserted by the inhabitants on account of the plundering and kidnapping carried on by the portugese pirates of Arakan and since the islands had been abandoned to tigers., gazelles, hogs and pault grown wildt

উপর্যুক্ত বিবরণে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার হাজার হাজার নারী-পুরুষকে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুরা অপহরণ করে নিয়ে আরাকানে দাস হিসেবে বিক্রি করেছে। এমনকি ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজা থিরি থু ধম্মা ও তৎপুত্র মিনসানিকের বিধবা রানী নাৎসিনমের প্রণয়ী নরপদিগ্যী আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে নিহত আরাকান রাজের পিতৃব্য ও চট্টগ্রামের আরাকানী শাসনকর্তা মঙ্গত 'রি (Mangatrai) নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু অবশেষে ক্ষমতার জবরদখলকারী নরপাদিগ্যীর কাছে তিনি পরাজিত হয়ে মোগলদের সাহায্য নিয়ে ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকানের এই গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বাংলার প্রায় দশ সহস্রাধিক লোক মগ-পর্তুগিজদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাদের জন্মস্থানে ফিরে আসে।[৪৮] সুতরাং এ ধরনের বিশাল অংকের দাসদের বিষয় অনুমান করে কোন কোন

গবেষক মনে করেন যে, বাংলা থেকে অপহৃত দাসগণ স্থানীয় মগ রমনী বিয়ে করে আরাকানে বসবাস করে এবং তাদের ঔরসে ও মগ মহিলাদের গর্ভজাত বর্ণসংকর জনগোষ্ঠীই রোহিঙ্গা।[৪৯] কিন্তু এ ধারণা সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা যদি বাংলার অপহৃত দাসদের পরবর্তী বংশধরগণ রোহিঙ্গা হয় তবে আরাকানে ইসলামের সম্প্রসারণ কি শুধু বাংলার অপহৃত দাসদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে? অতএব এটি একটি অমূলক ধারণা। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, বাংলার আপতত মুসলিম জনগণের (দাসদের) পরবর্তী বংশধরগণ রোহিঙ্গাদের সাথে মিশে গেছে এ ধরনের বক্তব্যকে কিছুটা হলেও মেনে নেয়া যায়। কেননা মুসলমান দাসদের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে স্থানীয় মুসলিম অধিবাসীরা দয়াপরবশ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

স্থানীয় ইতিহাস বিশারদ আবদুল হক চৌধুরী মনে করেন যে, প্রধানত আরাকানে বসতি স্থাপনকারী চট্টগ্রামী পিতার ঔরসে ও আরাকানী মগ মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী আরাকানী ও চট্টগ্রামী উপভাষী মুসলমান বর্ণসংকর জনগোষ্ঠীই হল আরাকানের রোহিঙ্গা গোত্র। কালক্রমে আরাকানের রোহিঙ্গা গোত্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও পরবর্তীতে নতুন নতুন চট্টগ্রামী বসতি স্থাপনকারীদের আগমনের ফলে তাদের সংখ্যা অধিক হয়। তখন নিজেদের গোত্রের মধ্যে মুখ্যত বিয়ে-শাদী সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে তারা চট্টগ্রামী উপ-ভাষাকে আরাকানের রোহিঙ্গা গোত্রের পারিবারিক ভাষা হিসেবে চালু রাখতে সক্ষম হয়।[৫০] আরাকানে রোহিঙ্গাদের উদ্ভব সম্পর্কে তিনি তিনটি পর্বের উল্লেখ করেন।

প্রথমত, আরাকানের রাজা নরমিখলা দীর্ঘ ২৪ বছর (১৪০৬-১৪৩০ খ্রি.) বাংলার সুলতানদের আশ্রয়ে গৌড়ে অবস্থান করেন। অতঃপর সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ কর্তৃক দু'পর্বে ৫০,০০০ (২০,০০০+৩০,০০০) (পঞ্চাশ হাজার) গোড়ীয় সৈন্য দিয়ে আরাকানের রাজধানী পুনরুদ্ধার করে দিলে নরমিখলা সোলায়মান শাহ নাম দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আরাকানের পুরাতন রাজধানী লঙ্গিয়েত বারবার পরাজয়ের কারণে তার কাছে অকেজো বিবেচিত হয়। সেইসাথে বার্মার সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্য গৌড়ীয় মুসলিম সেনাপতির পরামর্শে ম্রোহং নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়। নরমিখলা মগদের বিশ্বাস করতে পারেনি হেতু নতুন রাজধানীকে সুরক্ষিত করার জন্য মগ বসতির চারদিকে গৌড়ীয় মুসলমানদের বসতি গড়ে তোলেন। এ সময়ে আগত মুসলিম সৈনিকদের পাশাপাশি পরবর্তীতে তাদের আত্মীয় স্বজন এবং বিভিন্ন পেশার শ্রমিকগণ আরাকানে বসতি স্থাপন করেন। এ শ্রমিক শ্রেণীর বেশীরভাগ লোকই ছিল চট্টগ্রামের অধিবাসী।[৫১] সুতরাং তাদের বংশধরগণই রোহিঙ্গা নামে খ্যাত হয়।

দ্বিতীয়ত, ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পঁচাশি বছরব্যাপী চট্টগ্রাম একাধিকক্রমে আরাকানের শাসনাধীনে ছিল। এ সময়টা ছিল পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার পর্তুগিজ ও আরাকানী মগ জলদস্যুদের দাস ব্যবসার কালো যুগ। তখন চট্টগ্রাম ছিল

আরাকানীদের শাসনাধীন এবং আরাকান রাজসভায় বড় ঠাকুর, মাগন ঠাকুর, আশরাফ খাঁ, সোলায়মান, নবরাজ মজলিশ, সৈয়দ মুহাম্মদ প্রমুখ বিভিন্ন পর্যায়ের মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। আরাকানের বিচারকের আসনেও অধিষ্ঠিত ছিল মুসলমান কাজি। এমনকি সেনা বিভাগেও ছিল মুসলমান সৈনিক। আরাকান রাজসভায় দায়িত্ব পালনকারী এ সকল মুসলমানগণের অধিকাংশই ছিলেন চট্টগ্রামী। সুতরাং এ সময়ে চট্টগ্রাম থেকে মানুষ চুরি করার চেয়ে তারা বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে অপহরণকার্য বেশি চালিয়েছে। পক্ষান্তরে চট্টগ্রাম-আরাকানে চাকরি ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে আরাকান যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আরাকানে অবস্থানরত গৌড়ীয় দাসগণও এদের সাথে যুক্ত হতে পারে।[৫২] সুতরাং এ পর্বেও রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধে আরাকান ইংরেজদের অধিভুক্ত হয়। তখন বাংলা-চট্টগ্রাম ও আরাকান একই শাসনভুক্ত হবার কারণে বাংলার অনেক জনগণ অস্থায়ী ও স্থায়ী ভিত্তিতে জীবিকার অন্বেষণে চট্টগ্রামে যায়। এভাবে অনেক কৃষক-শ্রমিক আরাকানে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে।[৫৩] রাজা নরমিখলার মৃত্যুর পর ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা মিনখেরী ওরফে আলী শাহ আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে আরাকান গৌড়ের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়। ফলে তখন গৌড়ের কিছু সৈনিক ফিরে এলেও অধিকাংশ সৈনিক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক আরাকানেই স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলে।

রাখাইং শব্দ থেকে রোহিঙ্গা নামের উৎপত্তি হয়েছে বলেও মন্তব্য পাওয়া যায়। তারা মনে করেন রাখাইং শব্দ থেকে রোয়াং হয়েছে এবং এ রোয়াং শব্দটি বিকৃত হয়ে রোয়াইঙ্গা শব্দের গঠন হয়েছে।[৫৪] তাদের মতে রোয়াং তিব্বতী বর্মী শব্দ যার অর্থ বুঝায় আরাকান। এ জন্য অদ্যাবধি চট্টগ্রাম জেলায় রোয়াং বলতে আরাকান এবং রোহিঙ্গা বলতে আরাকানের অধিবাসীকে বুঝায়।[৫৫] যদি এ মতকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় তবে রোঁয়াই-চাটি শব্দদ্বয়ের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দারা নিজেদের চাটি এবং আরাকান থেকে আগত ও অত্র অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারীদেরকে রোঁয়াই বলে সম্বোধন করে থাকেন। তবে রোহিঙ্গা শব্দটি রাখাইন শব্দ থেকে উৎপত্তি ধরা না হলেও রোঁয়াই বলতে আরাকান অঞ্চল বুঝায় এতে কোন সন্দেহ নেই।

রোহিঙ্গা নামের উৎপত্তি ম্রোহং শব্দ থেকে হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আরাকানের বিতাড়িত রাজা নরমিখলা ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের প্রত্যক্ষ সহায়তায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে মুহাম্মদ সোলায়মান শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি রাজধানী লংগিয়েতের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে রামু বা টেকনাফ থেকে শত মাইলের মধ্যে লেম্ব্রু নদীর তীরে ম্রোহং নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এটাই ছিল আরাকানের শেষ অবধি (১৭৮৫ খ্রি. পর্যন্ত) রাজধানী। এ ম্রোহং শব্দটি মুসলমানদের মুখে এবং লেখায় রোহাং উচ্চারিত হয়। এভাবে রোয়াং> রোহাং> রোহিঙ্গা নামকরণ হয়েছে।[৫৬] এক

কথায় বলা যায়, আরাকানের শেষ রাজধানী ম্রোহং; এর সাধারণ উচ্চারণ রোহাং। এ রোহাং এর মুসলিম অধিবাসীদেরকে রোহিঙ্গা বলা হয়।

উপরোদ্ধৃত বিবরণে এ বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয় যে, **প্রথমত,** রোহিঙ্গারা আরাকানের মূল ধারার সুন্নী মুসলমান। যদি রহম থেকে রোহিঙ্গা শব্দের উৎপত্তি ধরা হয়, তবে বলা যায় রোহিঙ্গারাই আরাকানে বসতি স্থাপনকারী প্রথম পর্যায়ের আরব মুসলিম নাবিক ও বণিক সম্প্রদায়। আরব বণিক হিসেবে এলেও তাদের বসতি নির্মাণ হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৩শত বছর পূর্বে। জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত রহম রহম বলে চিৎকার করা আরব বণিক গোষ্ঠী থাম্ভুইক্যা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কেননা বর্তমান থাম্ভুইক্যাগণ নিম্ন শ্রেণীর জেলে সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করছে, সেইসাথে ঈমান আকীদাগত দিক থেকে তারা ইসলামের বিধি বিধান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। অর্থাৎ ইসলামের সঠিক ধারণা ও চর্চা তাদের মধ্যে পাওয়া যায়না। সুতরাং আরব বণিক ও নাবিক সম্প্রদায়ের সকলেই জেলে পেশা গ্রহণ করবে কিংবা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও আমল থেকে দূরে সরে যাবে তা সহজসাধ্য বিষয় নয়। তাছাড়া চেহারাগত দিক থেকেও তাদের মধ্যে আরবীয় কোন নিদর্শন পাওয়া যায়না। পক্ষান্তরে রোহিঙ্গাদের ঈমান-আকিদা, জীবন পদ্ধতি এমনকি চেহারাগত দিক থেকেও কিছু কিছু লোককে আরবীয় বলে অদ্যাবধি মনে করা যায়।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানগণ প্রচারধর্মী (মিশনারী) জাতি হিসেবে ইসলাম প্রচারের জন্য অনেক দূর-দূরান্ত ও শত্রুবেষ্টিত পথও অতিক্রম করতে পারে। এদিক বিবেচনায় বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পরে গৌড় থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য আরাকানের দাওয়াতি মিশন নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। এ রকম বিচ্ছিন্নভাবে কিছু তৌহিদবাদী মুসলিম দীন প্রচারে আরাকানে গেলে তারা আরাকানী মুসলমানদের পূর্ব পুরুষ কিংবা সহযাত্রী হবে। কিন্তু সুদূর আফগানিস্তানের রোহার অঞ্চল থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আরাকানে এবং এ রোহার থেকে রোহিঙ্গা নামকরণ হওয়া বিষয়টি সমর্থন যোগ্য নয়।

তৃতীয়ত, রোহিঙ্গারা বাংলা থেকে অপহৃত ও আরাকানে দাসরূপে ব্যবহৃত জনগোষ্ঠীর অধস্তন পুরুষ বিষয়টির সাথেও একমত হওয়া যায় না। যদি এরাই রোহিঙ্গা হয় তবে নরমিখলা কর্তৃক আরাকান রাজ্য পুনরুদ্ধার করার সময় বাংলা থেকে প্রেরিত ত্রিশ হাজারের অধিক মুসলিম সৈন্য এবং সমসাময়িককালে আগত ব্যবসায়ীগণ কোথায় গেল? অথচ আরাকানের সমগ্র জনগোষ্ঠীর ৯০% রোহিঙ্গা।

সুতরাং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ম্রোহংয়ের অধিবাসী হবার কারণে আরাকানের মুসলমানগণকে রোহিঙ্গা বলা হয়ে থাকে।[৫৭] অতএব আরব বণিক, নাবিক, ইসলাম প্রচারক, রোহার থেকে আগত ইসলাম প্রচারক, গৌড়ীয় মুসলিম সৈন্য, বাংলায় অপহৃত দাসগণসহ অধিকাংশ মুসলমানই রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচিত। এখানে প্রশ্ন

উঠতে পারে যে, তাহলে সমসাময়িক লেখকদের লেখায় রোহিঙ্গা শব্দটি পাওয়া যায় না কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বাংলার অধিবাসী হবার কারণে যেমন বাঙ্গালী বলা হয় অথচ বাঙালীর হাজার হাজার বছর পূর্বের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরা হলেও বাঙালী শব্দের প্রয়োগ সমসাময়িক লেখকদের লেখায় পাওয়া যায় না। বলা চলে বাঙালী কথাটিও আধুনিক কালের প্রয়োগ। অথচ আধুনিক কালের প্রয়োগ হলেও যেমন বাঙালীর ইতিহাস হাজার বছরের তেমনি রোহিঙ্গা শব্দটি আধুনিক কালের হলেও রোহিঙ্গাদের ইতিহাসও হাজার বছরের চেয়েও পুরনো। এরা পরিচয়হীনভাবে বেড়ে ওঠা কোন জনগোষ্ঠী নয়। মূলত রোহিঙ্গারাই আরাকানের স্থায়ী ও আদি মুসলমান।

৩.৪ আরাকানী মুসলমানদের অবস্থানগত বিন্যাস

সত্য, সুন্দর ও মননশীলতার ধারায় সমাজ জীবন গঠন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তির কোন বিকল্প নেই। রাষ্ট্র সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণের প্রধান শক্তি; আর রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো বিনির্মাণের প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন রাষ্ট্রের অধিকর্তাগণ। তারা যে বিশ্বাস ও রুচিবোধের লালন করবেন রাষ্ট্র ও সমাজ সেই ধারায় চলতে থাকে। কেননা রাজা তথা শাসক যেমন রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি তেমনি তিনি সমাজেরও প্রধান। মধ্যযুগের শাসকগণ যেমন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতেন তেমনি সমাজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জনগণের অভিভাবক হিসেবে নিজেকে দায়িত্ববান মনে করতেন। সেইসূত্র ধরেই রাজ্যে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর[৫৮] উদ্ভব হয়, আরাকানেও এর থেকে ভিন্ন কিছু ঘটেনি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আরাকানে নতুন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড শুরু হবার পর সেখানকার শাসকগণ গৌড়ীয় মুসলিম শাসকদের অনুকরণে রাজ্য শাসনের চেষ্টা করেছেন। দরবারের আদব কায়দা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি সামরিক প্রশাসনের বিন্যাসেও গৌড়ীয় অনুকরণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ফলে বাংলার সমাজব্যবস্থার মত আরাকানেও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সোলায়মান শাহ কর্তৃক মুসলিম প্রভাবিত প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরাকানে সাধারণত দুই শ্রেণীর সামাজিক বিন্যাস প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রথমত; উচ্চ শ্রেণী, দ্বিতীয়ত; মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আরাকানের শাসন ক্ষমতায় রাজার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আরাকানের ম্রাউক-উ-বংশের প্রায় তিনশত পঞ্চান্ন বছরের শাসনামলে (১৪৩০-১৭৮৫ খ্রি.) আরাকানের আটচল্লিশ জন রাজা ছিলেন এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তারা রাজ্যে ইসলামি প্রভাব বিস্তারে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করলেও বাস্তবায়নকারী শক্তি হিসেবে মৌলিকভাবে ভূমিকা রাখেননি। সুতরাং আরাকানী মুসলিম সমাজের মধ্যে এরা অন্তর্ভুক্ত নয়। সেইসূত্রে এখানকার মূল আলোচিত বিষয় হচ্ছে মুসলিম সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

আরাকানের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' হিসেবে উল্লেখ করলেও তাদেরকে আরো কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়, যেমন ক. অমাত্য শ্রেণী, খ. উলামা ও

বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, গ. সেনা ও সাধারণ কর্মচারী, ঘ. বণিক ও ভূস্বামী, ঙ. সাধারণ ও ক্রীতদাস শ্রেণী।

৩.৪.১ অমাত্য শ্রেণী

আরাকানী মুসলিম সমাজের সবচেয়ে অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করতেন অমাত্যগণ। সেখানকার রাজাগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সময় মুসলিম নাম গ্রহণ করলেও বাস্তব জীবনে তারা ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতেন না। তবে প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামি অনুশাসন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা সহায়ক শক্তি হিসেবে সমর্থন যুগিয়েছে। মূলত সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলামি বিধি বিধান বাস্তবায়নের মূল ভূমিকায় ছিলেন আরাকানী মুসলিম অমাত্যগণ। মূলত আরাকানী সমাজে ইসলামের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তারাই ছিলেন মূল ব্যক্তি।[৫৯] সমসাময়িককালে এবং পরবর্তীতে বুরহান উদ্দিন, আশরাফ খান, বড় ঠাকুর, মাগন ঠাকুর, মোহাম্মদ সোলায়মান, সৈয়দ মুসা, সৈয়দ মুহাম্মদ খান, নবরাজ মজলিশ প্রমুখ মন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ তৎপরতায় আরাকানে রাজদরবারে খানিকটা ইসলামি পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা দিল্লী ও গৌড়ে মুসলিম শাসনকর্তাদের অনুকরণ করে দরবারে আমীর-ওমরাহ পদ্ধতি চালু করেন। সেই সাথে জেনানা মহল, ক্রীতদাস ও জল্লাদ প্রথার প্রচলন করেন।[৬০] এ জাতীয় বহুবিধ নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আরাকানী রাজদরবার মুসলমানী প্রথায় পুনর্গঠিত হয়। এমনকি রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানেও মুসলিম মন্ত্রীদের দ্বারা মুসলিম রীতিতে শপথ বাক্য পাঠ করানো হতো।

আরাকানী সমাজে মুসলমানদের একটি বড় পাওয়া ছিল ইসলাম অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা। ইসলামের বিচার প্রথার প্রবর্তনের মধ্যদিয়ে আরাকানের ইসলামকে সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়। ইনসাফভিত্তিক বিচার নিশ্চিত করার জন্য আরাকানের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম বিচারক নিযুক্ত করা হয়।[৬১] সাধারণ বিচারকদেরকে 'কাজি' এবং প্রধান বিচারককে 'কাজিউল কুজ্জাত' বলা হতো। যে ক'জন কাজি আরাকানের ইতিহাসে বিচারব্যবস্থায় খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে দৌলতকাজী, নালা কাজী, গাওয়া কাজী, শুজা কাজী, আবদুল করিম কাজী, কাজী মুহাম্মদ হোসেন, কাজী ওসমান গনী, কাজী আবদুল জব্বার, কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ, কাজী রওশন আলী ও কাজী নূর মোহাম্মদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬২] আরাকানের সাদাপাড়ায় শুজা কাজীর পাকা মসজিদ ও ঘাট বাঁধা পাকা পুকুরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। এ কাজিগণও আরাকানী অমাত্যের অন্যতম সদস্য বলা যায়।

৩.৪.২ উলামা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী

জ্ঞানার্জনকে ইসলামে ফরজ করা হয়েছে। জ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব দেবার কারণে ইসলামে আলিম বা জ্ঞানীদের অনেক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আরাকানী সমাজেও আলিম ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উপযুক্ত মূল্যায়ন করা হতো। আরাকানের মুসলিম সমাজে এঁরা

ছিলেন উচ্চশ্রেণির প্রভাবশালী সম্প্রদায়। সরকারি পদমর্যাদা কিংবা অঢেল সম্পদ না থাকলেও ধর্মানুরাগ, বিদ্যা এবং আদর্শ চরিত্রের জন্য তারা সমাজে উচ্চতম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও সম্মান তাদেরকে সামাজিক মর্যাদার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। জনসাধারণ তাদের নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে কল্যাণ পাবার আকাঙ্ক্ষায় আলিমদের ফতুয়া ও আদেশ-উপদেশ শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলার চেষ্টা করত এবং বাস্তবতার নিরিখে তাদের ধর্মীয় নির্দেশের অনুসরণ করত। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের পথ প্রদর্শক হিসেবে তাঁদের মর্যাদা এবং ইসলামের সুমহান জ্ঞান তাদেরকে সামাজিক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করত। আলিমগণের মধ্যে যারা সৈয়দ বংশীয় তারা লোকচোখে ও সামাজিক মর্যাদায় সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমনকি মুসলিম অমাত্যগণ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং সম্মানস্বরূপ ভূমি ও বৃত্তি প্রদান করেছেন।[৬৩] উলামা ও বুদ্ধিজীবীদের মূল্যায়নের মধ্যদিয়ে আরাকানী মুসলিম সমাজে জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আরাকানী মুসলমানরা মনে করেন একজন বিদ্বান ব্যক্তি হাজার সাধারণ ইবাদতকারীর চেয়ে শ্রেয়। বিদ্বান ব্যক্তিকে শয়তান এত বেশী ভয় করে যে, সে তার সামনে আসতে সাহস করে না। অথচ এ শয়তান বহু অশিক্ষিত ব্যক্তিকে ধ্বংসের পথে টেনে নেয়। মহানবি (স.) এর হাদিসকে সামনে রেখে তারা আরো মনে করেন যে, যে লোক সাতদিন কোন বিদ্বান ব্যক্তির সেবা করবে সে হাজার বছর আল্লাহর ইবাদতের এবং এক হাজার শহীদের সওয়াব লাভ করবে। একজন আবিদ (ইবাদতকারী ব্যক্তি) ইবাদতের মাধ্যমে কেবল তার নিজের মুক্তি লাভ করে কিন্তু একজন বিদ্বান লোকের সংস্পর্শে হাজার হাজার লোক মুক্তি পেয়ে থাকে। সুতরাং তারা মনে করে যে, বিদ্বানের সেবা করলে দোজখের আগুন থেকে অব্যাহতি পেয়ে জান্নাত লাভ করা যাবে।[৬৪] সাধারণ মানুষের পাশাপাশি উলামা ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে শাসকগণ সম্মান করতেন এবং তাদেরকে উচ্চাসন দান করতেন। বিশেষত সমসাময়িক জীবনে ন্যায় বিচার, আইন ও নীতিশাস্ত্রীয় বিষয়াদির সঙ্গে সংযুক্ত কাজি, মির, আদল, মুহতাসিব বা লস্কর উজির এবং রাজ্যের অন্যান্য বিভিন্ন পদে উলামা ও শাস্ত্রবিদ বুদ্ধিজীবীদেরকেও নিয়োগ দেয়া হতো। মূলত এরা ছিলেন ইসলামি শরিয়তের তত্ত্বাবধায়ক এবং সমাজের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের অভিভাবক। তারা এসকল পদসমূহে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে সমাজে তাদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা ছিল। তারা শাসকদেরকে কোন ধর্মীয় ও আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন। কবি আলাওলের ভাষায় -

শ্রীযুক্ত সোলায়মান আলিমের ভক্ত / শাস্ত্রকথা নীতিধর্মে সদা অনুরক্ত ॥
আয়ু-বৃত্তি-কৃতি-বুদ্ধি বাড়ুক নিত্য নিত / ঈশ্বর ভাবেত চিত্ত রহুক অতুলিত ॥[৬৫]

জনসাধারণ থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কারণে আরাকানী সমাজে আলিম ও বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক মর্যাদা ও জীবন যাত্রার মানও ছিল অনেক উন্নত। সেইসাথে অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বুদ্ধিজীবী মহল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, সতী

ময়না ও লোরচন্দ্রানী, শরিয়তনামা প্রভৃতি অসংখ্য মূল্যবান রচনা উপহার দিয়েছেন। মহাকবি দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, নসরুল্লাহ খোন্দকার প্রমুখ প্রথিতযশা কবি সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী শুধু বাংলা ভাষাকে নয় আরাকানের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সামাজিক চিত্রকে যেমন চিরঞ্জিব করে রেখেছেন তেমনি বাস্তব চরিত্রেও বুদ্ধি চর্চা এবং দ্বীনি আমলের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। গবেষক অমৃতলাল বালার ভাষায় "প্রকৃতপক্ষে রোসাঙ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির এত বৈভব-ঐশ্বর্য, বিষয়-বৈচিত্রের বিকাশ মূলত মুসলিম অবদানের ফল। কবিরা ছিলেন ধার্মিক মুসলমান, সুফী ধর্মাবলম্বী সাধক, তাঁদের পৃষ্ঠপোষক আশ্রয়দাতা ও আদেশদাতারাও ছিলেন একই পথের পথিক।"[৬৬] সুতরাং বলা যায় যে, উলামা ও বুদ্ধিজীবী মহল যেমন বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুসারী ছিলেন তেমনি তাদের আদেশদাতা, আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ আরাকান অমাত্যসভার সদস্যগণও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী ছিলেন, ফলে সমাজে ইসলামের প্রসার ও প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

আলিমগণ আরাকানী সমাজে মুসলমানদের শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন। গৌড়ীয় প্রভাবে আরাকানী মুসলিম সমাজে বিদ্যা শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করা হতো। বিশেষ করে মুসলিম পরিবারের সন্তানকে অবশ্যই মক্তব, মসজিদ কিংবা ইমাম বাড়ায় ইসলামের বিধিবিধান জানার জন্য কোরআন ও হাদিস পড়তে হতো। শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদেরও উৎসাহিত করা হতো। সাধারণত পাঁচ বছর বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হতো। কবি আলাওলের ভাষায় -

পঞ্চম বরিষ যদি হইল রাজবালা / পড়িতে গুরুর স্থানে ছিল ছত্রশালা ॥[৬৭]

অন্যান্য জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আরাকানী মুসলমান ছেলে মেয়েরা যাতে নামাজ রোজাসহ ইসলামের আনুষঙ্গিক বিষয় জানতে আগ্রহী হয় এজন্য সমাজের বুদ্ধিজীবী মহল বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করত। কবি আলাওলের ভাষায় -

তালিব-এলম দেখি হীন জ্ঞান করে / না যাইব তার ইমান সঙ্গেতে আখেরে ॥
গুরু এ শিশুরে যদি বিসমিল্লাহ পড়াএ / গুরু মাতা পিতা শিশু ভেহেস্তেত যাএ ॥
পড়নে যাইতে যথ ধুলা লাগে পাএ / নরক হারাম তার করন্ত খোদা এ ॥[৬৮]

সত্যিকার অর্থে ইসলাম হচ্ছে মানব জীবনের অগ্রগতি এবং আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে মানবতার পূর্ণতা লাভের বিধান। ইসলাম ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে নতুন ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছে এবং ইতিহাসে একটি বিরাট বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির প্রবর্তন করেছে। মানুষের দেহমন উভয়বিধ উন্নতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির জন্য প্রত্যেক নারী পুরুষকে শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এ দায়বদ্ধতা থেকেই আরাকানী উলামা ও বুদ্ধিজীবীগণ জ্ঞান চর্চার জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

৩.৪.৩ সেনা ও সাধারণ শ্রেণী

বাংলার সুলতান কর্তৃক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সোলায়মান শাহকে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় সৈনিকদের একটি বিরাট অংশ আরাকানের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তী সময়েও সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। এমনকি রাজার অভিষেকের সময়ও মুসলমান সৈনিকগণই নেতৃত্ব দিতেন।[৬৯] মেধা ও প্রতিভা বলে মুসলমানগণ সামরিক বাহিনীতে সাধারণ পদ থেকে শুরু করে সামরিক কমান্ডার পদ পর্যন্ত অলংকৃত করেছেন। কর্মচারীর আভিজাত্য মেধাভিত্তিক ছিল, কিন্তু একথাও বলা যাবে না যে, পারিবারিক সম্পর্ক কিংবা আত্মীয়তার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হতো অথবা অভিজাত সন্তানদের চাকরি জীবনের ক্ষেত্রে এর কোন গুরুত্ব ছিল না। একজন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ভালো শিক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করত এবং প্রভাবশালী পিতার পৃষ্ঠপোষকতা পেত। একজন অভিজাতের পক্ষে তাঁর সন্তানদের সরকারি চাকুরি ও সামরিক বিভাগে অপেক্ষাকৃত ভাল মর্যাদার জন্য প্রভাব প্রয়োগ করা খুব অস্বাভাবিক ছিলনা। সামরিক বিভাগের উচ্চপদে নিয়োগ কিংবা পদোন্নতির ক্ষেত্রে শাসকগণ প্রার্থীর পরিবারের ঐতিহ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিবেচনা করতেন। তাঁরা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদেরকে দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা বিশেষভাবে বিবেচনা করতেন। যার ফলে লক্ষ্য করা যেত যে, অনেকে বংশানুক্রমিকভাবে সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। যেমন - কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের পূর্ব পুরুষ বোরহান উদ্দিন ছিলেন আরাকানের সামরিক মন্ত্রী, অতঃপর তারপুত্র ইবরাহীম, স্বীয়পুত্র সুজাউদ্দীন, স্বীয় পুত্র শেখরাজা প্রমুখ সবাই ছিলেন বংশ পরম্পরায় সামরিক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।[৭০] সেইসাথে কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন সিদ্দিক বংশের শেখ জাদা[৭১] এবং তাঁর পিতা বড় ঠাকুর ছিলেন রাজসৈন্যমন্ত্রী।[৭২] কোরেশী মাগন ঠাকুরও আরাকানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া রাজ্যের অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করা হতো। সামরিক বেসামরিক বিচার বিভাগীয় ও রাজস্ব শাসনের নিম্ন পদস্থ কর্মচারীরা ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান শাখা। এ বিভাগে মুসলিম সমাজের বেশীরভাগ মানুষ কর্মজীবী ছিল। এদের মধ্যে স্থপতি, শিল্পী, কারিগর, অন্যান্য উৎপাদকগণ তুলনামূলকভাবে এলিট বা বুদ্ধিবৃত্তিক পেশার ব্যক্তিদের কাছাকাছি পর্যায়ে ছিলেন।

৩.৪.৪ বণিক ও ভূস্বামী

ভারতীয় উপমহাদেশসহ পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্ব সম্পাদিত হয়েছিল আরব মুসলিম বণিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে। আরব বণিকগণ ইসলাম প্রচার মিশনকে কার্যকর ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্যিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেন। সেইসূত্রে তৎকালীন আরাকানের চট্টগ্রাম ও আকিয়াব অঞ্চলেও আরব বণিকদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। মৌসুমী বায়ুর অপেক্ষা ও জাহাজ মেরামতের জন্য বণিকদেরকে অনেক সময় ছয় মাসের

অধিককাল বন্দরে অপেক্ষা করতে হতো। এ সময় তারা ইসলাম প্রচারের কাজ চালাতেন। এ দীর্ঘ বাণিজ্য পথে তারা স্ত্রীদের সাথে আনতে পারতেন না বলে আরাকানে দ্বিতীয় বসতি গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করতেন। কিন্তু বর্মী আইনে স্ত্রী পুত্রদের স্বদেশে নিয়ে যাওয়া নিষেধ হেতু অনেকেই এখানে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে। এভাবে তারা ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানের বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহে মুসলিম উপনিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। সোলায়মান শাহ কর্তৃক ম্রোহংয়ে রাজধানী স্থাপিত হবার ফলে লেম্ব্রু নদীর তীরস্থ বন্দর হয়ে ওঠে আরাকানের প্রধান বাণিজ্যিক বন্দর। এখানে মুসলিম বণিকগণ স্বাধীন রাজ্যে মুসলিম প্রভাবিত প্রশাসনের সুবাদে নির্বিঘ্নে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে থাকে। ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক সাফল্যে অচিরেই রওয়ামা, নেদাপাড়া, মোয়াল্লেম পাড়া, সম্ফুচিক, কুয়ি পাড়া প্রভৃতি নামে মুসলিম বণিক প্রভাবিত বসতি গড়ে উঠে।[৭৩] বন্দরের নিকটবর্তী বসতিসমূহের মধ্যে তাদের নির্মিত পাকা মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে।

আরাকানী সামুদ্রিক বাণিজ্যে মুসলমানদের প্রাধান্য ও সফলতায় ক্রমশ; আরাকানের নদী নির্ভর ব্যবসা বাণিজ্যও মুসলমানদের হস্তগত হয়। ফলে আরাকানের নদীগুলোর দু'ধারে মুসলিম বণিকদের বসতি ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে। বিশেষ করে লেম্রু, মিংগান, কালাদান, মায়ু, নাফ প্রভৃতি নদীর দুই তীরে মুসলিম বসতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।[৭৪] আরাকানের মুসলমানদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড জনপ্রিয় হবার কারণে এমন প্রথা শুরু হয়েছিল যে, তিনবার বাণিজ্য ভ্রমণ না হয়ে থাকলে কোন যুবককে কর্মঠ মনে করা হতো না। এমনকি কুমারীরা এরূপ বর পছন্দও করত না। এ প্রথা ঊনবিংশ শতাব্দির শেষাবধি বর্তমান ছিল।[৭৫] ফলে আরাকানী সমাজে বণিক মুসলমানগণ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল। অনেক মুসলমান বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে আরবীয় গৌরব মনে করে নিজেকে উচ্চ শ্রেণীর কুলীন হিসেবে উপস্থাপন করতেন।

আরাকান মূলত কৃষি প্রধান অঞ্চল। প্রাকৃতিক ও কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধির কারণেই হয়তো আরাকানের রাজধানীর নাম ছিল ধন্যাবতী। কৃষি পেশায় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নিয়োজিত থাকলেও পরবর্তীতে মুসলমানগণ কৃষির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহলের কেউ কেউ প্রচুর পরিমাণে জমি খরিদ করে এক পর্যায়ে ভূস্বামী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ভূস্বামীরাও নিজেদেরকে সমাজের অত্যন্ত উচ্চশ্রেণির ব্যক্তি বলে মনে করতেন।

৩.৪.৫ ক্রীতদাস ও সাধারণ শ্রেণী

ক্রীতদাস একটি প্রাচীন প্রথা। এ প্রথা হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম প্রভাবিত শাসনে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের মত আরাকানেও প্রচলিত ছিল। মূলত আর্যদের সময়

থেকে ক্রীতদাস প্রথা শুরু হয়। অনার্যগণ বিজিত অঞ্চলের আর্যদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করেন।[৭৬] অন্যদিকে পবিত্র কুরআনে সুরা ইউসুফে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ক্রীতদাসে পরিণত করার ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য স্থানের মত আরাকানেও যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসত্বে পরিণত করা ছিল একটি প্রচলিত রীতি। যুদ্ধাভিযানে হামলাকালে যে সকল শত্রুসৈন্য বা বিদ্রোহী ধরা পড়তো তাদেরকে ক্রীতদাসরূপে গণ্য করা হতো। এরা বিজেতাদের সম্পত্তি ছিল। বিজয়ীরা হয়তো এদেরকে নিজেদের জন্য রেখে দিত নতুবা বাজারে বিক্রি করে দিত। মধ্যযুগে পর্তুগিজদের সাথে যোগ সাজস করে আরাকানী মগরা বাংলার বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে নারী পুরুষ যাকেই পেত অপহরণ করে নিয়ে যেত। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে তারা বেশী অত্যাচার করত। এছাড়া বর্ষাকালে অনেক সময় তারা নৌপথে বাংলার অভ্যন্তরে ঢুকে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং অপহরণ করে নির্বিঘ্নে নিরাপদে ফিরে যেত। মগদের এ পৈশাচিক অত্যাচার বাংলায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত।[৭৭] ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খানের সময় পর্তুগিজ অধিকৃত সন্দ্বীপ এবং আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রাম মোগল বাহিনী কর্তৃক বিজিত হলে এ উৎপীড়ন অনেকাংশে বন্ধ হয়।

বাংলা থেকে অপহৃত এ সকল দাসদাসীদের অনেককে বিভিন্ন দেশে বিক্রি করত। অবশিষ্টাংশ দাসদাসীকে আরাকানের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় কৃষি উপযোগী করে ভূমি তৈরী ও শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষি কাজে নিযুক্ত করত। আরাকানের পতন যুগে অপহৃত বহু বাঙালী দাস-দাসী সুযোগ বুঝে তাদের জন্মস্থানে পালিয়ে এসেছে।[৭৮] কেউ কেউ ভাগ্যকে বরণ করে নিয়ে স্থানীয়ভাবে বিয়ে করে বসতি স্থাপন করে। এরা সামাজিকভাবে অত্যন্ত নিগৃহীত শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হতো। এছাড়াও দাস-দাসীদের মধ্যকার সুন্দর চেহারা সম্বলিত লোকদেরকে রাজ প্রাসাদের রাজা-রানী, শাহজাদা, শাহজাদী প্রমুখের সেবার জন্য রেখে দেয়া হতো। এমনকি 'জেনানা মহল' এর সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য নারী, পরিদর্শিকা ও কর্মচারী এ দাস দাসীদের মধ্য থেকেই নিয়োগ করা হতো।

কৃষক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পী, ছোট ছোট ব্যবসায়ী, অদক্ষ কারিগর, কৃষি ও শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক, তথা জেলে, চাষি, মুটে, মাঝি প্রভৃতি পেশার লোকদের নিয়ে গঠিত সমাজের সাধারণ শ্রেণী। আরাকান রাজ্যে প্রাথমিকভাবে কৃষিজীবী হিসেবে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তবে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও বাংলাসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগমনকারী অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল মুসলমান ব্যক্তিগণ এ সব পেশায় নিয়োজিত হতো। এসব পেশার বহিরাগত মুসলমানগণ ছিলেন মূলত অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। তারা যে কোন সময় নিজেদের অঞ্চলে ফিরে আসত।

৩.৫ আরাকানী মুসলমানদের সামাজিক উৎসব ও লোকাচার

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুপ্রাচীনকালে যখন আল পাইন, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট চীনা, মঙ্গল প্রভৃতি গোত্রের সংমিশ্রণে আরাকান ও চট্টগ্রামের আদিম জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল তখন স্ব স্ব গোত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে এখানকার লোকসংস্কৃতি ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক উৎসব পালিত হতো। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে আরাকানে চন্দ্রসূর্য বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার আদিম জড়োপাসক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম আর্য ধর্ম, সভ্যতা সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপির প্রচলন ঘটে। আরাকানের আদিম জনগোষ্ঠীর সাথে আর্য রক্ত সংমিশ্রিত হয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ কালে তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের আচার অনুষ্ঠান ও সামাজিক রীতিনীতিসমূহ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল। অতঃপর সোলায়মান শাহ কর্তৃক আরাকানে গৌড়ীয় মুসলিম প্রভাবিত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সময় (১৪৩০-১৪৩৪ খ্রি.) বাংলা (গৌড়ীয়) এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের ভাগ্যান্বেষী মুসলমানেরা আরাকানে প্রতিষ্ঠা পেলে সেখানে ইসলামি আচার–অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে নতুনভাবে সামাজিক উৎসবের সূচনা হয়। বিশেষকরে মুসলমানদের উন্নত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষিত হয়ে এ এলাকার অনেক হিন্দু-বৌদ্ধ ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে। সেইসাথে অনেক মুসলমান স্থানীয় মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে আরাকানে মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আর তৎকালীন বিশ্বের সর্বোন্নত আরব ও গৌড়ীয় মুসলমানদের আকর্ষণীয় সামাজিক রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান আরাকানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকাল থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম এবং ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ চট্টগ্রাম বেশীরভাগ সময় আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই চট্টগ্রাম ও আরাকানী মুসলমানদের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে মৌলিক মিল পরিলক্ষিত হয়।

মুসলমানদের সামাজিক উৎসবগুলো ইসলামের বিধিবিধান পালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এর বাহ্যিক অনুশাসনসমূহই সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। তাই আরাকানে নামাজ, রোযা, যাকাত-দান খয়রাত, ঈদ উৎসব, পর্দা প্রথা প্রভৃতি পালনের মধ্য দিয়ে যেমন মুসলমানদের সামাজিক আচরণ প্রকাশ পায়, তেমনি জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু প্রভৃতির মাধ্যমেও স্বাতন্ত্রিক সামাজিক বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর সকল মুসলমানই প্রায় একই পদ্ধতিতে এ উৎসবগুলো পালন করে থাকে। তবে স্থান, কাল, পাত্র এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ভিন্ন হবার কারণে সে সবেও অনেক সময় অমুসলিম আচরণ প্রবেশ করে। অন্য অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে শুধুমাত্র আরাকানী মুসলমানদের সামাজিক রীতিনীতির সম্যক ধারণা উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হল।

৩.৫.১ নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত : দ্বীনি অনুষ্ঠান

ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ বাধ্যতামূলক হলেও বাহ্যত নামাজ, যাকাত, রোযা ও হজ্জকে মৌলিক ইবাদত হিসেবে

চিহ্নিত করা হয়। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করে বাস্তবায়নের জন্য কড়া তাকিদ দেয়া হয়েছে।[৭৯] হাদিসেও মহানবি (স.) এগুলোকে ইসলামের ভিত্তি বলে উল্লেখ করেছেন।[৮০] আরাকানী মুসলিম সমাজে তাই এ সকল মৌলিক ইবাদতকে ভালভাবে গুরুত্বের সাথে আদায় করা হতো।

জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করা মহান আল্লাহর নির্দেশ।[৮১] আরাকানী সমাজে মুসলমানগণ মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করতেন।[৮২] যার ফলে দেখা যায় যে, সোলায়মান শাহ আরাকানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর আরাকানে সিন্ধি খান[৮৩] নামে সমসাময়িক কালের অত্যাধুনিক স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। রোজা ও যাকাতের ক্ষেত্রেও আরাকানী মুসলমানগণ অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন।[৮৪] হজ্জ্বকার্য সম্পন্ন করা তৎকালীন সময়ে অত্যন্ত কষ্টকর হলেও আরাকানের মুসলমানগণ হজ্জব্রত পালন করতেন। সেখানকার আশরাফ খানসহ অধিকাংশ মুসলিম অমাত্য হজ্জ্বব্রত পালন করেছিলেন। এমনকি বাংলার সুবেদার শাহজাদা মোহাম্মদ শুজা আরাকানে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখান থেকে মক্কায় হজ্জব্রত পালন করতে যাবার ইচ্ছাকে বাস্তাবায়নের জন্যই। সুতরাং বলা যায় যে, আরাকানী সমাজে মুসলমনগণ ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট থাকতেন।

৩.৫.২ পার্বণিক উৎসব

আরাকানের মুসলিম সমাজে বিভিন্ন পার্বনিক অনুষ্ঠানসমূহও ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধানকে কেন্দ্র করেই পালিত হতো। বিশেষ করে ঈদ, শব-ই-বরাত, লাইলাতুল কদর, আশুরা প্রভৃতি উৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে উৎসবের আমেজে অনুষ্ঠিত হতো। এ সকল উৎসবই পালিত হতো চন্দ্রমাসের তারিখ অনুসারে। মুসলমানদের সকল উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দঘন হিসেবে পালিত হতো ঈদ। ঈদ অনুষ্ঠান বছরে দু'বার পালিত হতো। রমযান মাসের রোজার পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিনের উৎসবকে বলা হয় 'ঈদুল ফিতর' এবং জিলহজ্জ মাসের দশম দিবসে কুরবানীর যে উৎসব পালিত হয় তাকে বলে 'ঈদুল আজহা'। রোজার শেষ দশকে ঈদের আমেজ শুরু হয়ে যেতো। রোজার শেষ দিনের সন্ধ্যার চাঁদ দেখার আনন্দ ঈদকে প্রাণবন্ত করে তুলতো। ঈদের দিনে সমস্ত মুসলমান আনন্দ স্ফূর্তিতে মশগুল থাকতো। স্ত্রী-পুরুষ, বালক বালিকা, নির্বিশেষে প্রত্যেকে নতুন এবং উন্নতমানের জামা কাপড় পরিধান করতো। চমৎকার পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে মুসলমানগণ সকালে ঈদগাহে শোভাযাত্রা করে গমন করতো। ধনীক শ্রেণীর ব্যক্তিরা পথে পথে টাকা পয়সা ও উপহার দ্রব্য ছড়িয়ে দিত এবং সাধারণ অবস্থার মুসলমানগণ গরিবদেরকে ভিক্ষা দিতো। এক বড় জামায়াতে মুসলমানগণ ঈদের নামাজ পড়তো এবং আনন্দ উৎসাহের সঙ্গে একে অন্যকে অভিবাদন জানাতো।[৮৫] ঈদ উৎসবে গরীব ধনী সবাই যাতে সমভাবে উদযাপন করতে পারে এ জন্য রোজাদার মুসলমানগণ সবাই 'ফিতরা' দিতেন।[৮৬] ঈদের আগেই এ ফিতরা বণ্টন করার নিয়ম ছিল।

ত্যাগের উৎসরূপে মুসলমানগণ ঈদ-উল-আজহা উদযাপন করে থাকেন। এর উৎপত্তি হয়েছে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সুন্নত থেকে। আল্লাহর সন্তোষ হাসিলের জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আ.) কে কুরবানী দেবার প্রত্যয়ী হয়েছিলেন। এই সুন্নত সমুন্নত রাখতে হযরত মুহাম্মদ (স.) এ রীতি চালু করেন। সেই সূত্রেই মুসলমানগণ ১০ই জিলহজ্জ মাসের সকালে সুন্দর জামা কাপড় পরিধান করে তাকবীর[৮৭] উচ্চারণ করতে করতে সকলে একসাথে ঈদগাহে গিয়ে থাকেন। আরাকানের মুসলিম সমাজে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঈদ উৎসব পালন করা হতো। নামাজ শেষে ঘরে ফিরে আর্থিক স্বচ্ছলতা অনুসারে গরু, ছাগল, উট প্রভৃতি কুরবানী করা হতো। এ দিনে অতিথি আপ্যায়ন ছিল উৎসবের অন্যতম আমেজ।

'শবে বরাত ও লাইলাতুল কদর' এ দুটি মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র ও পূণ্যময় উৎসব। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে লাইলাতুল কদরের মূল্যায়ন শবে বরাতের চেয়ে অনেক বেশী হলেও সামাজিক আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে শবে বরাতের দিনেই বেশী উৎসব পালিত হতো আরাকানের মুসলমানদের মধ্যে। মূলত লাইলাতুল কদর হচ্ছে পবিত্র কুরআন নাজিলের রজনী। এ রাতেই মানুষের ভাগ্যের বাজেট নির্ধারিত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে এই রাত্রিকেই হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।[৮৮] এ রাত্রিটি পবিত্র রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে আসে। তাই এটি অনুসন্ধানের জন্য প্রত্যেক রাত্রেই ইবাদত করার নির্দেশ রয়েছে।[৮৯] পক্ষান্তরে শবই বরাত সম্পর্কে শরিয়তে খুব বেশী গুরুত্ব না থাকলেও আরাকানী মুসলমানদের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, 'শব-ই-বরাতে'র রাত্রে আল্লাহ্ প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে বৎসরের জীবিকা বরাদ্দ করেন। আরও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, মহানবি (স.) মুসলমানদেরকে এ রাত্রে জেগে ইবাদত বন্দেগী, কুরআন তিলাওয়াত ও পূণ্যকর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৯০] অথচ অধিকাংশ উলামা এসব বক্তব্যকে 'লাইলাতুল কদর' এর ব্যাপারে প্রযোজ্য বলে মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ 'শব-ই-বরাতের উৎসব হিন্দুদের 'শিবরাত্রি' উৎসব থেকে নকল করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন।[৯১] শব-ই-বরাতের উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন আরাকানের কোন কোন মুসলমান ফরজ নামাজ রোজার চেয়ে শব-ই-বরাতের মত লোক বিশ্বাসগত ইবাদতের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিত।[৯২] এ মাস উদযাপনের জন্য সাবান মাসের প্রথম দিনেই পরলোকগত আত্মার শান্তির প্রত্যাশায় প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা রুটি তৈরী করতো এবং সেগুলো গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতো। এ সূচনা দিনের অনুষ্ঠানকে 'ফাতেহা' বলা হতো। শব-ই-বরাতের রাত্রে প্রচুর পরিমাণে রুটি তৈরি করে পরের দিন তা বিতরণ করতো। এমনকি মৃত ব্যক্তির নামে রুটি তৈরী করে আলাদা আলাদাভাবে বিতরণ করা হতো।[৯৩] এ ধরনের সামাজিক উৎসব পূর্বের ন্যায় রমরমা না থাকলেও এখনও অনেক পরিবারে চালু আছে।

মুহররম মাসকেও আরাকানী মুসলমানরা আনন্দ উৎসবের মাস হিসেবে বরণ করতো। অথচ এ মাসে ন্যায্য অধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দৌহিত্র, হযরত আলী (রা.) এর পুত্র ইমাম হুসাইন (রা.) এজিদের চক্রান্তে কারবালার প্রান্তরে মর্মান্তিকভাবে শহীদ হন। ইমাম হুসাইন (রা.) এর এই শাহাদাত বরণকে স্মরণ করার জন্য প্রতি বছর এ উৎসব পালন করা হতো। বিশেষত শিয়া মতাবলম্বী আরাকানীরা এ অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমক ও বিলাস ব্যসনের মধ্যদিয়ে উদযাপন করতো। মুহররম মাসের দশম দিবসে তারা 'তাজিয়া' নামে অভিহিত সুসজ্জিত প্রতীক সমাধি নিয়ে শোভা যাত্রায় বের হতো। কোন কোন এলাকার আবেগপ্রবণ মুসলমানেরা আশুরার দিনে ইমাম হাসান-হুসাইন (রা.) এর মূর্তি তৈরী করে পূজা করতো।[৯৪] তবে বর্তমান সময়ে এ সকল অনুষ্ঠান অনেকাংশে সুন্নী মুসলমানদের মধ্য থেকে হ্রাস পেয়েছে।

৩.৫.৩ জন্ম, বিয়ে ও মৃত্যুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান

আরাকানী মুসলিম সমাজে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করলে পরিবারের সকল সদস্য অত্যন্ত আনন্দিত হতো এবং আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ বিত্তবান পরিবারের লোকেরা গরীব দুঃখীদের মাঝে অর্থ-খাদ্য-বস্ত্র দান করতো।[৯৫] শিশু জন্মের ছয় দিনের দিনে নাপিত ডেকে শিশুর চুল কাটা হতো। শিশুর চুল কলা পাতায় রেখে নাপিতকে চাল, ডাল মরিচ, সরিষার তৈল, এক বিরা পান, (৮০টি পানে এক বিরা) একগণ্ডা সুপারী এবং নগদ টাকা বখশিশ দেয়া হতো। এমনকি পাড়া প্রতিবেশীদের মাঝেও পান সুপারি বিলি করা হতো।[৯৬] শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা দানের মাধ্যমে শিশুর নামকরণ করা হতো। ইসলাম সম্মত সুন্দর নাম রাখার জন্য আলিমদের সহায়তা নেয়া হতো। আকিকা অনুষ্ঠানে শিশুর নামকরণের স্মৃতিরক্ষার্থে শিশুপুত্রের জন্য দুটি ছাগল এবং শিশু কন্যার জন্য একটি ছাগল জবাই করা হতো। এ আকিকার গোশত নিজেরা না খেয়ে আত্মীয় স্বজন এবং গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হতো।[৯৭] সেইসাথে যবেহকৃত পশুর চামড়া বিক্রি করে সে টাকাও গরীবদের মধ্যে দান করে দিতো। উল্লেখ্য যে, শিশুর নানারা বিত্তশালী হলে একটি পশু তারা আকীকার জন্য প্রেরণ করতেন। অতঃপর শিশুর সাত বছর বয়সে খাতনা বা মুসলমানী দেয়া হতো।

মুসলিম সমাজে বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। শরিয়তেও বিয়েকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আরাকানী মুসলিম সমাজে শরিয়তের পদ্ধতি মোতাবেক বিয়ে সম্পন্ন হতো। পাত্র-পাত্রী দেখা, মোহরানা ইজাব-কবুল বিয়ে পরবর্তী খুৎবাহ প্রভৃতি সবকিছুই ইসলামের বিধিবিধান মোতাবেক পরিচালিত হতো। তবে গৌড়ীয় মুসলমানদের প্রভাবে সেখানে কিছু আনুষ্ঠানিকতার প্রচলন ছিল। এ ক্ষেত্রে গায়ে হলুদ[৯৮] বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নাচ গান প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে উৎসবমুখর করে রাখা হতো।[৯৯] সেইসাথে বিবাহের খুৎবাহ পাঠের মধ্য দিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলেও[১০০] অলিমা বিতরণসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের খাবারেরও আয়োজন করা হতো।

জীবের মৃত্যু একটি অনিবার্য নিয়ম। সৃষ্টির সেরা মানুষ এ থেকে রেহাই পাবার কোন কল্পনাও করা যায় না। এ মৃত্যুকে ঘিরেও মুসলমান সমাজে আলাদা নিয়ম কানুন রয়েছে। ইসলামি শরিয়ত এক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক নির্দেশনাও দিয়েছে। আরাকানী মুসলিম সমাজে সে নিয়ম কানুনগুলো প্রয়োগ হতো। সেই সাথে কিছু সামাজিক আনুষ্ঠানিকতারও প্রচলন হয়েছিল। সেখানে কোন মুসলমান নর-নারী অসুস্থ হলে মৃত্যুর পূর্বে সুস্থ অবস্থাতেই তওবাহ করে পাপমুক্ত করার চেষ্টা করা হতো। মৃত্যুকালীন সময়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে একটি পেয়ালায় পানি বা শরবৎ নিয়ে চামুচে করে বারবার পান করানোর চেষ্টা করা হতো। সেই সাথে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালিমা পড়তে উদ্বুদ্ধ করা হতো। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, মুমূর্ষু মুহূর্তে আজরাইল (আ.) এর বিশাল চেহারা দেখে ভয় ও আতংকে পিপাসিত হয়ে পড়ে এবং শয়তান এ সুযোগে ইমান নষ্ট করার বিভিন্ন কৌশল আঁটে এবং শরবত পানের অভিনয় করে অসুস্থ ব্যক্তিকে মূত্রপান করায়।[১০১] মৃত্যু হবার সাথে সাথে লাশের চোখ মুখ বন্ধ করে দেয়া হতো এবং উত্তর শিরায় (সিথান) রেখে হাত পা সোজা করে দেয়া হতো। অনেকে লাশের নাভির উপর ছোট এক টুকরা লৌহ খণ্ড রাখতেন। তাদের বিশ্বাস যে, এর ফলে মৃত ব্যক্তির পেট থেকে ময়লা বের হয় না।

মৃত ব্যক্তির লাশকে অতি যত্নের সাথে গোসল করানো হতো। অতঃপর গোসল দেয়া পুরুষ লাশকে খিরকা বা কামিজের মত কাপড় এবং নারী লাশকে খিরকা বা ঘোমটা পরিধান করিয়ে খাটে বিছানো চাদরের উপর উত্তর শিরা করে রাখা হতো। অতঃপর পুরুষলাশের চুল দাড়ি আঁচড়ে দেয়া হতো এবং মেয়ে লাশের চোখে সুরমা দিয়ে দেয়া হতো। সিজদার স্থান অর্থাৎ লাশের কপালে, নাকের ডগায়, হাতের তালু, হাঁটু, গিরায় ও পাতায় এবং মুখে, চুলে ও দাড়িতে সুগন্ধি লাগানো হতো।[১০২] অতঃপর শরিয়তের বিধি মোতাবেক পুরুষ লাশের ৩ প্রস্থ কাপড় ও মেয়েদের পাঁচ প্রস্থ কাপড় দ্বারা কাফন পরিয়ে কবরস্ত করা হতো। ইসলামি শরিয়তের কোন সুস্পষ্ট বিধান না থাকলেও তারা মৃত্যুর চল্লিশ দিনে, ছয় মাসে কিংবা বছরান্তে ফাতেহা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতো। এ অনুষ্ঠানে আলিমদের দিয়ে কুরআন খতম করানো হতো এবং তাদের উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করতো।[১০৩] এ সকল অনুষ্ঠানে পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এবং গরীব দুঃখীদেরও খাওয়ানোর রীতি ছিল।

বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাজ্যগুলোর মতই আরাকানে একটি স্বতন্ত্র অথচ ইসলাম প্রভাবিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামাজিক লেনদেন, উঠাবসা, আচার অনুষ্ঠান সবকিছুই ইসলামের সুমহান আদর্শকে অনুসরণ করেই এ সমাজ গড়ে উঠেছিল। প্রশাসনের মুসলিম অমাত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী-কর্মকর্তা এমনকি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল অটুট। মুসলমানগণ স্বীয় মাতৃভূমি আরাকান রাজ্যকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন বলেই একই বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার হওয়া সত্ত্বেও বাংলার সাথে সম্পর্কের প্রত্যেক বিষয়ে দেশীয় স্বার্থকে প্রাধান্য

দিয়েছিল। তারা ছিল আরাকানের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। অথচ আরাকানের মুসলমানরাই আজ সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত, নিগৃহীত। বিশ্বের সকল মুসলমানের সামাজিক রীতিনীতি একই প্রকৃতির হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা সকল মুসলমানই এক কুরআন ও মহানবির আদর্শের ভিত্তিতে জীবন চালায়। সেই ভিত্তিতে বাংলার মুসলমানদের সাথে আরাকানী মুসলিম সমাজের অনেক ক্ষেত্রে ঐকমত্য লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানের শাসনাধীনে থাকায় এখানকার সমাজ পদ্ধতি অনেকাংশে আরাকানের সাথে মিলে যায়। মূলত আধুনিককালে আরাকান বার্মার অংশ হলেও এর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি যোগাযোগগত দিক থেকে গভীর সম্পর্ক চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে। ফলে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে দু'অঞ্চলের মধ্যে ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একটি সমমনা সমাজ তৈরী হয়েছিল। যা হোক স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু সামাজিক রীতিনীতি আরাকানী মুসলিম সমাজে প্রবেশ করলেও তারা ইসলামের মূল ধারণাকে যে সামাজিকভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জি

১ আহমদ শরীফ, *চট্টগ্রামের ইতিহাস,* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ১১।
২ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮) পৃ. ১০।
৩ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব* (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৪৮-৪৯।
৪ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৭।
৫ ওহিদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১২।
৬ K.N. Chaudhury, *Trade and Civilization in the Indian Ocean,* (Cambridge : Cambridge University Press,1985) pp. 105-6.
৭ B.R. Pearn, *An Introduction to the History of south East Asia,* (Kualalumpur: Longmas of Malaysia. 1965) p. 30
৮ *তদেব,* পৃ. ৫৪।
৯ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৩।
১০ *তদেব,* পৃ. ৩৩-৩৪।
১১ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৬।
১২ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৪।
১৩ *তদেব,* পৃ. ৬০।
১৪ *তদেব,* পৃ. ৬৭।
১৫ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১১৫।
১৬ Jahiruddin Ahmad and Nazir Ahmed, *The Maghs and the Muslims in Arakan, op. cit..* p. 5.
১৭ *JASB,* 1884. *op. cit.,* p. 36.
১৮ R.B. Smart. *Burma Gazetteer, Akyab District,* Vol. A, (Rangoon: Supdt. Govt. Printing and stay. Union of Burma. 1957), p. 19.
১৯ R.B. Smart. *British-Burma Gazetteer. Akyab District.* Vol. A, 1917. p. 90.
২০ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৬৪।

২১ Jahiruddin Ahmad and Nazir Ahmed. *The Maghs and the Muslims in Arakan, op. cit.*, p.5.
২২ আরাকানী ভাষা মূলত বর্মী ভাষার একটি উপভাষা।
২৩ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬।
২৪ *তদেব।*
২৫ *তদেব।*
২৬ L.S.S. O'malley, *Eastern Bengal District Gazetteer*, Chittagong (Calcutta : Bengal Secretarial Book Depot., 1908), p. 37.
২৭ *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৭।
২৮ *তদেব।*
২৯ *তদেব।*
৩০ *তদেব*, পৃ. ২৫৭।
৩১ Harvey, *History of Burma, op. cit.*, pp. 146-147.
৩২ *Ibid*, p. 147.
৩৩ *Ibid.*
৩৪ *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৮।
৩৫ Harvey, *History of Burma, op. cit.*, p. 148.
৩৬ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪।
৩৭ *তদেব।*
৩৮ *তদেব*, পৃ. ১৬৯।
৩৯ *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৯।
৪০ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০; বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মোঃ মাহফুজুর রহমান, রোহিঙ্গা সমস্যা: বাংলাদেশের দৃষ্টি ভংগী, ১৯৭৮-১৯৯৪, অপ্রকাশিত এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, পৃ. ১৮০।
৪১ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, *তাওয়ারিখে ইসলাম : বার্মা ওয়া আরাকান* (কলিকাতা: দি স্টার আর্ট প্রেস, ১৯৮৬), পৃ. ২৪।
৪২ Jahiruddin Ahmed and Nazir Ahmed. *The Maghs and the Muslims in Arakan, op. cit.*, p.5.
৪৩ *Ibid.*
৪৪ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫১।
৪৫ রাজকুমার চক্রবর্তী ও অনঙ্গ মোহন দাস, *সন্দীপের ইতিহাস, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০-৪২.
৪৬ বিনয় ঘোষ, *রাজশাহী আমল*, (কলিকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৭। উল্লেখ্য, প্রত্যক্ষদর্শী বাংলার সুবেদার ও ঐতিহাসিক মীর্জা নাথান এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন শ্রীপুর অঞ্চলে রাজকীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে মগেরা শত শত নৌকা নিয়ে ঘুরে অসংখ্য গ্রাম লুণ্ঠন করে এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রামবাসীকে বন্দী করে নিয়ে যায়। (দেখুন, Mirza Nathan: Bahristan-i-ghaevi, Tr. Dr. M.I. Borah, p. 146.)
৪৭ James Tallboys Wheller and Michael Macmillan (Tr.) *European Travellers in India*, First series (Calcutta, 1956), p. 72.
৪৮ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫০।
৪৯ *তদেব*, পৃ. ১৫১।
৫০ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫-২৬।
৫১ *তদেব*, পৃ. ১২৬-২৭।
৫২ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৫।
৫৩ *তদেব*, পৃ. ১৫৪।
৫৪ মোঃ আখতারুজ্জামান, "আরাকানী রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উৎস ও ক্রমবিকাশ : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১২০৪-১৭৮৫ খ্রী.)" *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ ঢাকা, পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ - চৈত্র, ১৩৯৮, পৃ. ১১৭।

৫৫ *তদেব।*

৫৬ উল্লেখ্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং আহমদ শরীফ প্রমুখ মনে করেন যে, রাজধানীকে কেন্দ্র করে লেখকগণ রাজ্যের নাম লিখেছেন। যেমন রোমান সাম্রাজ্য, দিল্লী সাম্রাজ্য প্রভৃতির মত রাজধানী ম্রোহংয়ের নামেই আরাকানকে চিহ্নিত করা হতো। তবে ম্রোহং শব্দটি সাধারণ উচ্চারণে রোহাং হয়েছে, আবার পূর্ব বাংলার কথ্য ভাষায় 'স' 'হ' উচ্চারণের রূপান্তরের কারণে রোহাং শব্দটিও রোসাঙ্গ হয়েছে। যেমন ম্রোহং>রোয়াং>রোহাং> রোসাঙ্গ ইত্যাদি। এ কারণেই রোহাঙ্গ রাজ্যকে রোসাঙ্গ রাজ্য বলে লেখকরা অভিহিত করে থাকেন। (দ্রষ্টব্য: আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত এবং আহমদ শরীফ সম্পাদিত *পুঁথি পরিচিতি* (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃ. ৩১৬; আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৫।

৫৭ লেখকের এ বিষয়ে একটি গবেষণা প্রবন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন, মোঃ মাহফুজুর রহমান "আরাকানী মুসলমানদের গোত্রগত শ্রেণীবিন্যাস : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা" *রাজশাহী ইউনির্ভাসিটি জার্নাল অব আর্টস এন্ড ল*, ৩৫ বর্ষ, ২০০৭, পৃ. ৩৭৩-৩৮৬।

৫৮ শ্রেণী হলো একটি আধুনিক অর্থনৈতিক সংজ্ঞা যা নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশের কারণে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। [দ্রষ্টব্য: B.B. Misra, *The Indian Middle Classes, their growth in Modern Times* (London: Oxford University Press, 1961), p. 4] সুতরাং বলা যায় যে, একটি শ্রেণী গঠন প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সে শ্রেণী বিন্যাসই সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণের মৌলিক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

৫৯ সোলায়মান শাহ আরাকানের শাসন ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে গৌড়ীয় আদলে কালেমা ও মুসলিম নাম খচিত মুদ্রা ও ফারসি ভাষার প্রচলন করেন। এমনকি রাজধানীর আশে পাশে সামরিক ছাউনি নির্মাণ করে গৌড়ীয় সৈন্যদেরকে আরাকানেই রাখেন। তৎকালীন সময়ের প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, কিংবা লস্কর উজির বা সামরিক মন্ত্রীর নাম না জানা গেলেও একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তখন মুসলমানগণ এ পদে ছিলেন না। মূলত পর্যাপ্ত উপাত্তের মাধ্যমে সঠিক ইতিহাস চিত্রিত করতে পারলে আরাকানের মুসলিম প্রভাবকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হিসেবে পাওয়া যেত।

৬০ *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী, পূর্বোক্ত*, প্র. ২৫২।

৬১ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪।

৬২ *তদেব*, পৃ. ৫৫।

৬৩ উল্লেখ্য, কবির ভাষায়

পীরগুরু অভ্যাগত পুজেন্ত তৎপর / লোক উপকার করে নাহি আগুপর॥
সৈয়দ, কাজী, শেখ মোল্লা আলীম ফকির / পুজন্ত সে সবে যেন আপনা শরীর॥
(দ্রঃ দৌলত কাজী বিরচিত, *সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।

৬৪ আলাউল বিরচিত, *তোহফা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৮-৮৯।

৬৫ *তদেব*, পৃ. ১৪৯।

৬৬ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮।

৬৭ আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮।

৬৮ আলাউল বিরচিত, *তোহফা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৯।

৬৯ আলউল বিরচিত, *সিকান্দর নামা*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পৃ. ২৬ ; এ বিষয়ে বিস্তারিত তৃতীয় অধ্যায়ের ৩.২.২. অংশে দেখুন।

৭০ নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত, *শরীয়তনামা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯১।

৭১ আলাওলের ভাষায়

সিদ্দিক বংশেতে জন্ম শেখজাদা জাত / কুলশীল সৎকর্মে ভূবন বিখ্যাত॥
(সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল)।

৭২ আলাওল বলেন -

রাজসৈন্য মন্ত্রী ছিল শ্রী বড় ঠাকুর / প্রভুত মাগিয়া পাইল কুলদীপ শূর॥
প্রভুস্থানে মাগি পাইল প্রার্থনা করি / তেকারণে মাগন ঠাকুর নামধরি॥ (পদ্মাবতী)

৭৩ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭।

৭৪ *তদেব*, পৃ. ৫৭-৫৮।

৭৫ *তদেব।*
৭৬ এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ১৬৭।
৭৭ মুহাম্মদ আবদুল জলিল, *বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গী ও বর্গীর অত্যাচার,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ২৩।
৭৮ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৫০।
৭৯ নামাজ ও যাকাত সম্পর্কে *সুরাহ বাকারা,* ১৩৫, ৪৩-৪৬, ১১০, ১১৭, ২৩৮-২৩৯, ২৭৭; *সুরাহ ইমরান* ৪২-৪৪, *সুরাহ নিসা* ৪৩, ১০১-১০৩, ১৬০-১৬২; *সুরাহ মায়িদাহ* ৫৫-৫৮, ৯১, *সুরাহ আনয়াম* ৭২, ১৬২-১৬৩, *সুরাহ আ'রাফ* ২৯-৩১, ১৭০, ২০৫-২০৬, *সুরাহ আনফাল* ৩; *সুরাহ তওবা* ৫, ১১, ১৮, ৭১, ১০৮; *সুরাহ হুদ* ১১৪, *সুরাহ হিজর* ৯৬, *সুরাহ বনি ইসরাইল* ৭৮-৮১, ১১০; *সুরাহ মরিয়ম* ৫৪-৫৫; *সুরাহ ত্বোহা-* ১৩০-১৩২; *সুরাহ আম্বিয়া* ৭২-৭৩; *সুরাহ হজ্জ* ২৬, ৩৫, ৪১, ৭৭-৭৮; *সুরাহ মুমিনুন* ৯-১১; *সুরাহ নূর* ৩৭, ৫৬-৫৭; *সুরাহ শুয়ারা* ২১৭-২২০; *সুরাহ নমল* ১-৩; *সুরাহ রুম* ১৭-১৮, ৩১; *সুরাহ লোকমান* ৪-৫; *সুরাহ ফাতির* ২৯; *সুরাহ শুরা* ৩৮, *সুরাহ কৃফ* ৪০, *সুরাহ তূর* ৪৮-৪৯; *সুরাহ নজম* ৬২; *সুরাহ কালাম* ৩৫-৪৩, *সুরাহ মা'য়ারিজ* ১৯-৩৫; *সুরাহ মুজ্জাম্মিল* ১, ৮, ২০, *সুরাহ মুদ্দাস্সির* ৪০-৪৩, *সুরাহ আ'লা* ১৪-১৫, *সুরাহ আলাক* ৯-১৯; *সুরাহ বাইয়্যেনাহ* ১-৬; *সুরাহ মাউন* ৪-৭; রোজা সম্পর্কে *সুরাহ বাকারা* ১৮৩-১৮৭, ১৯৬; *সুরাহ আরাফ* ২৯; *সুরাহ হজ্জ* ২৬-৩৭; *সুরাহ যুমার* ১১-১৪, আয়াতসহ অনেক আয়াতে বিস্তারিত বর্ণনার পাশাপাশি পালনের জন্য মুমিনদেরকে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
৮০ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) বলেন, মহানবি (স.) বলেছেন ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল; (২) নামাজ কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোজা রাখা। [দ্রষ্টব্যঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদিত *সহীহ আল বুখারী ১ম খণ্ড* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ৩৫।]
৮১ *সূরা বাকারা* ৪৩ আয়াত দ্রষ্টব্য।
৮২ কবির ভাষায় - হেনজনে যাহাকে করিয়া আওয়ান / নমাজ করন্ত সঙ্গে যত মুসলমান॥
[দ্রষ্টব্যঃ নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়ত নামা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৬]
৮৩ R. B. Smart, *Burma Gazetteer, Akyab District,* vol. A, *op. cit.,* pp. 61-62.
৮৪ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আলাউলের *তোহফা,* পৃ. ১৫৩, ১৫৪, ১৭০-৭১ এবং নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়তনামা,* পৃ. ২৬, ৫৯-৬০। উল্লেখ্য, বর্তমানেও আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমান সমাজে দুটি বিষয়কে খুব গুরুত্ব দেয়া হয় প্রথমত পারিবারিকভাবে কুরআন শিক্ষা এবং নামাজ আদায় করা।
৮৫ নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়ত নামা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১১৯।
৮৬ *তদেব।*
৮৭ ঈদের তাকবীর, "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল হামদুলিল্লাহি কাসিরা, সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও ওয়া আসিলা।"
৮৮ পবিত্র কুরআনের সূরা কদর দ্রষ্টব্য।
৮৯ বুখারী ও মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে মহানবি (স.) বলেছেন, রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে তোমরা লাইলাতুল কদর অন্বেষণ কর। [দ্রষ্টব্যঃ *তাফসীরে মারেফুল কোরআন,* মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সম্পাদিত, খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পৃ. ১৪৬৮।
৯০ এম. এ. রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৯৮।
৯১ K. M. Ashraf, *Life and Condition of Peoples of Hindustan,* (Delhi : 1959), p. 205.
৯২ Ali Ahmed, "Some Popular Socio-Religiouse Ceremonies and beliefs Among the Muslims of Chittagong" *JASB,* vol. xxxiii, No.1, June 1988, p.70.
৯৩ নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়ত নামা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১২১।
৯৪ *তদেব,* পৃ. ১১২।
৯৫ কবির ভাষায় - যথেক ভাণ্ডার ছিল করিলেন দান / দারিদ্য খণ্ডিল জথ দুঃখিত সন্তান॥
[দ্রষ্টব্যঃ দৌলত উজির বাহরাম খান, *লায়লী মজনু,* আহমদ শরীফ সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫), পৃ. ১৭৪।

৯৬ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০২।
৯৭ মুহাম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৫৬।
৯৮ কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের ভাষায় - হলদি খেপস্ত যেন মগদ ধরান / হাসন গাহস্ত নটী নাটক্বেরগণ॥
(নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়ত নামা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৫।)
৯৯ কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের ভাষায় -
যন্ত্রকুল হারাম হইছে এহি রীত / তবলা বাহিতে মাত্র গাজীর উচিত॥
নিঃস্বার্থে ডম্বরু ঢোল বাহন লেখে দোষ / বিবাহ উৎসবে মাত্র বাহন সন্তোষ॥
[দ্রষ্টব্য: *তোহফা*, পৃ. ১৭৭]
১০০ সৈয়দ সুলতান, *রসুল চরিত*, ২য় খণ্ড, আহমদ শরীফ সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ৩৪১।
১০১ নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়ত নামা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০।
১০২ কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের ভাষায় -
তবে অঙ্গ জল সব মুছিয়া বসনে / সুগন্ধি চন্দন শিরে দাঁড়িতে যত্তনে॥
সজিদার ঠামে ঠামে কাফুর লাগাইবা / না থাকিলে কাফুর সুগন্ধি তথা দিবা॥
কাকইন ফিরাইবা মাথাত দাড়িত / নওখ কিবা কেশ ন কাটিবা কদাচিত॥
[দ্রষ্টব্য: নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়ত নামা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪]
১০৩ নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়ত নামা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২।

অধ্যায় ৪
আরাকানের বাংলা সাহিত্যে ইসলামি উপাদান

সাহিত্য মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগ অনুভূতির অভিব্যক্তি সম্পন্ন শিল্পোৎকর্ষ হৃদয়গ্রাহী কথামালার নাম। অন্যভাবে বলা যায় সাহিত্য হচ্ছে যুগ, জগৎ ও জীবনের অনুকৃতি; ভাব, কল্পনা এবং অনুভূতির রূপময় অভিব্যক্তি।[১] সাহিত্য যেহেতু জীবন ও জীবন চেতনার উচ্চারিত, উদ্ভাসিত ও লিপিকৃত আঙ্গিকরূপ সেহেতু সাহিত্যে চিত্রিত জীবনের বাস্তব ও কাম্যরূপ থেকেই বিশেষ দেশের বিশেষ কালের বিশেষ শাস্ত্র-সমাজ-সরকার শাসিত জনগোষ্ঠীর বোধ-বিশ্বাস এবং জীবনালেখ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এদিক বিবেচনায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর কাব্য সাহিত্যকে যথার্থ বলে বিবেচনা করা যায়। বিশেষত আরাকানের অমাত্য সভার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত কাব্যসমূহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এ সময় ইতোপূর্বের গতানুগতিক ধর্মসংশ্লিষ্ট সাহিত্যকে নির্বাসন দিয়ে আরাকানের কবিরা বাংলা সাহিত্যে ফারসি সুকুমার সাহিত্যের আমদানী করে মানবীয় প্রেমকে সাহিত্যের নতুন আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে প্রভূত বৈচিত্রময়তা আনয়ন করেছিলেন। এ সব কবিদের রচনায় মানবীয় প্রেম কেন্দ্রীয় বিষয় হলেও পূর্ব বাংলা, চট্টগ্রাম এবং আরাকানের বোধ বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে। এ দিক বিবেচনায় আরাকানের অমাত্যসভা কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতায় ও তৎপ্রভাবে রচিত সাহিত্যসমূহ সমকালীন আরাকানের সমাজ-সংস্কৃতি ও বোধ বিশ্বাসের মূল্যবান উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অত্র অধ্যায়ে সমসাময়িক উপাত্ত হিসেবে সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে গ্রহণ করে আরাকানের বাংলা সাহিত্যে ইসলামি উপাদান বিশ্লেষণের চূড়ান্ত প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৪.১ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও অমাত্যসভার পৃষ্ঠপোষকতা

প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন, মধ্যযুগ, আধুনিকযুগ, উত্তরাধুনিক কিংবা খ্রিস্টপূর্ব, খ্রিস্টাব্দ প্রভৃতি শব্দগুলো কালবিভাজনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে কালবিভাজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শতাব্দী শব্দ দ্বারা কাল বিভাজনের প্রয়াস থাকলেও এটি অতীব খণ্ডিত হবার কারণে উপরোদ্ধৃত মাপকাঠিকে অবমূল্যায়নের সুযোগ নেই। কাল বিভাজনই ইতিহাসকে সঠিক মানদণ্ডে যাচাই করার অন্যতম প্রধান পদ্ধতি। বাংলা সাহিত্য থেকে ইতিহাসের উপাত্ত সংগ্রহ করতে হলে কাল বিভাজনের কোন বিকল্প নেই।

৪.১.১ বাংলা সাহিত্যের কাল বিভাজন

বাংলা সাহিত্যের কাল বিভাজনে তিনটি ধারার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় যথাঃ (১) প্রাচীন যুগ, (২) মধ্যযুগ, (৩) আধুনিক যুগ। সাম্প্রতিককালে 'উত্তরাধুনিক যুগ' বলে আরও একটি ধাপ আলোচিত হলেও উপর্যুক্ত তিনটি ধারাকেই প্রসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া হয়। উপর্যুক্ত তিনটি ধারা নিয়ে কিছুটা ঐকমত্য থাকলেও এর সময়সীমা সম্পর্কে অনেক বিতর্ক লক্ষ্যণীয়। এ ক্ষেত্রে ড. তামোনাশ চন্দ্র গুপ্ত মনে করেন বাংলা সাহিত্যের সময় খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ১২'শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন যুগ, ১৩'শ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮'শ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং ১৯'শ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত আধুনিক যুগ।[২] মুসলমানদের বাংলায় আগমন পর্যন্ত আদিযুগ, অবশিষ্ট ছয়শত বছর অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং বৃটিশ শাসন থেকে অদ্যাবধি আধুনিক যুগ হিসেবে বিবেচিত। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ, ১৩০১ থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং এর পরবর্তী সময়কে আধুনিক যুগ বলে অভিহিত করেছেন।[৩] সুতরাং তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. তমোনাশ দাস গুপ্তের বক্তব্যের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না। কিন্তু দেবেন্দ্র কুমার ঘোষ, ড. ভূদেব চৌধুরী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের কাল বিভাজনে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের উপরোদ্ধৃত মন্তব্যের কাছাকাছি অবস্থান করলেও তারা ত্রয়োদশ চতুর্দশ এমনকি পঞ্চদশ শতাব্দী বিশেষত ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ,[৪] নিষ্ফলা যুগ[৫] ও শূন্যতার যুগ[৬] বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা তুর্কী বিজয়ের প্রথম দিকের রচিত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে সময়ে দেশে কোন রকম সাহিত্যই সৃষ্টি হয়নি। তাই ড. মুহাম্মদ এনামুল হক এ সময়কাল সম্পর্কে তাদের এ মন্তব্যকে খণ্ডন করে বলেন- "এই সময়ে মানুষ তাহার সুখ দুঃখের কোন গান বা গাঁথা নিজেদের ভাষায় একেবারেই প্রকাশ করে নাই, এমন হইতে পারে না।"[৭]

বাংলার জলো আবহাওয়া, উঁই, ইদুর, পোকামাকড়ের উপদ্রব এবং সর্বোপরি প্রাচীন কালের রচনাগুলো সংরক্ষণের ব্যাপারে এখানকার জনগণের সর্বাত্মক ও আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাবই হয়তো সেকালের রচনাবলী না পাবার মূল কারণ। বাকুড়ার এক ব্রাহ্মণের গোয়ালঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পুঁথি আবিষ্কৃত না হলে কিংবা নেপালের রাজ দরবার থেকে চর্যাপদগুলো উদ্ধার না হলে হয়তো সে যুগকেও শূন্যতার যুগ বলা হতো। অথচ সে যুগে প্রাণবন্ত মানুষ ছিল, মানুষের অনুভূতি ছিল, সুকুমার প্রবৃত্তি ছিল, সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম প্রীতি, স্নেহভালবাসা সবই ছিল কিন্তু মানুষ তার হৃদয়ের অনুভূতিগুলো কোন গান বা গাঁথার মাধ্যমে নিজেদের ভাষায় একেবারেই প্রকাশ করেনি তা অনুমান করা যায় না। এছাড়া 'শকশুভোদয়া' এবং রামাই পণ্ডিতের শূণ্যপুরানের অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুস্মা' ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা বলে ধারণা করা হয়।[৮] এ ধরনের

চিন্তা ও খণ্ডিত নমুনা দেখেও অনুমান করা যায় যে, খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতক প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার বা শূন্যতার যুগ নয়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলতে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সাহিত্যকেই বুঝানো যেতে পারে।

৪.১.২ মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা

চর্যাপদ তথা বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাবের পূর্ব অর্থাৎ ইংরেজ আমলের আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত (দশম শতক থেকে ১৮৪৫ খ্রি. পর্যন্ত) যত কাব্য কবিতা হিন্দু কবি দ্বারা রচিত হয়েছে তার সবগুলোই ধর্ম প্রসঙ্গের সীমাবন্ধনীতে আবদ্ধ ছিল। ধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তন বা দেবতার লীলা ও শক্তির পরিচয় প্রদানার্থেই সাহিত্য রচিত হতো। চর্যাপদই হোক, বৈষ্ণবপদাবলীই হোক বা কবিওয়ালাদের পাচালীই হোক সবকিছুর মূল প্রেরণা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনাকে ঘিরে।[৯] সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের হিন্দু ধারার মধ্যে মানুষের কাহিনী গৌণ বা আনুষঙ্গিক বিষয় মাত্র ছিল। দেবতাই ছিল কাব্যের নায়ক। নিছক মানুষের সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনা বা আশা আকাঙ্ক্ষা যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে এ ধারণা তাদের ছিলনা। এভাবে রামায়ন, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি একই কাহিনী অবলম্বনে অসংখ্য কবি পুনঃ পুনঃ কাব্য রচনা করেছেন।

ধর্মকেন্দ্রিক গতানুগতিকতা থেকে বাংলা সাহিত্যকে মুক্তি দিয়েছেন মুসলিম কবিরা। তারাই প্রথম কাল্পনিক ধর্ম প্রেরণাবিহীন মানবীয় কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। নিছক রস সৃষ্টির মধ্যদিয়ে মানব চরিত্র অংকন কিংবা মানুষের বোধ বিশ্বাস, সুখ-দুঃখের কাহিনী এবং সামাজিক চিত্র বর্ণনার রীতি মুসলমান কবিদের অমূল্য অবদান। এমনকি ময়মনসিংহ বা পূর্ববঙ্গ গীতিকার হিন্দু কবির যে সব রচনা আছে- তাও মুসলিম ধারার প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।[১০] বৈষ্ণব পদাবলী ধর্ম সম্পৃক্ত হলেও গীতি কবিতার মর্যাদা লাভের যোগ্য এবং এ বৈষ্ণব ধর্ম বা বৈষ্ণব মতবাদ ও ইরানী সুফী মতবাদের পরোক্ষ প্রভাবে উদ্ভূত। সুতরাং সাহিত্যের গতিধারা বিকাশে মুসলিম কবিদের অবদান সর্বাধিক। এছাড়া বাউল, মুর্শিদী, ভাটিয়ালী ও জারি-সারি গানে মুসলমানদের অবদানই সবচেয়ে বেশী।

মধ্যযুগের হিন্দু রচিত সাহিত্য যেমন অনুবাদ সাহিত্য, তেমনি মুসলমানদের সাহিত্যও তাই। হিন্দু কবিরা সংস্কৃত থেকে ধর্মোপাখ্যান অনুবাদ করেছিলেন পক্ষান্তরে মুসলমান কবিরা ভাষান্তরিত করেছিলেন পারস্যের উৎকৃষ্ট রসকাব্যের সাজি। হিন্দু রচিত সাহিত্যে দেবনীলা ও ধর্মের ব্যাখ্যাচ্ছলে পাওয়া যায় ভুত, প্রেত, দেবতা, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি আর মুসলমানদের সাহিত্যে রোমাঞ্চকর রূপকথার সুর- পরিবেশ, সামাজিক জীবনের বিশ্বাস, আনন্দ জীবনাচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় জ্বীন-পরী

প্রভৃতি।[১১] অলৌকিকতা-অস্বাভাবিকতা উভয় ধারার মধ্যেই ছিল কিন্তু আদর্শ ও উদ্দেশ্যগত অনেক পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। একটা হচ্ছে ধর্ম শিক্ষা দেবার জন্য আর একটি রস সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের বোধ-বিশ্বাস ও সামাজিক জীবনের চিত্র উপস্থাপনের জন্য।

মধ্যযুগের হিন্দু কবির চেয়ে মুসলমান কবির সংখ্যা, পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব শক্তি কম হবে না। এ যুগের হিন্দু কবি চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কৃত্তিবান, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরায়, বিজয়গুপ্ত, ধনরাম, বৃন্দাবন দাস ও ভারত চন্দ্রের পাশাপাশি মুসলিম কবি শেখ ফয়জুল্লাহ, শাহ মুহাম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, কবি জৈনুদ্দিন, দৌলত উজির বাহরাম খান, কবি মোতালেব, কবি সবিরিদ খান, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল, দৌলত কাজী, মুহম্মদ খাঁ, সৈয়দ মর্তুজা, শেখ ভিকন, সার বেগ, আবদুন নবী, মুহাম্মদ কবীর, দোনা গাজী, আবদুল হাকিম, নওয়াজিস খান, মঙ্গল চাঁদ, মুহম্মদ মুকীম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু সাহিত্য রচনাই নয় বরং মুসলিম শাসকগণ বিভিন্ন সময় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন।

শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের উৎসাহ দান ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান পাল শাসকদের সময় শুরু হলেও সেন আমলে তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে বরং সাহিত্য চর্চার পরিসমাপ্তি ঘটে।[১২] দীনেশ চন্দ্র সেনের ভাষায় "জনসাধারণ পালদের সময় নতুন গ্রাম্যগীতি রচনা করিত, রূপকথা, গীতিকথা প্রভৃতি বাংলা ভাষায় রচিত হইত এবং রাজারা তাহা শুনিতেন। কিন্তু সেনদের সময় কি সাধ্য যে জনসাধারণ বাঙলা গান লইয়া রাজদ্বারে প্রবেশ করে।"[১৩] কাজেই অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধ শাসনামলে বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু হলেও হিন্দু শাসক সেনদের সময় তা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তুর্কীদের সময় তা আবার শুরু হয়ে পরবর্তী সুলতানদের হাতেই বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়েছে। এ জন্য তুর্কী আগমনের পর দেড়শ বছরকে গবেষকগণ[১৪] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার বা শূন্যতার যুগ না বলে বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ বা প্রস্তুতির যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কঠিন দুর্দিনে সংস্কৃত অনভিজ্ঞ মুক বাঙ্গালীর রস পিপাসা মিটাবার সুযোগ দিলেন বাংলার মুসলমান সুলতানগণ। তারা বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় উৎসাহ ও কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে বিকশিত করেন। বিশেষ করে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ বুঘরা খান (১২৮১-১২৮৫ খ্রি.), সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রি.), সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ (১৩৯৩-১৪১১ খ্রি.) রুকনউদ্দীন বরবক শাহ (১৪৬০-১৪৭৪ খ্রি.), শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.), সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), সুলতান নাসির উদ্দীন নসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.), আলাউদ্দীন ফিরূজ শাহ (১৫৩২-১৫৩৩ খ্রি.) প্রমুখ ছাড়াও সুবেদার পরাগল খান ও ছুটি খান প্রমুখ মুসলিম সুলতান ও সুবাদারগণের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধিত

হয়।[১৫] সেই সাথে মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনা আরাকান অমাত্যসভার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত মহাকবি আলাওল, দৌলত কাজী প্রমুখ আরাকানে বসে বাংলা সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধই করেননি বরং বাংলা সাহিত্যের নতুন গতিধারা বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এ জন্য ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেন- "সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানগণও হিন্দুদের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। এ খবর আমাদের জানা ছিল না বলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিভাবকত্ব আমরা হিন্দুদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তা'হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অধিকার হিন্দুদের চাইতে কম নয়। বরং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও এ সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক হিসেবে এবং এ যুগের কাহিনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবির অন্যতম আলাওলের স্বজাতি বলে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির গৌরব প্রধানত আমাদেরই প্রাপ্য।"[১৬] মোটামুটিভাবে বড়ু চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন[১৭] থেকে যে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র, হেয়াত মামুদ, গরীবুল্লাহ প্রমুখ কবির রচনার ভিতর দিয়ে সে মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এ দীর্ঘ সময়ে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ, বৈষ্ণব পদাবলী, চরিত শাখা, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য, শক্তি পদাবলী, রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যান, লোকগীতিকা, মর্সীয়া, দোভাষী প্রভৃতি সাহিত্য শাখার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যদিয়ে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সময়সীমা যেমন দীর্ঘ তেমনি এ সময়ের রচিত বিভিন্ন কাব্য শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

৪.১.৩ আরাকানে বাংলা সাহিত্য বিকাশের কারণ নির্ণয়

আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য কিংবা 'রোসাঙ্গে বাঙলা সাহিত্য' কথাগুলো অনেক সময় বাংলা সাহিত্যের পরিচিত মহলকে অবাক করে দেয়। কেননা আরাকান বাংলার কোন অংশ নয় বরং এটি বার্মা বা মিয়ানমারের পার্শ্ববর্তী এককালের স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য হলেও বর্তমানে 'রাখাইন স্টেট' নামে পরিচিত তাদেরই একটি রাজ্য। সেখানে বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুধু নয়, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের রাজত্ব ছিল আরাকানে অবস্থানরত কবিদের হাতে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি চমকপ্রদ ঘটনা বৈকি। সাধারণত রাজনীতির সুস্থ আবহাওয়ায় শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়; অন্যদিকে রাজনৈতিক অরাজকতায় দেশে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-সভ্যতা, সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতি চর্চা শূন্যতার কোঠায় ওঠে। বাংলার ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের সাহিত্য শূন্যতার জন্য অনেকে রাজ্যের অস্থিতিশীল পরিবেশকেই দায়ী করেছেন।[১৮] অথচ আরাকানে এ ধরনের বক্তব্যের কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বাংলা ও ত্রিপুরা এবং বার্মার আগ্রাসী ও প্রতিশোধনীতির প্রেক্ষিতে আরাকানকে সবসময় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ফলে রাজ্যে অস্থিতিশীল পরিবেশ চালু থাকাই স্বাভাবিক। অথচ এত বিপর্যয় ও সমস্যার পরও সেখানে বাংলার উন্নত গৌড়ীয় মুসলিম সংস্কৃতি ও বাংলা

সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ থেমে থাকেনি। যা হোক অধ্যায়ের এ অংশে আরাকানে বাংলা সাহিত্য বিকশিত হবার কারণ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হলো।

প্রথমত, নৃতাত্ত্বিক দিক বিবেচনায় চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের খ্রিস্টপূর্ব অধিবাসীরা ছিল একই গোত্রীয়। বিশেষত অস্ট্রো-এশীয় এবং ভোটচীন গোত্রীয় মানুষই সম্ভবত চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন আরাকানের খ্রিস্টপূর্ব অধিবাসী। আর খ্রিস্টীয় সনের সূচনালগ্নে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ও বৌদ্ধরা তাদের উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এসব অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে।[১৯] এভাবে খাসী ও কুকী চীনাদের সাথে (অস্ট্রো-নেগ্রিটো-দ্রাবিড়-মোঙ্গল-আল পাইনীয়-নর্ডিক মিশ্রণে গঠিত) আর্যজাতির ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় ঘটে। অতঃপর খ্রিস্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকে আরব মুসলিম বণিকগণ এ সব এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন। ফলে ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলার সাথে আরাকানের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, আরাকান স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য হলেও বার্মা প্রায়ই আগ্রাসী হামলা চালাতো এ রাজ্যের উপর। এর প্রেক্ষিতে ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজ মিনসুয়ামুন ওরফে নরমিখলা স্বীয় রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের (১৩৮৯-১৪১০ খ্রি.) দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ২৪ বছর বাংলায় অবস্থান করার পর সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৯-১৪৩২ খ্রি.) স্বসৈন্যে তার হৃতরাজ্য আরাকান পুনরুদ্ধার করে দেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি আরাকানে সৈনিকদের স্বীয় রাজধানী ম্রোহংয়ে পুনর্বাসন করে রাজ্যে গৌড়ীয় নিয়মে ইসলামি রীতি পদ্ধতি ও সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে বাংলার সাথে মৌলিকভাবে আদর্শিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়ত, ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আরাকান গৌড়ীয় অধীনতা থেকে মুক্ত হয়। এমনকি পরবর্তী সময়ে স্বাধীন আরাকানের সাথে বাংলার শাসকদের সদ্ভাবও ছিলনা। চট্টগ্রামের দখল নিয়ে দু'রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। তদুপরি তারা গৌড়ীয় মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিহার না করে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছিল। এখনকার ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা যেমন প্রাগ্রসর বিদ্যা, চিন্তা চেতনা ও প্রকৌশল কৃৎকৌশলের অধিকারী বলে আমাদের শ্রদ্ধেয়, মধ্য যুগে তেমনি শ্রদ্ধেয় ছিল আরব-ইরানী, তুর্কী, মোগল শাসক গোষ্ঠীর লোকেরা এবং তাদের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি।[২০] আরাকানী রাজাগণ তাদের নিজেদের সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার ব্যবহারের চেয়ে গৌড়ীয় সংস্কৃতি সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার-আচরণকে অনেক উন্নত অবস্থায় পেয়েছিল বলেই বাংলার সাথে বৈরী সম্পর্ক সত্ত্বেও তা স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন।[২১] ফলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে আরাকানী বিশেষত আরাকানী মুসলমানদের মাঝে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

চতুর্থত, আরাকান রাজ্য পুনরুদ্ধারে গৌড়াধিপতির সহায়তার পরোক্ষ ফল হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরির সূত্রে আরাকানে বাংলার মুসলমানদের আগমনের পথ সুগম হয়। এ ছাড়া চট্টগ্রাম অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে আরাকান রাজ্যের অধীনে শাসিত হবার ফলে পূর্ববাংলাসহ চট্টগ্রামের মুসলমানগণ নিজ দেশ হিসেবে আরাকানে গিয়ে চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে এবং অনেকেই সেখানে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। ফলে বাংলা সাহিত্য চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পঞ্চমত, আরাকানের রাজসভার প্রধানমন্ত্রী, অমাত্য, সমর সচিব, মন্ত্রী, কাজি বা দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারক হিসেবে মুসলমানদের নিয়োগ শুধু ছিলনা, রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের সততা-আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমের অনেক সুখ্যাতিও ছিল। তাঁরাই ছিলেন রাজার প্রধান উপদেষ্টা। অভিষেক অনুষ্ঠানসহ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহ তাদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। যেহেতু তাদের অধিকাংশেরই আদি নিবাস ছিলো চট্টগ্রাম কিংবা সিলেট অঞ্চল। সুতরাং রাজসভায় তাদের প্রতিষ্ঠা-সূত্রে আরাকানে নিজেদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রচার-প্রসারে তারা ব্যাপক সুযোগ পান। গৌড়ীয় মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতা আরাকানীদের চেয়ে উন্নত হবার কারণে শাসকদের পক্ষ থেকে কোন বাধা না এসে বরং সহযোগিতার পরিবেশ পাওয়া গেছে। ড. আহমদ শরীফের ভাষায়, "পাড়া আছে, সমাজ আছে, নিজেদের আলাদা ভাষা আছে, স্বতন্ত্র বিশ্বাস-সংস্কার আছে, বিশিষ্ট নিয়মনীতি আছে, আছে রীতি-রেওয়াজও। কাজেই তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পূর্তির জন্যে, মানস চাহিদা পূরণের জন্যে, মনের রসতৃষ্ণা মিটানোর জন্যে সেখানে গুণীজন দিয়ে গান-গাঁথা-রূপকথা-প্রেম কথা জানানোর, রসকথা শুনানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে, সৃজনশীল কেউ কেউ নতুন সৃষ্টি দিয়ে তাদের রসতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছে।"[২২] তাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে দৌলত কাজী, আলাওল, মাগন ঠাকুর প্রমুখ প্রতিভাবান কবিগণ প্রণয়োপখ্যান ও রূপকথার কাব্য রচনা করে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের একটি স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছিলেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যেমন বাংলার শাসকদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তেমনি আরাকানের অমাত্যসভার মুসলিম সদস্যগণেরও উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আরাকানে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। ড. এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ আরাকানে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় নাম দিয়েছেন 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য।' অনেক গবেষকই এ নামকে অসার্থক ও বিভ্রান্তিকর বলে উল্লেখ করেছেন।[২৩] তারা 'রোসাঙ্গে বাঙলা সাহিত্য' নামকে যথার্থ মনে করেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে আরাকানের রাজধানী রোহাং বা রোসাঙ্গে যে সব কবি বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছেন তারা কেউ বাংলার কৃত্তিবাস, মালাধর বসু বা ভারত চন্দ্রের মত রাজসভার কবি ছিলেন না। বরং তারা আরাকানের অমাত্যসভার মন্ত্রীদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও প্রতিপোষণে বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছেন। এমনকি তারা

আরাকানী ভাষার লোকও নন। মূলত কবিরা ছিলেন আরাকানে প্রবাসী এবং পৃষ্ঠপোষকদের আদি নিবাসও ছিল বাংলা। সুতরাং আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য না হয়ে 'রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য' কিংবা 'আরাকানে মুসলিম রাজমন্ত্রীদের আশ্রয়ে বাংলা কাব্যচর্চা' হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল।[২৪] উল্লেখ্য যে, কবি ও তাদের পৃষ্ঠপোষকগণ রাজবংশের কেউ না হলেও যেহেতু রাজধানী রোসাঙ্গের রাজসভার ছত্রছায়া থেকেই সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে তাই 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' নামকে সরাসরি অসার্থক ও বিভ্রান্তিকর না বলাই ভাল। তবে 'রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য' নামটি বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। সে যাই হোক, আরাকানের রাজধানীকেন্দ্রিক বিকশিত বাংলা সাহিত্য যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিজয়ী ও নব অধ্যায়ের সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

৪.২ আরাকানে বাংলা সাহিত্য চর্চা : ইসলামি উপাদান

সাহিত্য ইতিহাস নয়; তবে সমসাময়িক সাহিত্য ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[২৫] বিশেষ করে মধ্য যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদানের অপ্রতুলতার প্রেক্ষিতে সমসাময়িক রচনাবলী হিসেবে মধ্যযুগের কাব্যকে ইতিহাস রচনার অন্যতম মৌলিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সে দিক বিবেচনা করে মধ্যযুগে আরাকানে বাংলা সাহিত্যের যে বিশাল ভাণ্ডার আরাকান অমাত্যসভার পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া রচিত হয়েছিল তা পর্যালোচনার মাধ্যমে আরাকানী সমাজে কিংবা প্রশাসনে ইসলামের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। সেইসাথে সাহিত্যের ভূবনে ইসলামি উপাদান কতটুকু ব্যবহৃত হয়েছে তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আরাকানে সাহিত্য চর্চার সন্ধান পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহের শাসনামলে আরাকানের প্রধান কবি (কবিকুল প্রধান) ছিলেন আদু মাযুঁ।[২৬] তিনি মুসলমান ছিলেন এবং তাঁর নাম আবদুল মা'নি ছিল বলে অনুমান করা হয়। তিনি 'এখাইংমিন থেমি ঈহবং' অর্থাৎ 'আরাকান রাজকুমারীর প্রশংসা' নামক কাব্য রচনা করেন।[২৭] কিন্তু এ তথ্যের অন্যকোন উৎস পাওয়া যায় না। এমনকি এর পর কবি দৌলত কাজীর পূর্বে আর কোন কবি কর্তৃক আরাকানে বাংলা সাহিত্য রচনারও কোন তথ্য নেই! আবদুল মা'নি বাংলা ভাষায় কাব্যটি রচনা করেছিলেন কিনা তাও সন্দেহাতীত নয়।

৪.২.১ দৌলত কাজী

বিশুদ্ধ লৌকিক কাহিনী অর্থাৎ কোন ধর্ম বা দেবদেবীর প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন[২৮] অথচ ভারতীয় হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কৃতি ও লোক উপাদানের বিচিত্র রস সম্পদ এবং ইরানী মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলামি ঐতিহ্যের প্রাচুর্যময় ঐশ্বর্যকে অবলম্বন করে সুদূর অতীত ও বর্তমানকে সমন্বয় ঘটিয়ে আপন প্রতিভার বদৌলতে সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়ের

সূচনা করেছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি দৌলত কাজী। বাস্তববাদী এ কবি মধ্যযুগকে পিছনে ফেলে সমকালীন আধুনিকতা বিনির্মাণের জন্য সাহিত্যের গতানুগতিক পথ মাড়িয়ে বাস্তবতার নিরিখে মানবীয় প্রেমকে উপজীব্য করে সাহিত্য রচনা করেন, 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্য যার জলন্ত উদাহরণ। অবশ্য মধ্যযুগ তাঁকে ছাড়েনি[২৯] বলেও মন্তব্য পাওয়া যায়। কবি দৌলত কাজীর আত্মপরিচয় পাওয়া খুব কঠিন। কেননা মধ্যযুগের কবিরা প্রথাসিদ্ধভাবে অন্যান্য বিবরণের ভিতর দিয়ে নিজের নাম, গোত্র, বংশ, জন্মভূমিসহ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে লিপিবদ্ধ করতেন, কিন্তু কবি দৌলত কাজী তাঁর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যে এ ধারায় কাব্যের আদেষ্টা, আরাকানের রাজসভা, রাজা, সমাজ-সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ উল্লেখ করলেও নিজের কথা কিছুই উল্লেখ করেননি। তবে কবির কাব্য, সমসাময়িক ইতিহাস, প্রচলিত জনশ্রুতি, কিংবদন্তি প্রভৃতি সূত্র অনুযায়ী চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামের কাজি বংশে কবি দৌলত কাজী জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে অনুমান করা হয়।[৩০] তিনি অল্প বয়সে নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, এমনকি ঐ অঞ্চলে তখন তার সমকক্ষ পণ্ডিত জনও ছিলেন না। কিন্তু তিনি তরুণ বয়স্ক ছিলেন বলে ঐ অঞ্চলের বৃদ্ধ পণ্ডিতগণ তার পাণ্ডিত্য স্বীকার করতেন না। এ জন্য দেশে তার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি না হওয়ায় তিনি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে সুদূর আরাকানে গমন করেন।[৩১] কিন্তু উপর্যুক্ত তথ্যের মধ্যে দুটো প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমত; তিনি কাজি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর কাব্যের প্রত্যেক কবিতায় তাঁর বংশগত উপাধি 'কাজি' কথাটি লক্ষ্য করা যায়। অথচ ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ আগমনের পূর্বে 'কাজি' বংশগত উপাধি ছিলনা, ইংরেজ আমলে মুসলিম বিচারক 'কাজি'র পদ বিলুপ্ত হলেই কাজির বংশধরগণ 'কাজি'কে বংশগত উপাধিতে পরিণত করে।[৩২] মুসলিম আমলে যারা কাজি পদে নিযুক্ত হয়ে বিচারকার্য সম্পাদন করতেন তাঁদেরকেই কাজি বলা হতো। কাজির ছেলে বিচারক পদে নিযুক্ত না হলে তাঁকে কাজি বলা হতো না। অতএব ধারণা করা যায় যে, কবি দৌলত আরাকানে রাজসভার কাজির পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং এ কারণেই তিনি 'দৌলত কাজী' নামে পরিচিত হন। দ্বিতীয়ত; "তিনি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া সুদূর আরাকানে গমন করেন।"[৩৩] এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঐ সময়ে কবির মাতৃভূমি বলে নির্ধারিত চট্টগ্রাম অঞ্চলও আরাকানের অন্তর্গত ছিল এবং চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের খুব বেশী দূরত্ব নয়। আরাকান যেতে মাতৃভূমে ছেড়ে যাবার কথা বুঝানো হলো কেন? তাহলে কি তার পিতৃনিবাস চট্টগ্রামের বাইরে ছিল? এর কোন সদোত্তর কোথাও পাওয়া যায় না হেতু অমীমাংসিতভাবে চট্টগ্রামকেই দৌলত কাজীর আদি নিবাস বলে ধরে নেয়া যায়।

যা হোক, কবি ভাগ্যান্বেষণে আরাকান গমন করেন এবং সেখানকার জ্ঞানীদের সাথে পরিচিত হন। আরাকান রাজসভায় তখন জ্ঞানী-গুণিদের কদর ছিল খুব বেশী। একদিন রাজসভায় পণ্ডিতদের মধ্যে কোন কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে ভীষণ তর্ক বাঁধে। ঐ সভায়

কবি দৌলত কাজীও উপস্থিত ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে বিষয়ের সুমীমাংসা না হওয়ায় দৌলত কাজী তা সমাধানের জন্য মত প্রকাশ করেন। পণ্ডিতগণ তরুণ দৌলত কাজীকে তিরস্কার করলেও মন্ত্রীর আদেশে তিনি মত প্রকাশ করেন এবং সমস্যার সমাধান করে সবাইকে মুগ্ধ করেন।[৩৪] সেই থেকে তিনি রাজসভার পণ্ডিত দলে স্থান পান।

কবি দৌলত কাজী আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মার রাজত্বকালের (১৬২২-১৬৩৮ খ্রি.) মধ্যেই তার লস্কর উজির আশরাফ খানের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন।[৩৫] কিন্তু তিনি তার কাব্য সমাপ্ত করার আগেই মারা যান, যেহেতু থিরি থু ধম্মার রাজত্বকালে তিনি এ কাব্য রচনা করেছিলেন সেহেতু ধারণা করা যায় যে তিনি ১৬২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই কাব্য রচনায় হাত দেন এবং মাত্র ৩৮ বছর বয়সে[৩৬] ইন্তেকাল করেন।

কবি দৌলত কাজীর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' অসমাপ্ত হলেও এ কাব্যে চরিত্র চিত্রন, কাহিনী-ধারার বর্ণনা, ঘটনায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত তৈরী, ভাষারীতিতে তরঙ্গ সৃষ্টি, ছন্দের প্রয়োগ সিদ্ধি এবং অলংকারিক বর্ণনার নৈপুণ্য কবিকে পূর্ণাঙ্গ শিল্প প্রতিভাসম্পন্ন কাব্যশিল্পী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যদিও কবির উপাখ্যানটি মিয়া সাধনের 'ঠেটা চৌপাইয়া দোহা' ভাষার 'মৈনাসৎ' কাহিনী অবলম্বনে রচিত[৩৭] তবুও কবির সংযম ও পরিমিতিবোধ, বিশ্বাসের স্বকীয়তা, সুক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি, বানী বিন্যাস ও প্রয়োগ কৌশল কাব্যটিকে অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কবি প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোক সাহিত্যের প্রথাবদ্ধ রীতি অনুযায়ী[৩৮] কাব্যের সূচনায় বন্দনা ও ভনিতা রচনা করলেও তাতে তার বিশ্বাস ও মৌলিকত্বের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কাব্যে বন্দনা, মহাম্মদের সিফত এবং রোসাঙ্গের রাজার প্রশস্তি অংশে কবি মূলত তার বিশ্বাসের প্রতিধ্বনিই তুলেছেন। বিশেষ করে বন্দনা অংশে আল্লাহর প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি কুরআন ও হাদিসের মৌলিক ধারাকে অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন। কবির ভাষায়ঃ

> বিসমিল্লার নাম জান ত্রিভূবন সার / আদি অন্ত নাহি তান দোসর প্রকার ॥[৩৯]

উপরোদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ে আল্লাহর একত্ববাদের এক অসাধারণ বিবরণ চিত্রিত হয়েছে। আল্লাহর নামই ত্রিভূবনের একমাত্র বিষয়। তিনি এমন সত্তা যে, তার পূর্ব পরে কোন সঙ্গী সাথী, পিতা-পুত্র কিংবা যেকোন অংশীদার নাই। এ যেন পবিত্র কুরআনের সুরা ইখলাসের বিবরণের প্রতিধ্বনি "বলো, তিনি আল্লাহ একক, আল্লাহ্ কারোর উপর নির্ভরশীল নন, এবং সবাই তার উপর নির্ভরশীল, তার কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই।[৪০] অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদের কথা বলা হয়েছে।[৪১] এ বক্তব্য থেকে তাওহিদ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণার ইংগিত পাওয়া যায়।

ইসলামি সংস্কৃতির একটি মৌলিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম নিয়ে তথা বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে যে কোন কাজ শুরু করা। এতে কাজও ইবাদতের শামিল হয়ে যায় এবং কাজের মধ্যে আল্লাহর রহমত ও বরকত পাওয়া যায়। এমনকি বিসমিল্লাহ বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা বাস্তবায়ন অতীব সহজতর হয়। কবিও এ বিষয়টি অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন -

প্রথমে বলিয়ে বিসমিল্লাহ আর্-রহমান / সর্বস্থানে কল্যাণ পুরয়ে মনষ্কাম ॥
বিসমিল্লাহ প্রধান এক নাম নিরঞ্জন / যে নাম স্মরণে কার্যসিদ্ধি সর্বস্থান ॥[৪২]

কবি তার কাব্যের বন্দনা অংশে পরম করুণাময় আল্লাহর দয়া, ক্ষমতা, মর্যাদা তথা তাওহিদের পাশাপাশি আল্লাহর উলুহিয়াতের সকল গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। সেইসাথে খিলাফতের বিষয়েও ইংগিত দিয়েছেন। কবির ভাষায় -

খোদার সদয় ছায়া জানিয়া নৃপতি / মানিবা তাহান আজ্ঞা না হৈবা প্রকুতি ॥
খোদার নবীর আজ্ঞা মানে যেই রাজা / সকল পৃথিবী করে সেই পদ পূজা ॥[৪৩]

উপরোদ্ধৃত কাব্যাংশে কবি রাজ্যের শাসকের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন করেছেন। মূলত মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনকারী শাসক গোষ্ঠী আল্লাহর অনুগ্রহের ছায়ায় অবস্থান করে।[৪৪] তবে সে রাজাকে অবশ্যই আল্লাহ্ ও তার রাসুলের আদেশ অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা চালাতে হবে। যদি কোন শাসক এমনটি করেন তবে পৃথিবীর সকল কিছুই তার অনুগত হয়ে থাকে। বন্দনার শেষাংশে কবি দৌলত কাজী মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। বিশেষত তিনি যে আল্লাহর দোস্ত এবং তার পৃষ্ঠদেশে নবুয়তের মোহর অংকিত আছে; সে বিষয়টিও কবি বন্দনার শেষাংশে বর্ণনা করেছেন। কবির ভাষায় -

মহম্মদ আল্লাহর রসুল সখাবর / যাঁর নূরে ত্রিভূবন করিছে প্রসর ॥
শ্যামতনু জ্যোতির্ময় সর্বাঙ্গ দাপনি / নুবয়ত পৃষ্ঠে যেন জ্বলে দিন মনি ॥[৪৫]

মূলত মহানবি (স.) সকল নবির চেয়ে সেরা নবি, এমনকি তিনি নবুয়তের ধারাবাহিকতায় সূর্যের মত দেদ্বীপ্যমান হয়ে জ্বলে আছেন।

কবি দৌলত কাজী বন্দনা অংশে আল্লাহ, খিলাফত ও খলিফা এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেও মহম্মদের সিফত নামে আলাদাভাবে রসুলের গুণাবলী, মহত্ব, এমনকি মোজেজা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। বিশেষত মহানবি (স.) এর অংগুলির ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনাও বিবৃত হয়েছে। কবির ভাষায়-

সাংসারিক দয়া ধর্ম / সকল নবীর কর্ম
নবী সূত্র যা হস্তে সমাপ
আঙ্গুল-ইঙ্গিত-শরে / শশী দুইখণ্ড করে
প্রলয় সমান তান দাপ ॥[৪৬]

এ মহম্মদের সিফত অংশে মহানবি (স.) এর মহানুভবতা ও রিসালাতের বিভিন্ন গুণ বর্ণনার সাথে সাথে আরাকানের তৎকালীন লস্কর উজির এবং কবির পৃষ্ঠপোষক আশরাফ খান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। কবির ভাষায় -

শ্রী আশরফ খান / ধর্মশীল গুণবান
মুসলমান সবার প্রদীপ
সে রসুল-পরসাদে / গুরুজন আশির্বাদে
রাজসখা হউক চিরঞ্জীব ॥[৪৭]

উপরোদ্ধৃত পংক্তিসমূহে লস্কর উজীর আশরাফ খানকে ধর্মশীল, গুণবান এবং আরাকানের সমস্ত মুসলমানের প্রদীপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন রাসূল (স.) এর অনুগত মুসলমান। তার গুরুজন অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তি, ধর্মীয় নেতা কিংবা বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি তিনি যেমন সদাচারণকারী তেমনি তাদের কাছেও তিনি আশির্বাদপুষ্ট। সে প্রেক্ষিতে কবি নিজেও তার প্রশাসনিক ক্ষমতাকে চিরঞ্জীব হবার জন্য দোয়া করেছেন।

দৌলত কাজী তার কাব্যের তৃতীয় পর্বে 'রোসাঙ্গের রাজার প্রশস্তি' শীর্ষক রাজার বন্দনা রচনা করেছেন। রচনার শুরুতে মহানবি (স.), পির, গুরু, মাতা পিতা, বন্ধুবান্ধব-সুজন সকলের প্রতি সালাম এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। অতঃপর আরাকান রাজ্যের বিবরণ দিয়ে আরাকান রাজ শ্রী চন্দ্র সু ধর্মা বা থিরি থু ধম্মার প্রশস্তি গেয়েছেন। তবে লক্ষণীয় যে, কবি রাজার প্রশস্তিতে অতিরঞ্জিত প্রশংসা করলেও রাজার ধর্মীয় দৃষ্টিভংগীকেও পরিষ্কারভাবে চিত্রিত করেছেন। কবির ভাষায় -

তাহাতে মগধ বংশ ক্রমেবুদ্ধাচার / নাম শ্রী সুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার ॥[৪৮]

রাজার প্রশস্তির পাশাপাশি পুনরায় লস্কর উজীর আশরাফ খানের পরিচয়, চারিত্রিক বিশ্লেষণ, ইসলামের প্রতি তার আনুগত্য ও ভালবাসার চিত্র, রাজনৈতিক দক্ষতা, সততা, ইসলামের প্রসার ও প্রভাবে তার অবদানসহ বিভিন্ন বিষয়ের আলোকপাত করেছেন। রাজার প্রশস্তি অংশে রাজার চেয়ে আশরাফ খানেরই বেশী আলোচনা পাওয়া যায়।

দৌলত কাজী শুধু কবি নন, তিনি সদুপদেষ্টাও বটে।[৪৯] বন্দনা, মহম্মদের সিফত, রোসাঙ্গের রাজার প্রশস্তি প্রভৃতি অংশের বিবরণের পর মূল কাব্যাংশে হিন্দুদের চারিত্রিক কাহিনী অবলম্বনে প্রেমের উপাখ্যান রচনা করলেও কবি সেখানে নৈতিকতাকে মূল্যায়ন করে মূল্যবোধের প্রতি অটল থেকেছেন। এমনকি বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে সুকৌশলে কাব্যের আদর্শকে ক্ষুণ্ন না করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশ মুক্তামালার ন্যায় কাব্যের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রেখেছেন।[৫০] এ সকল উপদেশ মূলত ইসলামের দৃষ্টিভংগীকেই সমর্থন করে।

দৌলত কাজী শুধু বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নন, প্রাচীন বাংলার শক্তিমান কবিদের মধ্যেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি।[৫১] কেননা তাঁর কাব্য যেমন সরস কবিত্বে পরিপূর্ণ তেমনি বিবরণী উপস্থাপনাও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।[৫২] সেইসাথে বিশ্বাসের স্বকীয়তা বহাল রাখতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে তাঁর বিশ্বাসের স্বকীয়তাকে সুফী ভাবনা হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৩] তাঁর কাব্যের বন্দনা ও প্রশস্তি অংশের মাধ্যমে যেমন কবির ইসলামি জ্ঞানের পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করা যায় তেমনি ইসলামের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও ভালবাসার নিখুঁত চিত্রও ফুটে উঠে। শুধু ব্যক্তি দৌলতই নন বরং প্রশাসনের সাথে যুক্ত মুসলিম অমাত্য আশরাফ খানের চরিত্র বিশ্লেষণ করে আরাকানে ইসলামের প্রসার ও প্রভাব বিশ্লেষণের পথ তৈরী করেছেন। সত্যিকার অর্থে মধ্যযুগে আরাকানের ইসলামের প্রভাব নির্ণয়ের উপাত্ত এবং প্রমাণপত্র হিসেবে কবি দৌলত কাজীর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যটি সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

৪.২.২ আলাওল

ভাগ্য বিড়ম্বিত কবি আলাওল (১৬.৭-১৬৮০ খ্রি.) ছিলেন একজন বহু ভাষাবিদ,[৫৪] মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠকবি,[৫৫] সুপণ্ডিত, অনুবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ, রাগতাল বিশেষজ্ঞ, সুফিতাত্ত্বিক, বৈষ্ণবপদ রচয়িতা, অষ্টমহাগণতত্ত্ব বিচারক ও সর্বোপরি আল্লাহ প্রেমিক একজন আদর্শ মুসলমান কবি। তিনি আনুমানিক ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে[৫৬] ফতেয়াবাদ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। কবির ভাষায় -

> মুলুক ফতেহাবাদ গৌড়েত প্রধান / তথাত জালালপুর পুন্যবন্ত স্থান ॥
> মজলিশ কুতুব তাহাত অধিপতি / মুই হীন দীন তান অমাত্য সন্ততি ॥[৫৭]

কোন কোন গবেষক আলাওলের জন্মস্থান চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ হিসেবে উল্লেখ করলেও[৫৮] ফতেয়াবাদকে ফরিদপুরের সাথে চিহ্নিতকরণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থে ফতেয়াবাদের অধিপতি মজলিশ কুতুবের নাম পাওয়া যায়। তিনি বার ভুঁইয়ার অন্যতম ছিলেন এবং মোগল সুবেদার ইসলাম খান চিশতির সেনাপতি শেখ হাবিবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। তিনি আত্মসমর্পণ করায় তাঁকে মোগল বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। অতঃপর তাকে তাঁর রাজ্য ফিরে দেয়া হলেও তার নৌবাহিনী বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৫৯] যা হোক, আলাওলের পিতা ফরিদপুরের অন্তর্গত জালালপুরে বসবাস করতেন। ফরিদপুর জেলার অনেকটা, যশোর, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালী জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল 'ফতেহাবাদ' পরগনা; তার মধ্যে জালালপুর ছিল একটি সমৃদ্ধশালী স্থান। ফরিদপুরের অধিকাংশ অঞ্চল এবং ঢাকা ও বাকেরগঞ্জের কিয়দংশ উক্ত মহালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলাওলের পিতা ছিলেন এ ফতেহাবাদ পরগনার পরাক্রান্ত জায়গীরদার মজলিশ কুতুবের অমাত্য। তিনি উক্ত মহাল তত্ত্বাবধান করতেন।[৬০] এ জালালপুরেই কবির জন্ম হয়।

কবি ফতেয়াবাদে থাকতেই বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং কোন এক কাজের জন্য নদী পথ ধরে যাবার সময় 'হার্মাদ' (পর্তুগিজ) জলদস্যুদের কবলে পড়ে তার পিতা শহীদ হলেও আলাওল কোন রকমে রক্ষা পেয়ে আরাকানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৬১] অশ্ব চালনার যোগ্যতা থাকার সুবাদে তিনি আরাকানে অশ্বারোহী সৈন্য পদে চাকরি পান। আলাওল এ ছোট চাকরি গ্রহণ করে নিজের পরিচয় গোপন রেখে চাকরি জীবন চালালেও অচিরেই তাঁর প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। ফলে আরাকানের মুসলিম মন্ত্রী এবং পাত্র-মিত্ররা তাঁর গুণের পরিচয় পেয়ে তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য তাঁকে নিযুক্ত করেন। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ হবার কারণে তাঁর কদর আরও বেড়ে যায়। ফলে অনেক উচ্চ পদস্থ মহৎ লোকজনও তাঁকে গুরু বলে মেনে নেয়।[৬২] পরবর্তীতে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তাঁর কাব্যসমূহ রচনা করেন।

৪.২.২.১ পদ্মাবতী

আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠকাব্য পদ্মাবতী। এ কাব্যের মাধ্যমেই তাঁর কবি প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ ঘটেছে। আরাকানরাজ থদো মিংদারের (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রি.) শাসনামলে রাজসভার প্রভাবশালী অমাত্য ও কবি কোরেশী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে[৬৩] কবি এ 'পদ্মাবতী' কাব্যটি রচনা করেন। হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সী[৬৪] আধ্যাত্মিক রূপকের আধারে চিতোরের ঐতিহাসিক করুণ কাহিনী'র উপর ভিত্তি করে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শের শাহের শাসনামলে Early Avadi form of Eastern Hindi ভাষায় 'পদুমাবৎ' নামক যে কাব্য রচনা করেছিলেন[৬৫] পদ্মাবতী কাব্যটি মূলত তারই ভাবানুবাদ। তবে ঘটনার বিবরণীতে অনুকরণ থাকলেও কাব্যের বিভিন্ন অংশে তাঁর স্বকীয়তার প্রমাণ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। জায়সীর 'পদুমাবৎ' ফারসি মসনবী রীতিতে রচিত পক্ষান্তরে আলাওল বাংলা পাঁচালী কাব্যের রীতিতে পদ্মাবতী অনুবাদ করেন। তাছাড়া জায়সীর সুবৃহৎ কাব্যের ৫৮ খণ্ডের মধ্যে ৫৩টি খণ্ডের অনুবাদ সম্পন্ন করেন।[৬৬] সেইসাথে তিনি নাগমতি, 'বারমাসী ও পদ্মাবতীর রূপচর্চা' খণ্ড দুটি সংক্ষিপ্ত করে কুকুনুছ পক্ষীর বিবরণ, পদ্মাবতী-রত্নসেনের বিবাহ বর্ণনা, বাদলের পত্নী প্রসঙ্গে রাজপুত গউনা প্রথার বিবরণ এবং গোরা বাদল যুদ্ধ বর্ণনাসহ ৪টি খণ্ডের বিস্তৃতি সাধন করেছেন।

পদ্মাবতী আলাওলের অনুবাদ কাব্য হলেও এর মধ্যে স্বকীয়তাকে ফুটে তোলার চেষ্টা করে তিনি সফল হয়েছেন। এ কাব্যে স্তুতি খণ্ড, হযরতের সিফতের বিবরণ এবং চার আছহাবের কাহিনী, রোসাঙ্গ বর্ণনা, সৎকীর্তি মাগনের প্রশংসা, আত্ম পরিচয়সহ বিভিন্ন স্থানে তিনি স্বকীয়তার সার্থক চিত্র অংকন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ সব স্থানে তিনি যেমন বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তেমনি আরাকানের সমাজ-সংস্কৃতিরও চিত্র অংকন করেছেন। স্তুতি খণ্ডে কবি আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের ঘোষণা প্রদানের মধ্য

দিয়ে যেমন ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে সমুন্নত করেছেন তেমনি তাঁর সৃষ্টি মহিমার বিশদ বিবরণের মাধ্যমে স্রষ্টা হিসেবে 'খালিক' নামের স্বার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন।[৬৭] আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে যেমন সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন তেমনি পদমর্যাদাগত দিক থেকেও একে অপরকে সম্পূরক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে পৃথিবীতে কেউ সুখি, কেউ দুঃখি, কেউ ধনী, কেউবা গরীব।

স্তুতি অংশে কবির পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপারে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সুরা ইখলাসে যেভাবে আল্লাহর একত্ববাদের বিবরণ দেয়া হয়েছে তার চমৎকার বিবরণ কবির এ অংশে পাওয়া যায়।[৬৮] আল্লাহর প্রশংসা লিখে শেষ করা যাবেনা এ ধরনের আয়াত - "হে মুহাম্মদ (স.) বলুন, আমার পালনকর্তার কথা লেখার জন্য যদি সমুদ্রের পানিসমূহ কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার প্রশংসা শেষ হবার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। এমনকি সাহায্যার্থে অনুরূপ আরও সমুদ্র এনে দিলেও তাও শেষ হয়ে যাবে।[৬৯] অনুরূপভাবে সুরা লোকমানে আল্লাহ তায়ালা বলেন - 'পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও যদি সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর (আল্লাহর) বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়।[৭০] কবি আলাওল তার পদ্মাবতী কাব্যের স্তুতি অংশে ঠিক এ ধরনের প্রতিচ্ছবিই এঁকেছেন। কবির ভাষায় -

> অনেক অপার অতি প্রভুর করণ / কহিতে অশক্য কথা না যায় কহন ॥
> সপ্ত সর্গ সপ্ত মহী বৃক্ষপত্র যত / সপ্তশূন্য ভরি যদি সৃজএ কাগত ॥
> এ সপ্ত সাগর আদি যত নদনদী / দীঘি পুস্করিণী কূপ মসি হয় যদি ॥[৭১]

স্তুতি অংশে যেমন কবির আল্লাহর একত্ববাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব, তাঁর অগণিত প্রশংসার বিবরণ পাওয়া যায় তেমনি হযরতের সিফতের বিবরণ এবং চার আসহাবের কাহিনী অংশেও কবির রসুল (স.) এর মোজেজা বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কবির ভাষায় -

> অঙ্গুলি ইঙ্গিতে যার চন্দ্র দুই খণ্ড / ঘনমালা যার শিরে ধরে নবদণ্ড ॥
> বনমৃগ যাহার লগ্নকা অরপিয়া / বনান্তরে যাই পুনি আইল ফিরিয়া ॥
> মহিমা কতেক কৈব মুই মহিতীনে / যার গুণ কোরানে কহিছে নিরঞ্জনে ॥[৭২]

উপরোদ্ধৃত কাব্যাংশে রাসুল (স.) এর আঙ্গুলি নির্দেশে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, বনের হরিণ ছাড়া পেয়ে ওয়াদা রক্ষার্থে মহানবি (স.) এর নিকট ফিরে আসা, এমনকি পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মহানবি (স.) এর প্রশংসা করার বিষয়টি উপস্থাপনের মাধ্যমে কবির কুরআন হাদিস ও ইতিহাস সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ব্যাপারে হাদিসে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন - মহানবি (স.) এর যুগে চাঁদ ফেটে দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) লোকদেরকে বললেন- সাক্ষী থাক যে, চাঁদ দুই টুকরা হয়ে গেল।[৭৩] অনুরূপভাবে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, মক্কাবাসী রাসুলে খোদা (স.) এর নিকট নবুয়তের নিশানা দেখানোর

দাবী তোলে, তখন মহানবি (স.) আঙ্গুলি ইশারা করেন এবং আল্লাহর নির্দেশে চাঁদ দুই টুকরো হয়ে গেল।[৭৪] চন্দ্র টুকরা হবার এরকম যেমন আরও অনেক হাদিস আছে তেমনি রাসুল (স.) এর সাথে হরিণীর কথাবার্তা ও ওয়াদা পালনের বিষয়টিও উল্লেখ করার মত। হযরত আবু নাঈম ইস্পাহানী (রা.) রাবীদের একটি সিলসিলা উল্লেখ করে হযরত উম্মে সালমার একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- রাসুলে করিম (স.) একবার কোন এক প্রস্তরময় উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় তিনি 'ইয়া রাসুলাল্লাহ (স.)' ডাক শুনতে পেলেন। তিনি বলেন 'আমি এ আওয়াজ শুনে চারদিকে দেখলাম। কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। আমি সামনে অগ্রসর হলাম। পুনরায় একই আওয়াজ শুনতে পেলাম। যে দিক থেকে আওয়াজ আসছিল আমি সেদিকে গেলাম। সেখানে একটি হরিণী রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তার পাশে একজন সশস্ত্র বেদুইন রোদে শুয়েছিল। হরিণী বললো 'হে আল্লাহর রাসুল (স.), এই বেদুইন আমাকে শিকার করেছে। পার্শ্বের পাহাড়ে আমার ছোট দুটি বাচ্চা আছে। আপনি যদি আমার বাঁধন খুলে দেন তবে আমি তাদেরকে দুধ পান করিয়ে ফিরে আসবো। মহানবি (স.) বললেন, তুমি কি সত্যিই ফিরে আসবে? জবাবে সে বললো, আমি যদি ওয়াদা পালন না করি তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে প্রসব বেদনায় মেরে ফেলেন। (হরিণীটিকে মহানবি (স.) ছেড়ে দিলেন এবং খুব দ্রুতই সে ফিরে এলো)। অতঃপর আলগা হরিণীটিকে মহানবি (স.) যখন রশি দিয়ে বাঁধছিলেন তখন বেদুইনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে মহানবি (স.) কে চিনতে পেরে আরজ করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার মাতা পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমি কিছুক্ষণ আগে এ হরিণীকে শিকার করেছি। এটি কি আপনার প্রয়োজন আছে? যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে আপনি এটাকে আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন। মহানবি (স.) এ সুযোগে হরিণীকে নিয়ে আযাদ করে দিলেন। তাতে সে এতো খুশি হলো যে, ময়দানে দৌড়াতে দৌড়াতে, পা আছড়াতে আছড়াতে আল্লাহর একত্ববাদ ও রসুলের রেসালাতের সাক্ষ্য দিচ্ছিল।[৭৫] উপরোল্লিখিত কবিতাংশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ তার প্রশংসা করেছেন। সত্যিকার অর্থেই মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সিরাজুম মুনীরা বা প্রদীপ্ত চেরাগ, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী রাসুল এবং আদর্শের সর্বোত্তম অনুকরণীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৭৬] শেষ বিচারের দিন যখন কেউ কারো সাহায্যকারী হবে না সেদিন হযরত মুহাম্মদ (স.) ই হবেন সুপারিশকারী - একথাও কবিতায় বলা হয়েছে।

পদ্মাবতী কাব্যের হযরতের সিফত অংশে কবি খোলাফায়ে রাশেদীনের ৪ জন খলিফার সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুঁত পরিচয় উল্লেখ করেছেন। ইসলামের একনিষ্ট সেবক 'পীর' হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবকে 'ত্রিভূবন জিনিয়া অনন্ত অদ্ভুত' জামেউল কুরআন বা কুরআন সংকলক ও দানশীল হযরত ওসমানকে 'গ্রন্থ করিল যেই কোরানের কথা' এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকে আসাদুল্লাহিল গালিব বা 'সিংহ

যে আল্লাহর' বলে উল্লেখ করেছেন। এ মহান চার খলিফা একেকজন একেক চারিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারী হলেও তারা নৈতিক কর্মকাণ্ড, চিন্তা চেতনা এবং কথাবার্তায় এক ও অভিন্ন ছিলেন। কবির ভাষায় -

চারি এক একে চারি এক গতিমতি / এক ভাব এক বাক্য এক পন্থে গতি ॥[৭৭]

মূলত খোলাফায়ে রাশেদীনের এ মহান ব্যক্তিগণ ছিলেন দীন নামক ঘরের চার চারজন স্তম্ভ। দীনের বাস্তবায়নে তাদের ত্যাগ, মহিমা ও আন্তরিকতার কথা লিখে শেষ করা সম্ভব নয়।[৭৮] এ সকল বক্তব্যের মধ্য দিয়েও কবির ইসলাম প্রীতির পরিচয় মেলে।

কবি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের সূচনা পর্বে যেমন তাঁর আল্লাহর একত্ববাদের ক্ষেত্রে অটুট বিশ্বাস এবং কুরআন-হাদিস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে তেমনি আরাকানের প্রশাসন ও সমাজ জীবনেও ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রোসাঙ্গ বর্ণনা অংশে কবি আরাকানের রাজার প্রশংসা করতে গিয়ে আরাকানে আগত বিদেশীদের চিত্রও অংকন করেন। এর মধ্য দিয়ে মুসলিম প্রভাবেরও তথ্য বেরিয়ে আসে। বিশেষত 'সৎকীর্তি মাগনের প্রশংসা' অংশে কবি আরাকানের অমাত্যসভা কর্তৃক মুসলমানদের জ্ঞান চর্চা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ইসলামের প্রভাব বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। কবির ভাষায়-

ওলামা সৈদ শেখ যত পরদেশী / পোষন্ত আদর করি বহু স্নেহবাসি ॥
কাহাকে খতিব কাকে করন্ত ইমাম / নানাবিধ দানে পুরায়ন্ত মনস্কাম ॥[৭৯]

কিংবা

বহু মুসলমান সব রোসাঙ্গে বৈসেন্ত / সদাচারী কুলীন পণ্ডিত গুণবন্ত ॥[৮০]

উপরোদ্ধৃত পংক্তিসমূহে প্রথমত; আরাকানের রাজধানীতে হাজারো কুলীন পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিদের ভিড় লক্ষ্যণীয়; দ্বিতীয়ত; এদের মধ্যে ওলামা, সৈয়দ, শেখ প্রভৃতি যারা বিদেশী ছিলেন কিংবা স্বদেশী ছিলেন সবাইকে মুসলিম অমাত্যগণ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে রাজ্যের উন্নতি যেমন নিশ্চিত করেছেন তেমনি আরাকানী প্রশাসনে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদাকে নিশ্চিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আরাকান রাজসভায় বিদেশী মুসলিম-অমুসলিম লোক আরাকানে একত্রিত হয়ে আরাকানী সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন।[৮১] বিশেষত আরাকানে ইসলামের প্রসার ও প্রভাব বিস্তারে তাদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

৪.২.২.২ সতী ময়না-লোর চন্দ্রানী

মহাকবি আলাওল তাঁর অমর কাব্য 'পদ্মাবতী' রচনার পর আরাকানের রাজা সান্দা থু ধম্মার (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রি.) শাসনামলে আরাকানের সৈন্যমন্ত্রী মুহাম্মদ সোলায়মানের পৃষ্ঠপোষকতায় দৌলত কাজী রচিত অসমাপ্ত 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যটি সমাপ্ত করেন।[৮২] ১৬৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত এ কাব্য মোট তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম

খণ্ডে নায়ক নায়িকা লোর চন্দ্রানীর পরিচয় ও তাদের দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্তির বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডে পতিবিরহক্লিষ্টা ময়নাবতী বিরহানলে দগ্ধ হন; যা বারমাসির মাধ্যমে প্রকাশিত; তৃতীয় খণ্ডে লোর চন্দ্রানী ও ময়নাবতীর মধ্যে বহু বাধা বিপত্তির পর মিলন ঘটে। কবি দৌলত কাজী ১ম খণ্ড শেষ করে ২য় খণ্ডের বারমাসির বিবরণে ১১ মাস বর্ণনার পর মারা যান এবং তার প্রায় বিশ বছর (১৬৩৮-১৬৫৮ খ্রি.) পর মহাকবি আলাওল বারমাসির ১২তম মাস শেষ করে ৩য় খণ্ড অর্থাৎ মিলন খণ্ড রচনার মধ্যদিয়ে কাব্যটি শেষ করেন।

কবি আলাওল গতানুগতিক ধারায় শুরুতে 'স্রষ্টার বন্দনা' রচনা করেন। এর মধ্যে মহান আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব ও তার প্রশংসা যেমন করা হয়েছে তেমনি তারই প্রেরিত শ্রেষ্ঠ রাসুল হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স.) এরও বন্দনা-প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ ও রাসুল (স.) এর প্রশংসার পরই দৌলত কাজী কর্তৃক সতী ময়না, লোর চন্দ্রানী'র রচনা ও আশরাফ খান কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতঃপর আত্মবিবরণী অংশে কবি স্বীয় জীবনের দুর্দিনের ইতিবৃত্ত টেনে দৈবক্রমে আরাকান পৌছার বিবরণ দেন।[৮৩] কাব্যটি আলাওলের খণ্ডিত হলেও তার 'বন্দনা ও আত্মবিবরণী' এবং ৩য় খণ্ডে মিলনের মাধ্যমে সমাপ্তি টানা সত্যিকার অর্থে তার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেইসাথে সমকালীন আরাকানের প্রশাসনে মুসলিম প্রভাব ও উদার নৈতিক মূল্যবোধ এ কাব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। মূলত এটি ছিল কবির মৌলিক রচনা।

৪.২.২.৩ সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল

কবি আলাওল আরাকানের রাজা সান্দা থু ধম্মার শাসনামলে স্বীয় প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল নামক বিখ্যাত প্রণয়োপখ্যানটি রচনা শুরু করেন। কিন্তু ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে মাগন ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যু হলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কবি গ্রন্থটি অসমাপ্ত রাখেন। অতঃপর প্রায় দশ এগার বছর পর আরাকানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ মুসার অনুরোধ ও প্রতিপোষনে তিনি এ কাব্যের শেষাংশ রচনা সমাপ্ত করেন। এ কাব্য রচনার সময়কাল প্রসঙ্গে কবি উল্লেখ করেন -

> কলা অব্দ হস্তে কহি শুন গুণীগণ
> মৃগাঙ্গ গগন রস করিয়া স্থাপন ॥
> অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষ বার বৃহস্পতি
> দিবা অর্ধে লেখা হৈল ক্ষেম দোষ মতি ॥

অর্থাৎ মৃগাঙ্গ - ১০, গগন - ৭, রস - ৯ মিলে ১০৭৯ হিজরী বা ১৬৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দে কবি এ কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন।[৮৪] এ কাব্য রচনার জন্য দ্বিতীয় পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ মুসা কবিকে তিনটি যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন।[৮৫]

প্রথমত, আলাওলের প্রথম পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

দ্বিতীয়ত, পুস্তকটি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, রাজপুত্র বন্দী অবস্থায় রয়েছে, তার পরিণতি জানার জন্য পাঠকদের মধ্যে উৎসুক্য রয়েছে।

তৃতীয়ত, সৈয়দ মুসার অনুরোধ ও সম্মান রক্ষা করা। এ সকল কিছু বিবেচনা করে কবি এ কাব্যটি রচনা করেন।

কাব্যটি 'আলিফ লায়লা'র বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় উপাখ্যানগুলোর একটি কাহিনী। হাজার বছরের পুরনো এ রোমান্টিক প্রণয়োপখ্যানের ৭৫৭তম রজনীতে এ উপাখ্যানের সূচনা হয় এবং ৭৭৮তম রজনীতে এর সমাপ্তি। কবি এ কাব্যে পৃথিবীর নর-নারীর প্রেমের উপাখ্যান রচনা না করে তিনি নর ও পরীর প্রেমের চিত্র অংকনের প্রয়াস পেয়েছেন।

কবি আলাওল পূর্ববর্তী কাব্যসমূহের নিয়মেই কাব্যের সূচনায় হামদ ও নাত অংশে মহান আল্লাহর অপরিসীম গুণকীর্তন, সৃষ্টি মহিমাসহ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্য মহিমার কথাও বর্ণনা করেছেন। কবি শুরুতেই বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করে তারই উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানিয়ে কাব্য শুরু করেছেন। কবির রচিত হামদ-নাত অংশের চরণসমূহে কবির অন্তরাত্মার লালিত ইসলামের সুমহান আদর্শ, বিশ্বাস অনুভূতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও ভাবৈশ্বর্য ফুটে উঠেছে। কিন্তু এর শব্দ প্রয়োগে এবং ভাষায় ভঙ্গিতে আরবি-ফারসি প্রয়োগের পরিবর্তে দেশীয় উপকরণকে কাজে লাগিয়েছেন। এমনকি তিনি দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ শব্দ বুঝাতে ধর্ম, নাথ, নিরঞ্জন করতার, আদ্যপ্রভু, আদিনাথ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৮৬] তবে এ ধরনের শব্দের ব্যবহার কবির উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভংগীরই পরিচয় বহন করে এবং তিনি যে সত্যিকার অর্থেই ইসলামের উদারতাকে ধারণ করে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে নিজকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এ কাব্য।

৪.২.২.৪ সপ্তপয়কর

কবি আলাওলের আরও একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ সপ্তপয়কর। এটি বিখ্যাত ফারসি কবি নিজামী গজাবী'র[৮৭] 'হপ্তপয়কর' কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ। কবি আলাওল ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের মুখ্য সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ খানের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাব্যটি রচনা করেন।[৮৮] এ কাব্যে আরব-আজমের অধিপতি নোমানের পুত্র বাহরামের বীরত্বসূচক বিভিন্ন ঘটনা ও সাত রাজ্যের সাতজন রাজকন্যার সাতটি গল্প কাহিনী ফুটে উঠেছে। সপ্তপয়কর কাব্যটি কবি আলাওলের অনুবাদ কাব্য হলেও তা যেমন ছিল স্বাধীন তেমনি তিনি মূল কাহিনীর কিছু কিছু প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে সুদূর ইরানের যুগরুচির পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি ভারতীয় কাব্য ঐতিহ্যের রূপরেখা অংকন করার মধ্যে আলিফ

লায়লার ঢঙটিকে অক্ষুণ্নরূপে লক্ষ্য করা যায়। কবি নিজামী এবং কবি আলাওল উভয়ই একনিষ্ঠ মুসলমান হবার কারণে ইসলামি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক যেমন অক্ষুণ্ন রয়েছে তেমনি আলাওলের অনুবাদে ইরানী ও ভারতীয় ঐতিহ্য যুক্ত হয়ে কাব্যের ভাষারস আরও নান্দনিক রূপ লাভ করেছে।

মহাকবি আলাওল মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী অন্যান্য কাব্যসমূহের মত এ কাব্যের শুরুতেই আল্লাহর প্রশস্তি, রাসুল (স.) এর তারিফ, আরাকানের রাজা ও পৃষ্ঠপোষকের প্রশংসা এবং সেইসাথে কিঞ্চিত আত্মকেন্দ্রিক বিবরণ রচনা করেছেন। এ সকল স্থানে আল্লাহর একত্ববাদ, সৃষ্টিকৌশল, তাঁর অপার মহিমা শক্তি, দয়া-করুণা এবং সকল ক্ষমতার আধার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতিমূলক বিষয়বস্তু হলেও তিনি ভাষার ভঙ্গিতে, উপমা-অলংকারে, বাকপ্রতিমা নির্মাণে মূলত দেশী উপাদান উপকরণ এমনকি রামায়ন, মহাভারত, পুরান প্রভৃতির উপমাকে বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[৮৯] তিনি এ কাব্যে আল্লাহ-খোদার সমার্থক বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে পংক্তিসমূহে বৈচিত্র ও অলংকারিক মাধুর্য আনয়ন করেছেন। কবি তাঁর সপ্তপয়কর কাব্যে আল্লাহ শব্দের সমার্থক হিসেবে ঈশ্বর, প্রভু, বিধি, বিধাতা, করতার, নিরঞ্জন দীনবন্ধু, দয়াল, স্বামী, অনাদীস্বামী, নাথ, গোঁসাই, ত্রিভুন সাঁই, ত্রিজগতপতি, অবতার, গুরু প্রভৃতি শব্দের মাধুর্য্য মণ্ডিত ও সফল ব্যবহার করেছেন।[৯০] কোন কোন গবেষক[৯১] এ ধরনের শব্দ প্রয়োগকে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় সুলভ বলে উল্লেখ করে বলেন "এ সকল পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবি সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে কাব্যকলার সৌধ নির্মাণের জন্য সহজ-স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক সমন্বয় সুলভ কবি স্বভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহর প্রশস্তি কীর্তনে এই সমন্বিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম ধর্মের কোরানোক্ত 'একেশ্বরবাদ' আর হিন্দুর উপনিষদোক্ত 'অদ্বৈতবাদ' এখানে একাকার।" গবেষকের এ ধরনের কথাকে যৌক্তিক স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় যে, কবি আলাওলের এ দৃষ্টিভংগী সমন্বয়ধর্মী নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিভংগীকে আরো জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের জন্য এটি তার যথাযথ প্রয়াস। কেননা ইসলাম যুগোপযোগী জীবন বিধান হবার কারণে আরবীয় অসংখ্য বৈধ প্রথাকে অক্ষুণ্ন রেখে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার করেছে মাত্র। সুতরাং কবি তাঁর কাব্যে এ ধরনের শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ইসলামের ঔদার্যকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৪.২.২.৫ তোহফা

'তোহফা' মহাকবি আলাওলের একটি অন্যতম বিখ্যাত ও উপদেশমূলক কাব্যগ্রন্থ। এটি দিল্লীর শেখ ইউসুফ গদার[৯২] ইসলামি শরিয়ত সংক্রান্ত ফারসি ভাষায় রচিত ছন্দবদ্ধ একটি উপদেশগ্রন্থ 'তোহফাত-উন- নাসাঈ' এর স্বাধীন অনুবাদ। গ্রন্থটি ৭৮৫ হিজরী বা ১৩৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে লিখিত হলেও তার ২৭৮ বছর পরে ১০৭৩ হিজরী বা

১৬৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে কবি আলাওল আরাকানের মহামাত্য মুহম্মদ সোলায়মান এর আদেশে এর কাব্যানুবাদ 'তোহফা' নামে সম্পন্ন করেন।[৯৩] কাব্যটি আলাওলের 'অনূদিত কাব্য' হলেও অন্যান্য কাব্যের মত এখানেও তিনি অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন।

কবির অন্যান্য কাব্যের মত 'প্রস্তাবনা' অংশে না'ত তথা রসুলের (স.) শানে স্তুতি, 'গ্রন্থ পরিচিতি' আদেষ্টা প্রশস্তি' গ্রন্থ সূচনা, প্রভৃতি বর্ণনার পর মৌলিক কাব্যাংশ শুরু করেছেন। এ ক্ষেত্রে না'ত অংশে মহানবি (স.) কে সৃষ্টির সেরা ও মর্যাদাসম্পন্ন, সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী অনন্য সাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এমন মর্যাদার অধিকারী যে, তার নাম স্মরণের মধ্যদিয়ে আল্লাহ তায়ালা পাহাড় সমান পাপও ক্ষমা করে দেন। মূলত তার আগমনের মধ্য দিয়ে শুধু আরববিশ্বই নয় গোটা বিশ্ব থেকে শিরক বিদয়াতের মুলোৎপাটন ঘটে।[৯৪] মহানবি (স.) সম্পর্কে যেমন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় যেমনি তাঁকে একজন খাঁটি রসুল প্রেমিক কবি হিসেবে নির্ণয় করা যায়।

'তোহফা' কোন কল্পকাহিনী কিংবা রূপকথাকেন্দ্রিক কাব্য নয়। এটি মূলত মুসলমানদের শরিয়াহ ভিত্তিক জীবন যাপনের কতিপয় মৌলিক বিধানকে সামনে রেখে রচনা করা হয়েছে। ফিকহ শাস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'হিদায়াহ'। এ গ্রন্থের সারকথার আলোকেই কবি এ কাব্য রচনা করেন। শেষ জীবনের কাব্য এবং ধর্মীয় বিষয়কেন্দ্রিক রচনা হবার কারণে কোন কোন গবেষক[৯৫] বলেন "কবি ছিলেন ধর্মভীরু সুফী ধর্মাবলম্বী। তোহফা রচনার সময় তিনি সুবৃদ্ধ, তার উপর জরাজীর্ণকায়। পরকালের ডাক কবির মনে হয়তো বাজছে। ইসলাম ধর্মের শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কবি তোহফা রচনায় হাত দিয়েছেন।" ইসলামি শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে 'তোহফা' কাব্যটি ইউসুফ গদার কাব্য থেকে অনূদিত হলেও বিভিন্ন স্থানে কবি নতুন কথা যেমন সংযোজন করেছেন তেমনি ইসলামি বিধানের বিভিন্ন পরিভাষার ক্ষেত্রেও ছন্দ ও কাব্য মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য বিকল্প শব্দও প্রয়োগ করেছেন। যেমন না'ত অংশসহ কাব্যের বিভিন্ন স্থানে আরবি ফারসি শব্দ সম্ভারের ব্যবহার যেমন কাব্যের শোভাবর্ধন করেছে তেমনি শরিয়তের বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের বিকল্প ও সমার্থবোধক স্থানীয় শব্দের প্রয়োগ কাব্যকে আরও ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে। যিনি পরম স্রষ্টা আরব অঞ্চলে তিনি আল্লাহ, পারস্যে তিনি খোদা এবং কবি আলাওলের কাব্যে তিনিই ভাষাগত রূপান্তরিত হয়ে প্রভু, ঈশ্বর, স্বামী, বিধি, বিধাতা প্রভৃতি হয়েছেন।[৯৬] এভাবে কবি আলাওল আল্লাহ শব্দের বিকল্প হিসেবে প্রভু, ঈশ্বর, খোদা, করতার, বিধি, বিধাতা, নিরঞ্জন, স্বামী, বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে বুঝাতে) দয়াল, গোঁসাই, কর্তা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া মুসলমানদের ধর্মীয় নেতার আসনে অধিষ্ঠিত দ্বীন প্রচারের কাজে আত্মনিয়োজিত মহান ব্যক্তিদেরকে (ফারসি ভাষায়) পীর বলে আখ্যা দেয়া হয়; আরব অঞ্চলে তাদেরকে শাইখ, অলী কিংবা মুজাদ্দেদ বলে সম্মান

দেয়া হলেও কবি আলাওল তাদেরকে স্থানীয় ভাষায় গুরু, উস্তাদ, পীর, মুরশিদ প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া শরিয়তের পারিভাষিক শব্দ জান্নাত ও জাহান্নামকে তিনি জান্নাত-জাহান্নাম, স্বর্গ-নরক, লক্ষ্মী-দোজখ প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ইউসুফ গদার তুহফাত-উন-নাসাঈ ও কবি আলাওলের 'তোহফা' উভয় কাব্য পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, আলাওল স্বীয় তোহফা কাব্যে স্থানীয় লৌকিকতা, বোধ-বিশ্বাস ও বিভিন্ন আচার আনুষ্ঠানিকতার আলোকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছেন। ভাষার বাচনভঙ্গি, উপমা-উদাহরণ এবং বাক্য বিন্যাস আকর্ষণীয় করতে কবির দেশীয় উপাদানের মধ্য থেকে এ ধরনের শব্দ চয়নকে হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবিত[৯৭] বলে উল্লেখ করা হলেও এটা যে কাব্যকে সকলের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য ও উপাদেয় হিসেবে উপস্থাপন করার কৌশল তা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত। কবি সুকৌশলে দেশীয় শব্দ ভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়েছেন বলেই তার কাব্যসম্ভার বাংলা ভাষাভাষিদের উপাদেয় ভাণ্ডারে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছিল। এক কথায় বলা যায়, 'তোহফা' শরিয়তের বিধান সম্বলিত গ্রন্থ হলেও এতে যেমন বাচনভঙ্গির সরসতা আছে তেমনি বাকপটুতা ও শাস্ত্রনীতির মৌলিক বিন্যাসও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

'তোহফা' কাব্যটি মোট ৪৫টি বাব বা অধ্যায়ে বিভক্ত। ইসলামি শরিয়াহ ও সমাজ বিজ্ঞানের নিরিখে সে অধ্যায়গুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করে উল্লেখ করা যায়।[৯৮]

প্রথমত, ইসলামি শরিয়াহ বিধান : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের বোধ বিশ্বাস ও তার ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এর ব্যাপ্তি আছে। তদুপরি বাহ্যত ইসলামের ধর্মীয় রীতি-নীতিকেই এ ভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন - তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ, ঈমান তথা আল্লাহ, রসুল, ফিরিস্তা, আসমানী কিতাব, পরকাল, পুনরুত্থান, ভাগ্যের ভালমন্দ প্রভৃতির প্রতি ঈমানিয়াত, গোর-সওয়াল বা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রথম ধাপ কবরের সওয়াল, শাস্ত্র ব্যবস্থা তথা পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতি, ইবাদত তথা দাসত্বের বহিঃপ্রকাশের উন্নততর মাধ্যম বিশেষত নামাজ, কছর নামাজ, যাকাত, দান খয়রাত, সিয়াম বা রোজা, পুন্যময় রাত্রি, কদর, কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়া পাঠ, সবর বা ধৈর্য ধারণ, পাপ মোচনের পক্ষে 'তওবা', বার মাসের বিভিন্ন ফজিলত তথা বার চান্দের মর্যাদা, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজকে বিলিয়ে দেয়া অর্থাৎ শহীদ হওয়া, জান্নাত, জাহান্নাম, সুন্নাত, (ফরজ বিষয় ছাড়া সুন্নত পর্যায়ের কাজ) আল্লাহর উপর ভরসা বা তাওয়াক্কুল প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি শরিয়তের এ সকল বিষয় কাব্য ভাষায় বর্ণনার মধ্য দিয়ে আরাকানের জনসমাজে ইসলামের মৌলিক বিষয়সহ তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয়ত, পারিবারিক জীবন বিষয়ক : ব্যক্তি থেকেই গড়ে ওঠে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি। সুতরাং পারিবারিক জীবনের বিষয়গুলো ব্যক্তি জীবন থেকেই উত্থিত। ইসলাম এ বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিশীলিত উপায়ে উপস্থাপন করেছে। কবি

আলাওল সে নীতিমালাকে কাব্যাকারে উপস্থাপন করেছেন তার তোহফা কাব্যে। বিশেষত বিয়ে, স্বামী-স্ত্রী মিলন পদ্ধতি, খাদ্যগ্রহণ তথা ভোজন, পানীয় গ্রহণ তথা জলপান, পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ তথা বস্ত্র পরিধান, নিদ্রা, খেলাধুলা বা ক্রীড়া, শিকার পদ্ধতি, সুস্বর বা মিষ্টি সরে সরস কথাবার্তা, চিন্তাশোক, বার্ধক্য প্রভৃতি বিষয়গুলো উপস্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন পরিচালনায় ইসলামের আদর্শকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তৃতীয়ত, সামাজিক লেনদেন তথা সমাজ বিষয়ক : ব্যক্তি সমষ্টিতে যেমন পারিবারিক অবকাঠামো বিনির্মিত হয় তেমনি পরিবার সমষ্টি নিয়েই গঠিত হয় সমাজ। পরিবারের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্য থাকলেও সামাজিক জীবনে যেহেতু বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের সঙ্গে বসবাস করতে হয় সেহেতু পরিবারের চেয়ে সামাজিক চেতনার ব্যাপ্তি অনেক বেশী। কবি সামাজিক জীবন বিষয়ে ইসলামের সুমহান দৃষ্টিভংগীকে এ কাব্যে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন যেমন - বিভিন্ন বৈঠক সভা সমিতি সম্পর্কিত আদব কায়দা তথা ইলমের মজলিশ, মুসাফিরের প্রতি ব্যবহার, মন্দের জবাবে ভালো আচরণ বা সুপ্রকৃতি, হিংসা তথা পিষুন, নেকী তথা পূন্য বা ছওয়াবমূলক কাজ, সাহায্য করা তথা দান, বখিলতা বা কৃপণতা, অর্থ সম্পদ সঞ্চয়, ঋণ লেনদেন, মানুষ বা প্রাণি হত্যার বৈধতা ও অবৈধতা, বাণিজ্যিক লেনদেন তথা সওদাগরী প্রভৃতি সামাজিক রীতি পদ্ধতি।

উল্লেখ্য, কাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিভংগীর প্রতিফলন ঘটলেও সঙ্গীত শোনা, নৃত্য, সময়ের শুভাশুভসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লৌকিক আচার-আচরণ ও উপস্থাপিত হয়েছে। কবি সাহিত্যিকগণ যে সামাজিক ও লৌকিক আচার-আচরণের উর্ধ্বে নয় এ সবের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি তাও প্রমাণ করেছেন। সেইসাথে এ গ্রন্থের লোকাচার বিষয়ক বিধি নিষেধের আড়ালে তৎকালীন আরাকানের নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনচিত্রও অনুমান করা যায়।

৪.২.২.৬ সিকান্দরনামা

সিকান্দরনামা আলাওলের শেষ কাব্য গ্রন্থ। এটি ফারসি কবি নিযামী গঞ্জাবী রচিত 'ইস্কান্দরনামা' কাব্যের ভাবানুবাদমূলক কাব্য। কবি আলাওল আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মার (১৬৫২-৮৪ খ্রি.) প্রধান অমাত্য নবরাজ মজলিশের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৭১ থেকে ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে[৯৯] এটি রচনা করেন। অনূদিত কাব্য হলেও এটি যেমন ছিল স্বাধীন ও ভাবানুবাদ তেমনি কাব্যের বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব রচনাও বিদ্যমান। দ্বিগীজয়ী সিকান্দর, প্রজ্ঞাবান ও দার্শনিক সিকান্দর এবং নবী সিকান্দর এ তিন খণ্ডে কবি নিযামী কাব্যাটি সমাপ্ত করলেও কবি আলাওল কেবলমাত্র 'সিকান্দর নামাহ-ই বরাহ্ অর্থাৎ দ্বিগীজয় খণ্ডই অনুবাদ করেছেন।[১০০] বিশ্ব বিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযান সম্পর্কিত যে সমস্ত গল্প কাহিনী ইরানে প্রচলিত ছিল, তারই কয়েকটি কাহিনী নিয়েই এ কাব্যটি রচিত হয়েছে। এ কাব্যটি বর্ণনামূলক হওয়ায় আলাওলের

কবিত্বের দীপ্তি খানিকটা ম্রিয়মান মনে হলেও কবি সেখানে নিজেকে বন্ধনমুক্ত বলে স্বাধীনভাবে নিজস্ব চিন্তার পরিস্ফুটন ঘটিয়েছেন; সেখানেই তার কবিভাষা, ধ্বনিমাধুর্য ও ব্যাঞ্জনা গৌরবে অপরূপ হয়ে উঠেছে। মুক্তার লাবণ্য ও হীরার দীপ্তি তা যেন ভাস্বর হয়ে কাব্যাকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।[১০১] তিনি কাব্যের মূল কাঠামো ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সংযোজন ও বিয়োজনের সুক্ষ্ম মিলনের মাধ্যমে নতুনত্বের অমৃত কাব্যরস দানে স্বার্থক হয়েছেন।

সিকান্দরনামা কাব্যটি অনূদিত হলেও কাব্যের বর্ণনা ভংগী ও উপস্থাপন কৌশল আলাওলের নিজস্ব, যা আগেই বলা হয়েছে। নিযামীর কাব্য বর্ণনার পাশাপাশি ইরানের ইসলামি সংস্কৃতি দ্বারা আলাওল প্রভাবিত হলেও তিনি সপ্তদশ শতকের বাংলা আরাকানের স্থানীয় সমাজ সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, যুগরুচি এবং বোধ বিশ্বাসকে ভুলতে পারেননি। ফলে কবির কাহিনী নির্মাণে, বর্ণনার কৌশলে, পারিভাষিক শব্দ সম্ভার প্রয়োগ-নৈপুন্যে এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা, উদাহরণ প্রভৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের ধর্ম দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অন্যান্য গ্রন্থের মতই কবি এ গ্রন্থেরও শুরুতে হামদ, আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র, মুনাযাত, পয়গাম্বরের সিফত, মহানবি (স.) এর মিরাজ, হযরত আবুবকর (রা.), হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) এবং হযরত আলী ইবনে আবিতালিব (রা.) সংক্রান্ত চারি আসহাবের প্রশস্তি, কিতাবের আগাম বা উপক্রমণিকা, নিযামীর স্বপ্ন, তত্ত্বকথা, খোয়াজ খিজির কর্তৃক নিযামীকে উপদেশ দান, আরাকান শাসকের প্রশস্তি তথা রোসাঙ্গ রাজস্তুতি, আরাকান তথা রোসাঙ্গ রাজ্যের অভিষেক, কবির আত্মকথা, কাহিনী সার প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন।[১০২] এ সকল প্রারম্ভিক প্রশস্তিমূলক ও আত্মবিবরণীমূলক বর্ণনার মধ্যে কবির পবিত্র কুরআন ও হাদিসের স্বার্থক প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। এখানে অতি সহজেই ইসলামি আদর্শের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে অন্যান্য কাব্যের মত এ কাব্যেও কবি দেশীয় ভাষা-সংস্কৃতির স্বার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। বিশেষত আল্লাহ শব্দের বিকল্প হিসেবে ঈশ্বর, বিধি, প্রভু, করতার, নিরঞ্জন, বিধাতা, অবতার, দয়াল প্রভু, মহাপ্রভু, জগদীশ, কৃপাময় স্বামী ইত্যাদির যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি পীর শব্দের বিপরীতে গুরু এবং সালাম শব্দকে আদাব বা প্রণাম শব্দে ব্যবহার করেছেন।

মধ্যযুগের কবিদের সাহিত্যিক উপাদান সংগ্রহ করতে হতো পৌরানিক কাহিনী থেকে. কবিদের কাব্যে প্রাচীন অষ্ট্রিক-মঙ্গল জাতি-শ্রেণীর অবিকশিত বুনো সমাজের আচার ধারণা, সংস্কার-প্রথা প্রভৃতি পরবর্তীকালে হিন্দু বৌদ্ধ সমাজে প্রবেশ করে এবং সেখানে নতুন আদর্শের সংমিশ্রণে তৈরী হয় একটি স্বকীয় সাংস্কৃতিক ধারা। অবশেষে প্রাচীন সাংখ্য যোগতান্ত্রিক শৈব প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির শাখা প্রশাখার সাথে নবাগত ইসলামি শরিয়াহ দর্শন, নিজস্ব দৃষ্টিভংগী ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক ধারা নিয়ে বিকশিত হলেও সময়ের ব্যবধানে অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর

গ্রহণ বর্জনের ভিত্তিতে একটি সংস্কারধর্মী সাংস্কৃতিক বলয় তৈরী হয়।[১০৩] মধ্যযুগের কবিগণ সেই প্রভাবের ভিত্তিতেই সাহিত্য রচনা করেছেন; মহাকবি আলাওলও এ গণ্ডি থেকে ভিন্নতর কোন ধারা তৈরী করতে সক্ষম হননি। তার রচিত উপরোদ্ধৃত ছয়টি কাব্যের অতীব সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কবির অন্তরাত্মার সাথে ইসলামের সুমহান আদর্শ মিশে থাকলেও দেশীয় শব্দ ভাণ্ডার ও ভাষা শৈলি প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাহ্যত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য জীবনপ্রসৃত ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এটা মূলত ইসলামের উদারতার সুমহান শিক্ষার কারণেই হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। দেশজ শব্দের ব্যবহারকে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের প্রভাব বলে ধারণা করা হলেও একথা সত্য যে, কবি আলাওলের কাব্যসমূহে ভোগ ও ত্যাগ এ দুটি তত্ত্ব পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। উভয় বিবরণ অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও অবশেষে তিনি ত্যাগের পথেই মানুষের জীবন মুক্তির জয় ঘোষণা করেছেন। সাংসারিক মায়ামোহ ও বিলাস-জৌলুষ কাটিয়ে আল্লাহর পথে আকর্ষণ বোধ নিঃসন্দেহে কবির ইসলামি চিন্তাচেতনার প্রভাবেরই ফল। কবি আলাওলের কাব্য ভাণ্ডারের মধ্যদিয়ে সত্যিকার অর্থেই আরাকানে ইসলামি সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জীবনাদর্শের সুস্পষ্ট প্রভাব ফুটে উঠেছে।

৪.২.৩ কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর

মাগন ঠাকুর মধ্যযুগের একজন মৌলিক কবি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সেকালের প্রায় সকল কাব্যই অনূদিত কিংবা পৌরানিক কাহিনী নির্ভর। মৌলিক রচনার পরিচয় অতীব নগন্য হিসেবে পাওয়া যায়। মৌলিক রচনার এমন সংকটকালে কোরেশী মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী' কাব্য একটি বিরল উদাহরণ।[১০৪] কবি কোরেশী মাগন এবং অমাত্য কোরেশী মাগন ঠাকুর এক ব্যক্তি কি না এ বিষয়টি বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। কবি ও অমাত্য মাগন ভিন্ন ব্যক্তি বলে মতামত পেলেও যেহেতু কবি মাগনের আলাদা কোন পরিচয় ও কাব্য রচনার সময়কাল আজও নির্ণয় করা যায়নি তাই সন্দেহাতীতভাবে না হলেও দুই মাগনকে একই ব্যক্তি হিসেবে ধরে নিয়ে কাব্য রচনার কালকে ১৬৫০ খ্রি. থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনুমান করা যেতে পারে। কবির উদ্ধারকৃত 'চন্দ্রাবতীর' ভনিতা অংশ উদ্ধার না হওয়ায় এ বিষয়টিও প্রচ্ছন্ন রয়ে গেল। তবে যেহেতু কবি আলাওল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৪৬ - ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেছেন এবং তখন তাঁকে আরবি-ফার্সি ভাষায় পারদর্শী, বর্মি ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত, ভেষজ ও যাদু বিদ্যায় দক্ষ এবং কাব্য ও নাট্যকলায় অনুরাগী বলে উল্লেখ করেছেন।[১০৫] হয়তো আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য রচনার পরে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পূর্ব মূহূর্তে তিনি এ কাব্য রচনা করেন। যদি আগেই রচনা করতেন তবে আলাওল তার পদ্মাবতী কাব্যে এ বিষয়ে উল্লেখ না করে ছাড়তেন না।

চন্দ্রাবতী কাব্যের ভনিতা অংশ উদ্ধার না হওয়ার কারণে যেমন কবি পরিচিতি ও কাব্য রচনার সময়কাল নির্ণয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তেমনি এ কাব্য থেকে ইসলামের প্রভাব নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। কেননা কবিগণ এ সকল প্রণয়োপখ্যানের ভনিতা অংশেই আল্লাহর প্রশংসা, রাসুল (স.) এর শানে না'ত বা স্তুতি প্রভৃতি বর্ণনা করে থাকেন এবং এর মধ্য দিয়েই মূলত তার ইসলামপ্রিয়তা ও সমকালীন রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে ইসলামের প্রভাব নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু এ কাব্যে ভনিতাংশ না থাকায় তা প্রায় অসম্পন্নই রয়ে গেল। তবে কবি তার মৌলিক রচনা এ কাব্যের মধ্যে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে আলাওল তাঁকে ভোজ্যবিদ্যায় পারদর্শী বলে উল্লেখ করেছেন এবং তার প্রমাণ স্বরূপ এ কাব্যে ভোজবিদ্যা বলে মানুষকে পাখি করে রাখা, চিত্রদর্শনে প্রেমে পড়া, ঝড়, সাপ, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতির কবলে পড়া, বন থেকে অপহৃতা রাজকন্যাকে উদ্ধার করা প্রভৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে লোকজ ও দেশজ সংস্কৃতির উপস্থাপন করেছেন।

৪.২.৪ কবি মরদন

কবি দৌলত কাজীর সমসাময়িক কালের কবি ছিলেন মরদন। ঐতিহাসিক আবদুল করিম তাঁর নাম মরদন নুরুদ্দিন বলে উল্লেখ করেন।[১০৬] তিনি আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মা ওরফে সিকান্দার শাহ দ্বিতীয় এর শাসনামলে (১৬২২-১৬৩৮ খ্রি.) কাব্য চর্চা করেন। তিনি আরাকানের অমাত্য সভার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন কিনা এ নিয়ে সংশয় থাকলেও পৃষ্ঠপোষকতা পাবার তথ্যও পাওয়া যায়।[১০৭] কবি মরদন 'কাঞ্চি' নামে এক শহরে বাস করতেন এবং সেখানে বসেই কাব্য চর্চা করেছিলেন।[১০৮] এ কাঞ্চি নগরকে আহমদ শরীফ চট্টগ্রামের কোন এক অঞ্চল বলে অনুমান করলেও[১০৯] আবদুল করিম একে আরাকানের অন্তর্ভুক্ত কোন শহর বলে উল্লেখ করেন।[১১০] তবে একথা সত্য যে, রাজা থিরি থু ধম্মার শাসনামলে চট্টগ্রামও আরাকানের অংশ ছিল। অতএব কাঞ্চি চট্টগ্রামের কোন অঞ্চল হলেও তা প্রকারান্তরে আরাকানেরই অংশ ছিল।

যা হোক কবি মরদন কর্তৃক উপস্থাপিত কাঞ্চি নগরে মুসলিম ও হিন্দু বসতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত মুসলমান প্রভাব খুব বেশী লক্ষ্যণীয়। কবির ভাষায় -

> ভুবনে বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরী / রাবনের যেহেন কনক লঙ্কাপুরী ॥
> সে রাজ্যেত আছে এক কাঞ্চি নামে পুরী / মুমীন মুসলমান বৈসে সে নগরী ॥
> আলিম মৌলানা বৈসে কিতাব কারণ / কায়স্থগণ বৈসে সব লেখন পড়ন ॥[১১১]

উপরোদ্ধৃত কাব্যাংশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রোসাঙ্গ নগরী অর্থাৎ আরাকানের রাজধানী ম্রোহংয়ের কাছাকাছি কোন পুরী বা নগর 'কাঞ্চিপুর'; এখানে মুসলমান ও হিন্দুদের মিলন মেলা। মুমিন-মুসলমান, আলিম মাওলানা মজলিশে মিলিত হয়ে পবিত্র কুরান-হাদিস আলোচনা করে থাকেন। সেইসাথে হিন্দু কায়স্থগণও মিলিত হয়ে লেখা পড়া

করে থাকেন। কাব্যের এ অংশে বৌদ্ধদের কোন বিবরণ দেয়া হয়নি। এ জন্য সম্ভবত আহমদ শরীফ 'কাঞ্চি' বলতে চট্টগ্রামের কোন অঞ্চল বুঝিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি তো এমনটিও হতে পারে যে, ম্রোহং এর পার্শ্ববর্তী যে সকল স্থানে গৌড়ীয় সৈন্যদের বসবাসের জন্য সেনা ছাউনি নির্মাণ করা হয়েছে তারই কোন একটি বসতির নাম কাঞ্চি; যেখানে বাংলা থেকে আগত গৌড়ীয় মুসলমান ও হিন্দু সৈনিকদের বংশধরগণই বসবাস করে থাকেন। সুতরাং এটা আরাকানেরই কোন অংশ বলে ধরে নেয়া যায়।

কবি মরদন রচিত কাব্যের নাম 'নসিবনামা' যার অর্থ হয় 'কপালের লিখন'। এ কাব্যের নামকরণ এবং ঘটনার বিররণীতে মৌলিক মিল লক্ষ্য করা যায়। অথচ ড. এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এ কাব্যের নাম নাছিরানামা বলে উল্লেখ করেছেন।[১১২] অবশ্য পুঁথি-পরিচিতি গ্রন্থে এ নামটি শুদ্ধ করে 'নসিবনামা' করা হয়েছে। নামকরণের দিক থেকে 'নসিবনামা' একটি স্বার্থক নাম। কেননা কাব্যের মূল বক্তব্যের বিষয়বস্তু হলো - আবদুন নবী ও আবদুল করিম নামক দুজন সওদাগরের মধ্যে সখ্যতা ছিল এবং তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, তাদের একজনের পুত্র ও অন্যজনের কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তারা উভয়কে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করবে। তাদের ছেলে মেয়ে জন্ম নিলেও ঘটনাচক্রে আবদুল করিম সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং আবদুন নবী এতে তার প্রতিজ্ঞা অমান্য করে তার ছেলেকে অন্যত্র বিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। আবদুল করিম তাঁকে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে দিতে গেলে সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসে। অতঃপর আবদুল করিমের স্ত্রী নানা ধরনের নীতিকথা বলে স্বামীকে সান্ত্বনা দেয় এবং বুঝাতে চায় যে, অদৃষ্টলিপি খণ্ডন হবার নয়। পরে অবশ্য আবদুন নবীর ছেলের সঙ্গে আবদুল করিমের মেয়ের বিয়ে হয়।

অত্র কাব্যের মাধ্যমে যে সকল নীতিকথার অবতারণা করা হয়েছে তাতে আল্লাহর প্রতি মানুষের তাওয়াক্কুল বেড়ে যায় এবং শেষে আল্লাহর নিবন্ধন থাকলে তা যে কেউ খণ্ডন করতে পারে না' এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তির পরিবেশ তৈরী হয়েছে। এছাড়া মুসলমান নাম ও কাহিনী রচনার মধ্য দিয়ে কবি মরদন আরাকানে রচিত বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। মূলত উপাখ্যানের সব কথার মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মবুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান দানের জন্যই হিন্দুদের মঙ্গলকাব্য রচনার পাশাপাশি এ কাব্য মুসলমান সমাজকে উজ্জীবিত করেছিল। মঙ্গল পাঁচালীর সঙ্গে 'নসিবনামা' উপাখ্যানের তুলনা করলে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনচেতনার এবং জগৎ ভাবনার তথা জীবনের মূল্যবোধ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য আদর্শ এবং চাওয়া পাওয়ার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।[১১৩] সর্বোপরি এ কাব্য থেকে ওয়াদার প্রতি যত্নবান হওয়া, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

৪.২.৫ আরাকান অমাত্য সভার প্রভাবিত কবি

কবি দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর ও কবি মরদন ছাড়াও আরাকানে বিকশিত বাংলা সাহিত্যের আশু প্রভাবের ফলে চট্টগ্রামে বসবাসকারী অথচ ভাষা কিংবা পূর্বপুরুষ আরাকানী প্রশাসনের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত ছিলেন; এমন কবিদের সংখ্যাও কম নয়। তারাও আলাওলদের পদাংক অনুসরণ করে সাহিত্য রচনা করেছেন এবং তাদের কাব্যেও আরাকানী ইতিহাসের উপাত্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমন কবিদের মধ্যকার কয়েকজনের নাম পরিচয় ও কাব্য সম্ভারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

আরাকান প্রশাসন প্রভাবিত কবিদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শক্তিশালী মুসলিম কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার।[১১৪] তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী হলেও তার পূর্বপুরুষ বুরহান উদ্দীনসহ অনেকেই আরাকান অমাত্য সভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এ কবির তিনটি প্রধান কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় যথা জঙ্গনামা, মুসার সওয়াল ও শরীয়তনামা। জঙ্গনামা কাব্যে বর্ণিত বিষয়বস্তু হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সহযোগী হিসেবে খ্যাতিমান রণবীর হযরত আলী (রা.) কর্তৃক কাফির রাজ্য বিজয় ও প্রজাসহ রাজাদের ইসলামে দীক্ষা দান। এ বিষয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে কবি অনেক অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেছেন।[১১৫] সোনাভান জৈগুন বিবি প্রভৃতি কল্প কাহিনীমূলক কাব্যের মত কাল্পনিক উপমা দিয়ে সাজানো হলেও 'জঙ্গনামা' কাব্যের মাধ্যমে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করাই মূল টার্গেট ছিল। মুসার সওয়াল কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের আর একটি কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে কোহ-ই-তুরে হযরত মুসা (আ.) এর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের আকারে ইলম, ইবাদত, দয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে আল্লাহর আলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।[১১৬] সেই সাথে শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হযরত মুসা (আ.) ও আল্লাহর কথোপকথনের মাধ্যম স্বয়ং আল্লাহর মুখে স্বীকার করানো এবং এ অমোঘ পাথুরে সাক্ষ্য প্রমাণ জনগণের মনে দৃঢ়মূল করা এ কাব্যের মূল লক্ষ্য।[১১৭] এ কাব্যে কবি আল্লাহ তায়ালা ও মুসা (আ.) এর কথোপকথনের উল্লেখ করলেও দেশজ ভাষা শৈলীকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছেন।

'শরীয়তনামা' নসরুল্লাহ খোন্দকারের সবচেয়ে আলোচিত ও বহুল প্রচারিত কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় কবির শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের ছাপ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে আরবি-ফারসি শব্দের মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার যেমন কবিকে আরবি-ফারসি ভাষার সুপণ্ডিত বলে স্বীকৃতি দেয় তেমনি ইসলামের বিধানসমূহ আলোচনার সময় অবলীলাক্রমে পবিত্র কুরআন-হাদিস ও প্রামাণ্য ফিকহ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দান তাকে ইসলামি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে প্রমাণ করে।[১১৮] প্রতিটি বিষয়ের বিবরণে কাব্যের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পবিত্র কুরআন হাদিসের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। তবে তিনি পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ আয়াতের উদ্ধৃতি না দিয়ে বরং আয়াতের প্রথম শব্দের উদ্ধৃতি দিয়েই

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। শরিয়তের বিভিন্ন বিষয় যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, মৃত ব্যক্তির গোসল প্রদান, কাফন-দাফন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে কুরআন হাদিস সম্মত এবং তিনি যে সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছেন তা সত্যিই কুরআন সুন্নাহ বিরোধী। শুধুমাত্র ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কিত রসুল (স.) কর্তৃক রেখে যাওয়া খুরমা খাওয়ানো এবং আকাশের এক বৃক্ষে সকল মানুষের নাম লেখা থাকার কাহিনীর[১১৯] সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়সমূহ ছাড়াও এ গ্রন্থ সমসাময়িক বাংলা-চট্টগ্রাম ও আরাকানের মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাসের সহায়ক উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায়।[১২০] কবি এ গ্রন্থে শরিয়তের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন। ফলে গ্রন্থটি সামাজিক ইতিহাস রচনার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান উৎস। এ সকল আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু সম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে আরাকানী সমাজ জীবনে ইসলামের প্রভাব বিশ্লেষণ করা সহজতর হয়ে ওঠে।

আরাকানের অমাত্য সভার পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত আর একজন কবির নাম আবদুল করিম খোন্দকার। তিনি আরাকানেই জন্ম গ্রহণ করেন। তার প্রপিতামহ রসুল মিয়া আরাকানের রাজার 'বিষয় পদবী' পেয়ে সমুদ্রপথে বাণিজ্য তরীর হাসিল উসুলকারী বা ট্যাক্স-কালেক্টররূপে কাজ করেন। পিতামহ মদন আলী আরাকানের রাজার দোভাষী বা ইন্টারপ্রেটর হিসেবে রাজা ও বিদেশী বণিকদের মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথনের অনুবাদকের কাজ করতেন।[১২১] তার পিতা আকবর আলী কোন বড় পদে ছিলেন কিনা তা কবি উল্লেখ করেননি। তবে কবি কমপক্ষে চারপুরুষ ধরে যে আরাকানে বসবাস করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কবি আবদুল করিম খোন্দকার তিনটি কাব্য রচনা করেছেন যথা 'দুল্লাহ মজলিশ', হাজার মাসায়েল এবং তমিম আনসারী। কবি ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজার রাজকোষাধ্যক্ষ আতিবর নামক জনৈক ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় কবি দুল্লা মজলিশ কাব্য রচনা করেন।[১২২] কবি সমসাময়িককালের রাজার নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে দুল্লা মজলিশ রচিত হলে সে সময় আরাকানের রাজা ছিলেন নরাপায়া (Narapaya) (১৭৪২-১৭৬১ খ্রি.), আতিবর তার কোষাধ্যক্ষ এবং টাকশালের অধিকর্তা ছিলেন। তাকে রাজা 'সাদিউক নানা' উপাধিতে ভূষিত করেন। দুল্লা মজলিশ কাব্যে কবি সুদীর্ঘ আত্মকথার পাশাপাশি আরাকানের বন্দর, নদী, ঘাট প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। সেইসাথে আরাকানের কাজি, মুফতি, ফকির-দরবেশসহ জ্ঞানী গুণী মুসলমানদের বসবাস ও জীবন যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন।[১২৩] দুল্লা মজলিশ তেত্রিশটি বাব বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এ গ্রন্থে কবি হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ, লুত (আ.), শোয়েব (আ.) আইয়ুব (আ.), মুসা (আ.), সোলায়মান (আ.) সহ অনেক নবি এবং হাসান বাসরী, হাসান কুরায়শী ও আবু সৈয়দ প্রমুখ সাধকদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করে নীতিশাস্ত্র ও ধর্মবিষয়ক উপদেশমূলক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

এছাড়া এ গ্রন্থে রোজা ও বেহেস্তের বৃত্তান্তও বর্ণিত হয়েছে।[১২৪] হজার মাসাইল কাব্যে যেমন ফিক্হ শাস্ত্রের বিভিন্ন মাসয়ালা মাসাইল বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি নুর নামা কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। এ হিসেবে আরাকানে ইসলামের প্রভাব বিশ্লেষণে কবি আবদুল করিম খোন্দকারের কাব্যসমূহের মধ্যে দুল্লা মজলিশই বেশী গুরুত্ব বহন করে।

উপর্যুক্ত কবিদ্বয় ছাড়াও শুজা কাজী নামে পরিচিত কবি আবদুল করিম অন্যতম কবি ছিলেন। তিনি আরাকানের সরদার পাড়ার অধিবাসী। এ কবি আঠাশ শতকের শুরুতে ইন্তেকাল করেন। তিনি কাব্যাকারে 'রোসাঙ্গ পাঞ্চালা' নামে আরাকানের ইতিহাস সম্বলিত একখানা কাব্য রচনা করেন।[১২৫] কিন্তু এ কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

কবি আবদুল করিম ছাড়াও ম্রোহংয়ের কবি আবুল ফজলের অংদমের লড়াই; আরাকানের কাইমের অধিবাসী কাজী আবদুল করিমের রাহাতুল কুলুব, আব্দুল্লাহর হাজার সওয়াল, নুরনামা, মধুমালতী, দরীগে মজলিশ; কাইমের অধিবাসী ইসমাইল সাকেব এর 'বিলকিসনামা'; কাজী মোহাম্মদ হোসেন এর আমির হামজা, দেওলাল মতি ও হায়দরজঙ্গ; আরাকানের অন্যতম কবি ও কাব্যগ্রন্থ।[১২৬] আরাকানের ইতিহাস রচনা এবং ইসলামের প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য কাব্যগুলি সহায়ক উৎস হিসেবে প্রয়োজনীয় হলেও এগুলোর প্রকাশনা ও সংরক্ষণের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তবে এ সকল পুঁথির খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন কিছু কপি দেশের বিভিন্ন পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে।

সাহিত্য মূলত সমাজের আয়না। এর মাধ্যমে সমাজের সংগতি ও অসংগতিসমূহ চিত্রিত করা যায়। সে নিরিখে কবি দৌলতকাজী থেকে আরম্ভ করে কাজী মেহাম্মদ হোসেন পর্যন্ত আরাকানী কবিদের কাব্য পর্যালোচনা করে আরাকানের ইসলামের প্রভাব বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে। মূলত একজন কবি-সাহিত্যিক লেখক বিশ্লেষণ, চিত্রায়ন ও প্রেসক্রিপশন, এ তিনটি পদ্ধতিকে সামনে রেখে সাহিত্য রচনা করেন। যেহেতু কবিরা সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে ইসলাম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়কে উপস্থাপন করে থাকেন সেহেতু সে বিষয়গুলো তারা বিশ্লেষণ ও চিত্রায়নের মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকেন। সাধারণত নিজস্ব বিশ্বাসের বিষয়কে প্রেসক্রিপশন আকারে উপস্থাপন করেন। এ দিক থেকে কবি দৌলতকাজী ও আলাওল থেকে শুরু করে আরাকানের সকল কবিই ইসলামি চিন্তা চেতনাকে বর্ণনা করতে দেশীয় শব্দ ভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়ে তাদের কাব্য সাহিত্যকে সকলের কাছে উপভোগ্য ও সমাদৃত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। মূলত ইসলামের উদারতার জন্যেই মুসলিম কবিগণ হিন্দুয়ানী কাহিনী, ধর্ম, সমাজ, আচার-আচরণও কাব্য প্রসাধন কলা গ্রহণ করেছেন। সংকীর্ণতার গণ্ডি পেরিয়ে দেশীয় মিথ ও ভাষাশৈলী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তারা উদারতা ও মহানুভবতাই দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। সেইসাথে নিজস্ব গতিধারায় সমাজের অসংগতি বিষয় ও অনৈসলামিক আচরণকে সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। তাদের রচনাবলী পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, আরাকানে ইসলামের যে সুমহান আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল তা সাহিত্যের অঙ্গনকেও সফলভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেখানকার

সাহিত্যিকগণ যেমন ছিলেন খাঁটি মুসলমান এবং তাদের লেখনীতেও ঈমান ও ইসলাম চর্চার অনেক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়।

পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জি

১ মুহাম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১।
২ তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১), পৃ. ২১।
৩ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড,* (ঢাকা : রেনেসাঁর্স প্রিন্টার্স, ১৯৬৩), পৃ. ৯।
৪ দেবেন্দ্র কুমার ঘোষ, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস,* (কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., ১৯৭৫), পৃ. ২০।
৫ ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (কলিকাতা : ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি., ১৩৭৭), পৃ. ১৪।
৬ শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের বিকাশধারা* (কলিকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৬৭), পৃ. ৩৭।
৭ মুহাম্মদ এনামুল হক, "মুসলিম বাংলা সাহিত্য" *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, প্রথম খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ২১৯।
৮ *তদেব।*
৯ আহমদ শরীফ, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা" *মাসিক মোহাম্মদী,* ২২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৫৮, পৃ. ৫৭৪।
১০ *তদেব,* পৃ. ৫৭৫।
১১ *তদেব।*
১২ হিন্দু শাসনামলে ধর্মীয় পণ্ডিতদের পক্ষ থেকেও ঘোষণা করা হয় যে, দেশজ ভাষায় অর্থাৎ দেবভাষা সংস্কৃত ছাড়া প্রাকৃত জনের বাংলা ভাষায় পুরান ও রামায়ন প্রভৃতির অনুবাদ বা শ্রবণ করবে কর্তাকে পরকালে রৌরব নরকে বসবাস করতে হবে। (অষ্টাদশ পুরানানি রামস্য চরিতানিচ। ভাষায় মানব শ্রুত্বা রৌরাবং নরকং ব্রর্জেৎ) এ আশংকায় কেউ বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় সাহস করেনি। দ্রষ্টব্য: *তদেব,* পৃ. ৫৭৩।
১৩ দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (কলিকতা: সান্যাল এন্ড কোম্পানী, ১৯৫১), পৃ. ৩৮।
১৪ মুহাম্মদ আবদুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৬।
১৫ আহমদ শরীফ, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা, *মাসিক মোহাম্মদী, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৭৩।
১৬ *তদেব,* পৃ. ৫৭৫।
১৭ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের সাধারণ পরিচিতির জন্য দেখুন, বড় চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,* অমিত্র সূদন সম্পাদিত (কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯), পৃ. ৭৭-৯১।
১৮ গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা,* প্রথম খণ্ড (কলিকতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., ১৩৭০), পৃ. ৩৯।
১৯ আহমদ শরীফ, *চট্টগ্রামের ইতিহাস, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১১।
২০ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৯৬।
২১ *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৬।
২২ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৯৬-৯৭।
২৩ *তদেব,* পৃ. ৯৭; আবদুল কাদির, 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৯০, পৃ. ৫৪।
২৪ আবদুল কাদির, 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৪।
২৫ জহর সেন, *দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস* (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৬), পৃ. ২৯।
২৬ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৯।
২৭ *তদেব।*

২৮ সুধীর কুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ, "বঙ্গের প্রাচীন মুসলমান কবি দৌলতকাজী, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৫২, পৃ. ২৩৩।

২৯ আবদুল হাফিজ, *বাংলা রোমান্স কাব্য পরিচয়*, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬), পৃ. ১২২-২৩।

৩০ S.M. Rizvi (Edited) *East Pakistan District Gazzetteers, Chittagong*, 1970, pp. 348-49 ; ড. আহমদ শরীফ, সম্পাদিত, *পুঁথি পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃ. ৫২৩; দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী*, (মযহারুল ইসলাম ও মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২; মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫১; আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৯। উল্লেখ্য, ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন- "আমরা সোলতানপুরে তাঁহার পৈতৃক বাস্তুভিটা দেখিয়াছি। তাঁহার ভিটায় এখন বাতি দিবার কেহ নাই। সম্ভবত কবি নিঃসন্তান ছিলেন।" [দ্রষ্টব্য: *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪।]

৩১ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩।

৩২ আবদুল করিম, *রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য*, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারক বক্তৃতা (চট্টগ্রাম: বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪), পৃ. ২১।

৩৩ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩।

৩৪ *তদেব*, পৃ. ৪৩-৪৪।

৩৫ কবির ভাষায় -

শ্রীযুক্ত আশরাফ খান অমাত্য প্রধান / ষোল কলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান॥
হেন মতে সভা করি বসিয়া থাকিতে / কহেন্ত সানন্দ চিত্তে প্রসঙ্গ শুনিতে॥
শেষে শুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি / শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী॥
তবে কাজী দৌলত বুঝিয়া সে আরতি / পঞ্চালীয় ছন্দে কহে ময়নার ভারতী॥

[দ্রষ্টব্য: দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী*, মাযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩]

৩৬ মাহবুব-উল-আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২।

৩৭ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী*, মাযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত, পৃ. ৪-২৫; অমৃতলাল বালা, *দৌলত কাজী: কবি ও কাব্য* (ঢাকা : প্রতীতি প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ৭৪।

৩৮ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- মুহাম্মদ আবদুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৪-২০৬; অমৃতলাল বালা, 'দৌলত কাজী : সতী ময়না লোর চন্দ্রানী কাব্যে লোক ঐতিহ্য,' *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবন-আশ্বিন, ১৪০২, পৃ. ১-২।

৩৯ দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭।

৪০ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন*, ১৯ খণ্ড (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩) পৃ. ৩০৭।

৪১ আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে দেখুন - *সূরা বাকারা* ১৬৩, *ইমরান* ১৮, *নিসা* - ৮৭, *মায়েদাহ*- ৭৩, *আনয়াম*- ১৯, ১০২; *ইউনুস*- ১৮; *হিজর* ৯৬-৯৯; *বনি ইসরাইল* ৪২-৪৩; *নহল* ৫১; *আম্বিয়া* - ১০৮; *নমল* - ৫৯-৬৬; *আনকাবুত* - ৪৬; *যুখরুফ* ৮৪-৮৫, *দুখান* ৭-৮: প্রভৃতি আয়াত।

৪২ দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭।

৪৩ *তদেব*, পৃ. ৪৮।

৪৪ কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ তায়ালা সাত শ্রেণীর লোককে তার আরশের নিচে ছায়া দান করবেন, তাদের মধ্যে প্রথম সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই হচ্ছেন ন্যায়পরায়ন শাসক। (বুখারী শরীফ) [দ্রষ্টব্য: আল্লামা ইমাম নববী (রহ.), *রিয়াদুস সালেহীন*, দ্বিতীয় খণ্ড, মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিয়া কুরআন মহল, ২০০১), পৃ. ১৩১।]

৪৫ দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮।

৪৬ *তদেব।*

৪৭ *তদেব*, পৃ. ৪৯।

৪৮ *তদেব*, পৃ. ৫০।

৪৯ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭।

৫০ কবির ভাষায়
যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা / তস্করেত ধর্মকথা বেশ্যাকে ভর্ৎসনা॥
[দ্রষ্টব্য: দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫]
এ রকম শত শত পংক্তিতে তিনি বিভিন্নভাবে উপদেশ প্রদান করেছেন।
৫১ মুহাম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মুহাম্মদ এনামুল হক, রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬০।
৫২ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, "দৌলত কাজীর সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী" *সাহিত্য প্রকাশিকা*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, শান্তি নিকেতন, ১৩৬২, পৃ. ১৭; দৌলত কাজীর কাব্যের শিল্পরূপ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন - অমৃতলাল বালা, 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী কাব্যের শিল্পরূপ,' *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একচল্লিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৪, পৃ. ৭২-৮৯।
৫৩ অমৃতলাল বালা, 'কবি দৌলত কাজীর সূফী ভাবনা' *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৯৯, পৃ. ৭২-১০৯; ড. সুকুমার সেনও দৌলত কাজীকে 'সুফি কবি-সাধক' বলে উল্লেখ করেছেন। [দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য* (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৩৮০), পৃ. ২৩]
৫৪ মহাকবি আলাওল বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, ফারসি এবং আরবি প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কেননা তাঁর প্রথম কাব্য 'পদ্মাবতী' মালিক মুহাম্মদ জায়সীর হিন্দিকাব্য 'পদুমাবৎ' এর ভাবানুবাদ, হিন্দি ভাষায় রচিত 'মৈনাসৎ' কাব্যের অনুসরণে দৌলত কাজী 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' লেখা শুরু করলেও তিনি তা অসমাপ্ত রেখে মারা গেলে কবি আলাওল তা সমাপ্ত করেন। আলাওলের অন্য তিনটি কাব্য সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, সপ্তপয়কর এবং সিকান্দরনামা' ফারসি ভাষায় রচিত ঐ নামীয় কাব্যসমূহের বাংলা অনুবাদ। এ ছাড়া কবির 'তোহফা' কাব্যটিও আরবি ছিল। এটি নিজাম ইউসুফ গদা আরবি থেকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং কবি সেখান থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে তাকে বহু ভাষাবিদ বলা যায়।
৫৫ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আবদুল করিম, *মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি আলাওল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০৫), পৃ. ১-২৮।
৫৬ আরাকানের রাজা থদো মিন্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রি.) কবি আলাওল আরাকানে যান এবং তার আমলেই পদ্মাবতী কাব্য রচিত হয়। কবি আলাওল পদ্মাবতী কাব্য ব্যতীত সকল কাব্যেই নিজেকে বার্ধক্য কবলিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি পদ্মাবতী রচনার কয়েক বৎসর পূর্বে আরাকানে গেলে এবং তখন যদি তিনি পৌঢ় বয়স্ক অর্থাৎ তার প্রায় ৪৫ বছর বয়স হয় বলে অনুমান করা যায়। আর পদ্মাবতী কাব্য রচনার সময় ছিল ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দ। তাহলে (১৬৫২-৪৫) =১৬০৭ সালই কবির জন্ম তারিখ ধরে নেয়া যায়। [দ্রস্টব্য: আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, "আলাওলের আত্মকাহিনী," *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫৭ সাল, পৃ. ২; আবদুল করিম, *মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি আলাওল*, পৃ. ১১]
৫৭ আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০০), পৃ. ৫১০।
৫৮ মুহাম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ "আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য" *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৫।
৫৯ আব্দুল করিম, *মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি আলাওল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০।
৬০ আবদুল কাদির, "পদ্মাবতী" *বাঙালা একাডেমী পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩, পৃ. ৭।[কবির জন্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৫-৭৬; আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ১৪৯-১৫৩; আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০-৩১।]
৬১ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আবুল বাসার এম. এ. আলী, "আলাওলের রোসাংগে যাত্রা" *মাসিক মোহাম্মদী*, ৬৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬ সাল, পৃ. ৫০৯-১০।
৬২ আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।
৬৩ পদ্মাবতী কাব্য রচনার তারিখটি সংশয়মুক্ত নয়। কেননা কবি আলাওল এটি রচনার কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করেননি। তবে রাজা থদো মিংদারের নাম উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, ১৬৪৫-৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই এটি রচিত হয়েছে। কেউ কোন যুক্তি না দেখালেও ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৬৪৬ সাল, সৈয়দ আলী আহসান ১৬৪৮, সুকুমার সেন ১৬৫৯ সালকে পদ্মাবতী রচনার তারিখ হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ড. এনামুল হক, ড. আহমদ শরীফ প্রমুখ ১৬৫১

খ্রিস্টাব্দকে পদ্মাবতী কাব্য রচনার তারিখ উল্লেখ করেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে কবি আলাওল তার কাব্যে কাল জ্ঞাপক একটি শ্লোক লিখেছেন -
"যুগ ভুগ ভাব রস শব্দ নিত্য দসা / জে জন তাহাত রত পুরিবেক আসা॥
এতে 'সক নিত্য দশ' এর সংখ্যা দাঁড়ায় ১০১৩ যা মঘী সন। এর সাথে ইংরেজি সালের ব্যবধান ৬৩৮ যোগ করলে (১০১৩+৬৩৮) = ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দ হয়। [দ্রষ্টব্যঃ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, পূর্বোক্ত,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮০; আলাওল, *পদ্মাবতী,* সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৫-৩৬; আব্দুল করিম, *মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি আলাওল, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১৬-১৭; কাজী দীন মুহম্মদ, "পদ্মাবতী কাব্যে আলাওয়াল" *সাহিত্য পত্রিকা,* বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৪, পৃ. ৩৯।

৬৪ মালিক শেখ মুহাম্মদ জায়সী প্রাচীন হিন্দী কবিদের অন্যতম। তিনি তৎকালীন ভারতের রায়বেরেলী জেলার জায়স গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার কাব্য হিন্দু পুরান ও যোগশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খাঁটী মুসলমান কবি ছিলেন। পদুমাবৎ কাব্যটি মূলত দেবতা বিবর্জিত মানবীয় বিষয়বস্তুর প্রথম কাব্য। [দ্রষ্টব্যঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত *আলাওল বিরচিত তোহফা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১০২।

৬৫ Kalidas Mookherjee, "Jaisis Padumovati and its Bengali Version by Aloal- A Comparison" *Calcutta Review,* July 1940, p. 324.

৬৬ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *পদ্মাবতী* (কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫), পৃ. ২৩-২৪।

৬৭ কবির ভাষায় -
প্রথমে প্রণাম করূ এক করতার / যেই প্রভু জীবদানে সৃজিলা সংসার॥
নৃপকে করএ তিলে রম্ভের সমান / আর কেহ নাহি তান দোসর প্রধান॥
এরপর সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়কে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। [দ্রষ্টব্যঃ আলাওল, *পদ্মাবতী,* সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৫।]

৬৮ *সূরাহ ইখলাস* দেখুন এবং দেখুন, আলাওল, *পদ্মাবতী, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৬।

৬৯ *সূরাহ কাহাফ,* ১০৯ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

৭০ *সূরাহ লোকমান,* ২৭ নং আয়াত।

৭১ আলাওল, *পদ্মাবতী,* সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত,* পৃ., ৪৬।

৭২ *তদেব,* পৃ. ৪৭।

৭৩ বুখারী শরীফ।

৭৪ বুখারী শরীফ।

৭৫ ওয়াসিল আল আজামী, *মু'জিজাতে সরওয়ারে আলম,* [বিশ্বনবীর মোজেজা, আবদুল কাদির অনূদিত] (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১৫২।

৭৬ *সূরাহ ইমরান,* ৩১-৩২; *সূরাহ নিসা,* ৫৯, ৮০; *সূরাহ মায়িদাহ,* ৯২; *সূরাহ আনফাল,* ২০; *সূরাহ আহযাব,* ২১, ৩১, *সূরাহ মুহম্মদ,* ৩৩; *সূরাহ ফাতাহ,* ১০; *সূরাহ তাগাবুন,* ১২ আয়াত।

৭৭ আলাওল, *পদ্মাবতী,* সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৭।

৭৮ *তদেব।*

৭৯ *তদেব,* পৃ. ৫০।

৮০ *তদেব,* পৃ. ৫১।

৮১ কবির ভাষায় -
নানা দেশী নানা লোক/ শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসন্ত নৃপ ছায়াতল
আরবী মিশরী শামী/তুরকী হাবশী রুমী
খোরাসানী উজবেগী সকল॥
লাহরী মুলতানী হিন্দি/কাশ্মীরী দক্ষিণী সিন্ধী
কামরূপী আর বঙ্গদেশী
ভূপালী কুদংসরী/কান্নাই মনল আবারী
আচি কোচী কর্ণাটকবাসী॥
বহু সৈদ শেখজাদা/মোগল পাঠান যোদ্ধা

রাজপুত হিন্দু নানা জাতি
আভাই বরমা শাম/ ত্রিপুরা কুকির নাম
কতেক কহিমু জাতি ভাঁতি॥
[দ্রষ্টব্য: আলাওল, *পদ্মাবতী,* সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৯।]

৮২ কবির ভাষায় -
এতেক ভাবিয়া সোলেমান মহামতি / হরষিত আদেশ করিলা আক্ষা প্রতি॥
এই খণ্ড পুস্তক পুরাও মোর নামে / দুগ্ধ মধু দোহ আনি মিলাও একধামে॥
[দ্রষ্টব্য: আলাওল বিরচিত *সতী-ময়না, লোর-চন্দ্রানী,* মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৬-৭।]

৮৩ কবি তার কাব্যে উল্লেখ করেন -
মজলিশ কুতুব তথাত অধিপতি / তাহান অমাত্যসূত মুঃ হীনমতি॥
কার্যহেতু যাইতে পন্থে নৌকার গমনে / দৈবগতি দেখা হৈল হারমাদের সনে॥
বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল পিতা / রনক্ষেত্রে ভাগ্যবলে আমি আইলুঁ এথা॥
[দ্রষ্টব্য: আলাওল বিরচিত, *সতী-ময়না লোর-চন্দ্রানী,* মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৬।]

৮৪ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২১৮-১৯।

৮৫ আব্দুল করিম, *রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৬।

৮৬ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২০৪।

৮৭ পুরো নাম আবু মুহাম্মদ ইলিয়াস নিজামী গঞ্জাবী। তিনি ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত গঞ্জাব শহরে (বর্তমান নাম এলিযাবেথপোল) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ইউসুফ ও মাতার নাম রইসা। মখজুনুল আসরার (১১৮৪), হফতপয়কর (১১৯৭ খ্রি.) সিকান্দর নামা ই বাহরী (১২০০ খ্রি.) ১ম খণ্ড, সিকান্দার নামা-ই-বাহরী ২য় খণ্ড (১২০২) প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ছিলেন ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, সর্বশ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চ রচয়িতা, ভাষা ও ছন্দের যাদুকর এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুশলী বাকশিল্পী। [দ্রষ্টব্য: আহমদ শরীফ সম্পাদিত, আলাউল বিরচিত *সিকান্দরনামা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৩৫-৪১।]

৮৮ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২২১।

৮৯ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২২২-২৩।

৯০ কবির ভাষায় -
ত্রিভূবনে নাহি আর দ্বিতীয় সৃজক / ঘটক রৈক্ষক স্বামী পালক ঘাতক॥
তাহা হস্তে বিষরিছে শরীর সবার / পুন রপি তথা সকলের অনসার॥
অগ্নি, মহী, শিলা, বায়ু, তন্ত্র, যন্ত্র, রীত / সকলের মুখে এক ঈশ্বরের গীত॥
[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন - আলাওল রচিত *সপ্তপয়কর,* (কলিকাতা : মুন্সী সইদুর রহমান, ১৩১১ বাংলা।)।]

৯১ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২২৩।

৯২ কবির মূল নাম শেখ ইউসুফ দেহলবী। দেহলবী শব্দই প্রমাণ করে তিনি দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন এবং বিখ্যাত অলীয়ে কামেল নিযামউদ্দীন এর শিষ্য চেরাগ-ই-দিল্লী শেখ মাহদুম এর সংস্পর্শে তিনি ইসলাম চর্চা করেন বলে তাঁকেও একজন সাধক পুরুষ হিসেবে 'গদা' অর্থাৎ দরবেশ বা অলী বলে আখ্যা দেয়া হতো। তাই তার নামের সাথে শেখ ইউসুফ দেহলভীর পাশাপাশি ইউসুফ গদা লক্ষ্য করা যায়। তিনি আরবি ফিকহ্ গ্রন্থ 'হেদায়া' অবলম্বনে এ গ্রন্থখানি রচনা করেন এবং ৭৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৩৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। [দ্রষ্টব্য: আলাওল বিরচিত *তোহফা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ১২৫-২৬; অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৩৫।

৯৩ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৮১-৮২।

৯৪ আলাওল বিরচিত *তোহফা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯।
৯৫ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৬।
৯৬ *তদেব*, পৃ. ২৩৮।
৯৭ *তদেব।*
৯৮ সৈয়দ মুতাজা আলী, 'আলাউলের তোহফা' *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮, পৃ. ১১২। (উল্লেখ্য, *তোহফার* উপ বিভাগগুলো এ প্রবন্ধের আলোকেই করা হয়েছে।
৯৯ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২।
১০০ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৬।
১০১ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *আলাউল বিরচিত সিকান্দর নামা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭।
১০২ *তদেব*, পৃ. ১-৩৪।
১০৩ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৩।
১০৪ মুহম্মদ মজির উদ্দীন, "মুহম্মদ এনামুল হকের গবেষণা" *সাহিত্য পত্রিকা*, মুহম্মদ মুনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ষড়বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বর্ষ, ১৩৯০, পৃ. ১৯।
১০৫ আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০।
১০৬ আবদুল করিম, *রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩।
১০৭ *তদেব;* আহমদ শরীফ, বাংলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান," *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টপাধ্যায় সম্পাদিত, (কোলকাতা : কে. পি. বাগচী আণ্ড কোং, ১৯৯১), পৃ. ২১১।
১০৮ কবি মরদন রচিত 'নসিবনামা' আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৪০২, পৃ. ১৫৪।
১০৯ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৯।
১১০ আবদুল করিম, *রোসাঙ্গে বাংলা -সাহিত্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩।
১১১ কবি মরদন রচিত 'নসিবনামা' আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৪।
১১২ *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০১।
১১৩ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩২।
১১৪ কবির কালনির্ণয়ে মত বিরোধ রয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের 'আরাকান রাজসভায় মুসলিম অমাত্য' শীর্ষক উপ অধ্যায়ে 'বুরহানুদ্দীন' এর বর্ণনায় সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
১১৫ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮১; আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৯।
১১৬ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫১।
১১৭ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, 'নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত 'মুসার সওয়াল, *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন-১৪০৪, পৃ. ৭২।
১১৮ নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরিয়তনামা*, আবদুল করিম সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩।
১১৯ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *তদেব*, পৃ. ৫৬-৫৭।
১২০ *তদেব*, পৃ. ৪৪।
১২১ আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৭।
১২২ *তদেব*, পৃ. ১৭৬-১৭৭।
১২৩ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮২।
১২৪ *তদেব*, পৃ. ৩৮৪।
১২৫ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গ হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯।
১২৬ *তদেব*, পৃ. ১০৯-১১০।

অধ্যায় ৫
আরাকানের শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে মুসলিম প্রভাব

শিল্পকলার মত সংস্কৃতিও ইতিহাস বিজ্ঞানের একটি গতিময় অথচ বিমূর্ত বিষয়।[১] মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেও শিল্প-সংস্কৃতি ক্রমশ পূর্ণাঙ্গরূপে বিকাশের চেষ্টা করে যাচ্ছে। ফলে সময়ের গতিময়তার সাথে তাল মিলিয়ে 'শিল্পকলা' ও 'সংস্কৃতি' শব্দের প্রয়োগ যেমন বাড়ছে তেমনি ব্যাপকহারে এগুলোর চর্চাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এ কথাও সত্য যে, বাহ্যিকভাবে সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশ পথে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হলেও মৌলিক ও উদ্ভবগত দিক থেকে সেগুলো নিজস্ব উৎসকেই ধারণ করে আছে। কেননা মৌলিক বিশ্বাস ও রুচিবোধ থেকেই জন্ম হয় সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে শিল্পকলা। তাই বলা যায়, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা শব্দ দুটি একই ঘরানায় অবস্থান করলেও সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, কারুকার্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি সংস্কৃতি নয় বরং শিল্পকলা। মূলত শিল্পকলাই হল সংস্কৃতির বাহন। সুতরাং সংস্কৃতির জন্ম বিশ্বাসে আর বিকাশ শিল্পকলার মাধ্যমে। এ দিক বিবেচনায় পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) এর বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল, তাকে বাস্তবে রূপ দিতেই শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে। সেই সূচনাকাল থেকে সময়ের ধারাবাহিকতায় একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যেমন বৈচিত্রময় বোধ বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে তেমনি হাজারো রকমে গঠিত হচ্ছে সংস্কৃতির অবয়ব; আর সংস্কৃতির এ নবগঠিত অবয়বকে অবলম্বন করেই বিকশিত হচ্ছে নতুন নতুন শিল্পকলা। এ কারণে শিল্পকলা ও সংস্কৃতি শব্দের সাথে আরো নতুন নতুন শব্দ যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও আকার ধারণ করছে, যেমন- মুসলিম সংস্কৃতি ও শিল্পকলা, হিন্দু সংস্কৃতি ও শিল্পকলা, জড়বাদী সংস্কৃতি ও শিল্পকলা প্রভৃতি। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মত আরাকানের ইতিহাসেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। অত্র অধ্যায়ে সেখানকার স্থানীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতির মধ্যে মুসলিম শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং প্রভাব বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৫.১ আরাকানের শিল্পকলা ও সংস্কৃতি : সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের স্বাধীন ভূখণ্ড আরাকান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মণ্ডিত একটি অঞ্চল। দীর্ঘ সময়ের আবর্তনে এখানে যেমন নতুন নতুন বিশ্বাস ও ধর্মের উদ্ভব হয়েছে তেমনি সেই আলোকেই গড়ে উঠেছে নতুন নতুন সাংস্কৃতিক বলয় এবং শিল্পকলার নানাবিধ আকর্ষণীয় মডেল। খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সেখানে মৌলিকভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটে। জড়বাদী

সংস্কৃতির লালন করে খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দে মারুবংশীয় রাজাগণ[২] আরাকান শাসন শুরু করলেও ভারতীয় সভ্যতার ছোঁয়ায় তারা ক্রমশ হিন্দু ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কেননা খ্রিস্টপূর্ব থেকেই ভারত ছিল বর্তমান দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। ফলে এ অঞ্চল থেকে শুধু আরাকান নয় বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়-জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। এমনকি আরাকান অঞ্চলসহ আধুনিক মিয়ানমার, থাইল্যাণ্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, মালয় ও ইন্দোনেশিয়াকে 'ভারতীয়কৃত' অঞ্চল নামে অভিহিত করা হতো। অনেক সময় এ অঞ্চলকে 'হিন্দুকরণকৃত রাজ্য'ও বলা হতো।[৩] ভারতীয় হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির ফলে সেখানে বহু রকমের মূর্তিপূজা, বৃক্ষপূজা, সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্র পূজার মাধ্যমে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের বেদী, মন্দির, মূর্তি প্রভৃতি তৈরী করত। মারুবংশীয় রাজা অভিরাজের দুই পুত্র কানরাজগজী ও কানরাঞ্জির মধ্যকার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সমাধানে তারা চুক্তিবদ্ধ হয় যে, যে ব্যক্তি এক রাত্রির মধ্যে একটি 'ধর্মমন্দির' নির্মাণ করে দিতে পারবে সেই রাজা হবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুচতুর কানরাঞ্জি কৌশলে এক রাত্রির মধ্যে মন্দির নির্মাণ করে দিয়ে আরাকানের রাজা হন।[৪] এভাবে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগেই জড়বাদী সংস্কৃতির প্রভাবে সেখানে 'ধর্ম মন্দির' নির্মিত হয়। কিন্তু তৎকালীন সময়ের উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

বৈদিক যুগ অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের পর থেকে মূলত হিন্দু ধর্মের সূচনা।[৫] এ সময় আর্য হিন্দুগণ সর্বপ্রথম বৈদিক ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে। তখন তারা ভূমি, আকাশ, পর্বত, নদী, উদ্ভিদ ইত্যাদিকে পূজনীয় জ্ঞান করত। সেইসাথে ঘোড়া, গাভী, পাখি অন্যান্য জীবজন্তু এমনকি মানুষের তৈরী বস্তু সামগ্রীকেও পূজা করত।[৬] অতঃপর খ্রিস্টপূর্ব ৮০০-৫০০ অব্দের মধ্যে সেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি চালু হয়।[৭] এ সময় দেবতার পূজা পার্বনের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণগণ একক নেতৃত্বে আসীন হয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। অচিরেই এ শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব ও সভ্যতার ধারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়। ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে সীমান্ত গত যোগাযোগ থাকায় এখানকার প্রভাব সহজেই আরাকান অঞ্চলেও সম্প্রসারিত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক কপিলাবস্তুর যুবরাজ গৌতমবুদ্ধ কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটলে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পায়।[৮] খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে অর্থাৎ ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে মগধ থেকে আগত বৌদ্ধ সৈন্যরা আরাকান-চট্টগ্রাম অভিযানকালে এখানে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার শুরু করেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যেই আরাকান অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে।[৯] এমনকি গৌতম বুদ্ধের তিরোধানের পর খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত বর্ষেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ব্যাপক ছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর পর হতে নানাবিধ কুসংস্কার ও জাদুমন্ত্রের মিশ্রণের কারণে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব নিম্নগামী হতে থাকে। অন্যদিকে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও লাওস

অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে।[১০] ফলে ইসলাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চট্টগ্রাম অঞ্চল হয়ে পড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র।

মগধ থেকে এসে ১৪৬ সালে আরাকানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন চন্দ্র সূর্য (Sandathur'ya-146-198) নামক জনৈক বৌদ্ধ সামন্ত। তিনিই আরাকানের ধন্যাবতীতে রাজধানী স্থাপন করে সেখানে চন্দ্রসূর্য বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরাকানে এসে সেখানকার অধিবাসীদেরকে অনুন্নত, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জড়োপাসক অবস্থায় পান এবং তারই প্রচেষ্টায় অনুন্নত আরাকানীদের মধ্যে প্রথম ভারতীয় ভাষা, লিপি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষার সুযোগ হয়।[১১] এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, ১৪৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে 'কানরাজগজী' বংশের শাসকগণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিকাশ না ঘটিয়ে বরং লৌকিক প্রথার মাধ্যমে জড়োপসনা ও পূজা অর্চনার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন। তবে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে যেহেতু সেখানে ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং শাসক শ্রেণীর মধ্যে হয়তো শিক্ষার চর্চা হতো। যা হোক, তাদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য সেখানে 'মন্দির' নির্মাণ হয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

আরাকানের চন্দ্র সূর্য বংশের রাজা সান্দা থুরিয়া প্রথম বৌদ্ধ ধর্মকে রাজকীয় ধর্মরূপে ঘোষণা করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের লক্ষ্যে রাজধানী ধান্যবতীতে 'মহামুনি প্যাগোডা' নির্মাণ করে তাতে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি তৈরী করে বৌদ্ধদের উপাসনার ব্যবস্থা করেন।[১২] অবশ্য এ সময়ও শাসকগণ হিন্দু ধর্মের চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আরাকানের আকিয়াব অঞ্চলের আলেজাওয়া (Alezeywa) গ্রামে অবস্থিত শোয়েডাং প্যাগোডার অর্ধ মাইল উত্তরে ওয়ানতিতাং (Wuntitang) নামক পাথর আচ্ছাদিত একটি পাহাড় আছে। উক্ত পাহাড়ে ওয়ানতিচেতি (Wunticeti) নামক একটি প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এটি চন্দ্র সূর্য বংশের শাসনামলের প্রথম দিকে অর্থাৎ মহামুনি প্যাগাডো নির্মাণের প্রায় সমসাময়িককালে নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। এ মন্দিরে নারী, পুরুষ ও পশুর প্রতিকৃতিতে হিন্দু দেবদেবীর বেশ কিছু ছোট ছোট মূর্তি আছে। মূর্তিগুলোর নিকটে বর্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি প্রাচীন শিলালিপি দেখা যায়। কিন্তু শিলালিপির অক্ষরগুলো আংশিক মুছে গিয়ে দুস্পাঠ্য হলেও অনুমান করা যায় যে, ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে ম্রথুখউর নামক জনৈক ব্যক্তি মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন।[১৩] এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, চন্দ্রসূর্য বংশের রাজাগণ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তনকারী হলেও স্থানীয় হিন্দুজনগণের প্রভাব কিংবা পূর্বপুরুষের হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ভুলতে পারেনি। এমনকি ষোড়শ শতাব্দীতে আরাকানে বৌদ্ধ ও মুসলিম প্রভাবিত প্রশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেও হিন্দু সংস্কৃতির অস্তিত্ব তখনও বিদ্যমান ছিল। সপ্তম শতাব্দীতেও বৈশালীর চন্দ্ররাজবংশের রাজাগণ বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে

সহায়তা করেন এবং আনন্দ চন্দ্র, আনন্দোয়, আনন্দ মাধব, আনন্দেশ্বর প্রভৃতি নামে বহু মঠ, মন্দির ও বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৌদ্ধ ভীক্ষুদেরকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দিয়ে তুষ্ট রেখে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করেন।[১৪] অনুরূপভাবে বৈশালীর চন্দ্ররাজবংশের রাজা বীরচন্দ্র (৫৭৫-৫৭৮ খ্রি.) বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারও পূণ্য অর্জনের নিমিত্তে একশতটি বৌদ্ধ স্তম্ভও নির্মাণ করেছিলেন। [১৫] সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে একাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত আরাকানের মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদের ব্যাপক প্রসার ঘঠে। ফলে হিন্দু সংস্কৃতির ধ্বংসস্তুপের উপর গড়ে ওঠে বৌদ্ধবাদ সংস্কৃতি এবং সেই ভিত্তিতেই বৌদ্ধ মন্দির, বিহার ও মঠ জাতীয় বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য-শিল্পকলার বিকাশ ঘটে।

একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে আরাকানে মহাযান বৌদ্ধ মতবাদের পাশাপাশি হিনযান বা থেরবাদ বৌদ্ধ মতের প্রচার শুরু হয়। ১০৫৬ খ্রিস্টাব্দে বার্মার থেটন রাজ্যের জনৈক শিন অরহণ (Shin Arahan) নামক একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরু পঁগা রাজ্যে আগমন করে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বার্মা থেকে মহাযান মতবাদ উচ্ছেদ করে প্রথম হিনযান মতবাদ প্রচার করেন।[১৬] এ সময় ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৮৩ পর্যন্ত আরাকান অঞ্চল পঁগা রাজ্যের আওতাভুক্ত থাকায় আরাকানে হিনযান বৌদ্ধ মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচীনকালের মারু রাজবংশীয় রাজারা নিজেদের প্রয়োজনে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করত। এ ধারায় পরবর্তীকালে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ, উচ্চবর্ণ ও বিত্তশালীদের মধ্যেই লেখাপড়াকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু বৌদ্ধদের জ্ঞান চর্চা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্ম মন্দির, কেয়াং, মঠ, বিহার প্রভৃতির সাথে বৌদ্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থাও যুক্ত ছিল। কেয়াংয়ের ভীক্ষুরা বৌদ্ধ ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক তথা ধর্মীয় শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতেন। স্থানীয় বৌদ্ধ অধিবাসীরা পালাক্রমে দিনের মধ্যাহ্নে একবার ভীক্ষুদের খাবার সরবরাহ করত।[১৭] এভাবে খুব দ্রুত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো সম্প্রসারিত হয় এবং সাধারণ লোকজন হিন্দুদের চেয়ে বৌদ্ধদেরকে উদার প্রকৃতিতে দেখে বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে পর্দা প্রথা ধর্মীয় কর্তব্যের মধ্যে শামিল নয়। তাই পোষাক পরিচ্ছদে ব্রাহ্মণ কিংবা ভীক্ষু ছাড়া অন্যকোন হিন্দু-বৌদ্ধের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি ছিলনা। তবে ব্রাহ্মণদের পৈতা কিংবা ভিক্ষুদের নির্দিষ্ট গেরুয়া পোষাক ও মাথা মুণ্ডন তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি। খাওয়া ও পান করার ব্যাপারে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে তেমন কোন ধর্মীয় বিধি নিষেধ ছিলনা।[১৮] তাই তারা সকল ধরনের মাছ মাংস ভক্ষণ করত। এমনকি মদসহ যেকোন পানীয় গ্রহণে ধর্মীয়ভাবে তেমন কোন বিধি নিষেধ ছিলনা। তবে হিন্দুরা 'দেবতা' জ্ঞান করে গরুর গোশত ভক্ষণ করত না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহ্ কর্তৃক ম্রাউক উ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আরাকানী সংস্কৃতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে ইসলামের আদর্শকে গ্রহণ করলে বৌদ্ধদের মধ্যে সে প্রভাব পড়ে। মুসলমানদের উদারতা ও ধর্মীয় মহানুভবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেক বৌদ্ধই ইসলাম গ্রহণ করেছে আর কেউবা ইসলামের সামাজিক রীতিনীতিকে গ্রহণ করেছে। ফলে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বার্মারাজ বোধাপায়া কর্তৃক আরাকান দখলের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বসুলভ পরিবেশ বজায় থাকে। মোটকথা জড়োপাসক থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ অপরদিকে বৌদ্ধ ও মুসলিম সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হবার সুবাদে আরাকানী শিল্পকলাতেও ধর্মমন্দির, বেদী, দেবমন্দির, মঠ, বিহার, কেয়াং, মসজিদ প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্পকলারও আবির্ভাব ঘটেছে।

৫.২ আরাকানে মুসলিম সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশ

সাংস্কৃতিক ধারাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে শিল্পকলা। সেইসাথে রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ শিল্পকলার কাঠামোগত নির্মাণ শৈলীকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেই আলোকে হিন্দু সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ধ্বংসস্তূপের উপর বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল। অতঃপর আরাকানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার শুরু হলে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও শিল্পকলার পাশাপাশি সহাবস্থান হিসেবে মুসলিম সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশ সাধিত হয়।

সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎকর্ষতার যুগে আরাকানে আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে ইসলামি সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়। বাণিজ্যিক লেনদেন ও ইসলাম প্রচারের মিশনে মুসলমান বণিকগণ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই কিছুটা সফলতা খুঁজে পায় এবং নবম শতাব্দীতে ক্ষুদ্র আকারে মুসলিম সমাজও গড়ে ওঠার ইঙ্গিত মেলে।[১৯] চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে আরাকানের সীমান্তগত সম্পর্ক এবং কখনো আরাকানের শাসনাধীনে থাকার সুবাদে এ অঞ্চলে আগত মুসলিম বণিক, নাবিক, ইসলাম প্রচারক, অলি ও সুফিদের মাধ্যমে আরাকানে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ সহজতর হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে তুর্কি, পাঠান এবং মোগলদের শাসনামলে গৌড় থেকে আগত অগণিত মুসলমানের সঙ্গে চট্টগ্রাম-আরাকানে হিন্দু-বৌদ্ধের কাছে ইসলামি আদর্শ আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়। এর ফলে বিশেষত নিম্নবর্ণের নির্যাতিত হিন্দু-বৌদ্ধরা ব্যাপকহারে ইসলামে দীক্ষা নেয়।[২০] ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই আরাকানে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। অতঃপর সোলায়মান শাহ্ কর্তৃক ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে আরাকানী প্রশাসনে মুসলিম অমাত্যদের দায়িত্ব পালন ও প্রাধান্য শুরু হলে এ সংস্কৃতি রাজকীয় দরবারের মর্যাদা পেয়ে প্রতিষ্ঠা পাবার সুযোগ পায়।

আরাকানের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন হলেও সভ্যতা ও রুচিশীলতার দিক দিয়ে ভারত ও বাংলার চেয়ে আরাকানীরা নিম্নমানের ছিল। ইসলাম মানুষকে ঈমানের মাধ্যমে ভিতরের দিক থেকে পরিচ্ছন্ন করে। বিশেষত তাওহিদ,

রিসালাত ও আখিরাতের উপর ভিত্তি করেই মুসলিম সংস্কৃতির ভীত গড়ে ওঠে বলে মুসলমানগণ মনস্তাত্ত্বিক ও বিশ্বাসগত দিক দিয়ে যেমন পরিশীলিত হয় তেমনি শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন নেয়াও শেখে। সেই ভিত্তিতে মুসলমানরাই প্রথম চুল ও পা-হাতের নখের যত্ন নেয়ার সংস্কৃতি চালু করেন।[২১] সেইসাথে মাথার চুলে সিথিকরণ, শরিয়তের দৃষ্টিভংগীর আলোকে চল্লিশ দিনের মধ্যে শরীরের গোপন স্থানের চুল কর্তন করা, সুগন্ধি ব্যবহার প্রভৃতি সংস্কৃতি মুসলমানদের পরিচ্ছন্ন হিসেবে উপস্থাপন করে। এ ছাড়াও পেশাব পায়খানার ময়লা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন, নাপাকী থেকে মুক্ত হবার জন্য গোসল, অজু করা, মহিলাদের ঋতুকালীন নাপাকী সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন ও নির্দিষ্ট দিনের শেষে ফরজ গোসল করে পবিত্রতা অর্জন, শিশু প্রসবের পর সাত দিন ও চল্লিশ দিনে পবিত্রতা অর্জন, ঈদ, জুময়া এবং মৃত্যুকালীন গোসল দেয়া প্রভৃতি[২২] মুসলমানদেরকে রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান হিসেবে গড়ে তোলে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে মুসলমানগণ যেমন রুচির পরিচয় দিত তেমনি পোষাক পরিচ্ছদ বেশভুষায় মুসলমানগণই মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। মুসলমান পুরুষগণ ঢিলেঢালা জামা পড়ত, মাথায় টুপি-পাগড়ী প্রভৃতি ব্যবহার করত। মহিলারা 'চুলি' ও কোর্তা ব্যবহার করত।[২৩] এ পোষাকগুলো গলা থেকে কোমর পর্যন্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জুব্বার মত পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলে থাকত। তবে অনেক ক্ষেত্রে গৌড়ীয় প্রভাবে মহিলারা শাড়ীও ব্যবহার করতেন। ড. এনামুল হকের ভাষায় "আজকালকার শিক্ষিতা ও শহুরে মেয়েদের ন্যায় শরীরের নানা স্থান উন্মুক্ত রাখিয়া সেকালে শাড়ী পরার ব্যবস্থা ছিল না। তখন 'সব অলংকার জড়ি, বিচিত্র পাটের শাড়ী' পরিবার অর্থাৎ মস্তকসহ শরীরের সমস্ত অংশ ঢাকিয়া শাড়ী পরিধান করিবার রীতি ছিল।"[২৪] এছাড়াও মেয়েরা কাঁচলী ও পাট্টা নামক বক্ষবন্ধনীও ব্যবহার করত। মহিলারা বাইরে যাবার সময় নিজেদেরকে আপাদমস্তক ঢেকে চলতেন যেন স্বামী ছাড়া অন্যকোন পুরুষ মুখও না দেখতে পায়। সেইসাথে কণ্ঠস্বরকে তারা নিম্নগামী করে রাখত।[২৫]

খাদ্যাভ্যাস ও রান্না পদ্ধতির ব্যাপারে মুসলমানদের বিশেষত সুলতানী ও মোগল শাসকদের সুখ্যাতি সর্বজন বিদিত। গৌড় ও দিল্লীর প্রভাবে আরাকানের মুসলমানগণও এ রন্ধন পদ্ধতিকে গ্রহণ করে রুচিশীল খাদ্য গ্রহণ করত। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মত সামুদ্রিক মাছ, শুটকী মাছ ও আতপ চালের ভাত তাদের প্রিয় খাবার। মুসলমানগণ অতিথি আপ্যায়নে গরু ও খাশির মাংস পরিবেশন করতেন। শুকরসহ শরিয়ত নিষিদ্ধ প্রাণীর মাংস তারা ভক্ষণ করতেন না।[২৬]

খাদ্য গ্রহণ ও পানি পান পদ্ধতির ক্ষেত্রে মুসলমান সংস্কৃতিতে একটি ভিন্নমাত্রা ছিল। খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ভালভাবে হাতমুখ পরিষ্কার করে নিয়ে পরিচ্ছন্ন পাত্রে খাদ্য উঠিয়ে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে খাওয়া শুরু করতেন। এমনকি পেট পুরে না খেয়ে

কম খাদ্য গ্রহণ করার রেওয়াজও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।[২৭] পানি পান করার সময়ও বিস্‌মিল্লাহ্ বলে বসে থেকে অল্প অল্প করে তিন পর্বে পান করার তথ্যও পাওয়া যায়।[২৮] অজুর শেষের অবশিষ্ট পানি, জমজম কূপের পানি প্রভৃতি দাঁড়িয়ে পান করতে কোন আপত্তি ছিলনা।

সুরের চর্চা মুসলিম সমাজের স্বীকৃত বিষয়। পবিত্র কুরআন মাজিদ সুর করে নিয়মানুবর্তীতার সাথে পাঠ করার আদেশ রয়েছে। আরাকানী মুসলিম সমাজে কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি সঙ্গীতেরও চর্চা করা হতো। আল্লাহর প্রশংসা, রসুলের শানে দরূদ পাঠ, মানুষের বিভিন্ন সমস্যাকেন্দ্রিক সঙ্গীত ও সুরের চর্চা মুসলিম সমাজে চালু ছিল। এ সকল গানে কোন অশ্লীলতা ছিলনা। কবির ভাষায় -

গাইতে শুনিতে কামভাব না ভাবিব / প্রভুভাবে মগ্ন মন হইয়া শুনিব ॥[২৯]

মূলত এ সকল গানের মধ্যে আল্লাহ ও তার রসুলের প্রেম এবং দেশ জাতির সমস্যা ও কল্যাণের বিষয় ফুটে উঠত।

গানের সাথে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার থাকলেও তা হারাম বলে মনে করতেন আরাকানের মুসলমানগণ। এমনকি মহিলাদের সঙ্গীত চর্চাকে মুসলমানগণ অবৈধ বলে মনে করতেন।[৩০] বিবাহ অনুষ্ঠানকে আনন্দঘন করার জন্য তবলা, ডম্বুরু, ঢোল প্রভৃতি ব্যবহার করে গান গাওয়া হতো।[৩১] এ সকল গানে অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ ছিলনা। সেইসাথে ডম্বুর ঢোলকেও দোষণীয় বলে মনে করা হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সঙ্গীত বিদ্যার চর্চা মুসলিম অমাত্য ও অভিজাতদের মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল।

আরাকানে মুসলিম সংস্কৃতি বিকাশের সাথে সাথে ধর্মীয় প্রয়োজনেই স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। আরাকান অঞ্চলে ইসলামি সংস্কৃতি বিকাশের পূর্বেই পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় স্থাপত্য শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়। আরাকান-চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানদের মসজিদ, সমাধিসৌধ, দালানকোঠা প্রভৃতি নির্মাণের সময় মুসলমানদেরকে স্থানীয় ও সহজলভ্য মালমসলা, রাজমিস্ত্রি এবং পরিবেশের উপর নজর রাখতে হয়েছে। বিশেষত আরাকান অঞ্চল বাংলার মতই নদ-নদী ও ঝড় বৃষ্টির প্রধান অঞ্চল হবার কারণে আরাকানের স্থাপত্য শিল্পসমূহ অনেকটা বাংলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরাকানে মুসলিম প্রভাবের তথ্য পাওয়া গেলেও 'মসজিদ' নির্মাণের কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অথচ মুসলমানগণ যেখানেই বসতি গড়ে তুলতেন সেখানেই নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ নির্মাণ করতেন। প্রাথমিক পর্যায়ের বিশেষত অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোন মসজিদের সন্ধান পাওয়া না গেলেও 'বদর মোকাম' নামে এক ধরনের মসজিদের প্রমাণ পাওয়া যায়। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন "খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে আরাকানে ইসলাম বিস্তৃতি ও মুসলমান প্রভাব অন্যান্য ঐতিহাসিক কর্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে। এই সময় হইতেই আসামের সীমা হইতে মালয় উপদ্বীপ

পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী ভূভাগের নানা স্থানে 'বুদ্ধের মোকাম' নামক এক প্রকার অদ্ভুত মসজিদ গড়িয়া উঠিতে থাকে; এই মসজিদগুলিকে বৌদ্ধ, চীনা ও মুসলমান জাতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।"[৩২]

উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বদরমোকাম মসজিদটি নবম অথবা দশম শতাব্দীর বলে অনুমান করা হলেও আরাকানী লেখক ডা. মুহাম্মদ ইউনূস একে ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত বলে দাবী করেছেন।[৩৩] এমনকি ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিমের বইতেও[৩৪] বদর মোকামের ছবি দিয়ে তাকে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন বর্ণনায় চতুর্দশ, অষ্টাদশ প্রভৃতি শতাব্দীতে নির্মিত বলে তথ্য পাওয়া যায়।[৩৫] কিন্তু দশম ও একাদশ শতাব্দী থেকেই বদর উদ্দীন, বদরশাহ প্রভৃতি নামে পীর বদরের সন্ধান পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষিতে চিন্তা করলে 'বদর মোকামকে' দশম শতাব্দীর মনে করা যেতে পারে। তবে সপ্তম শতাব্দীতে বদর নামে কোন আউলিয়া, বণিক কিংবা নাবিক এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেছেন কি না তা জানা যায় না হেতু প্রাথমিকভাবে এটাকে দশম শতাব্দীর ধরে নেয়া যেতে পারে। পক্ষান্তরে যারা এটাকে চতুর্দশ কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর হিসেবে ধরে নিয়েছেন তাদের মতামতটিও এদিক থেকে মূল্যবান যে, বর্তমানে যে ধরনের ভবন দৃশ্যমান তা মোগল বাংলার স্থাপত্য অনুকরণে নির্মিত। কিন্তু বিষয়টি এমন হওয়াই যুক্তিযুক্ত যে, দশম শতাব্দীতে যে বদর মোকাম নির্মাণ করা হয়েছিল বর্তমানটি তার সংস্কার কিংবা নতুন নির্মিত রূপ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পক্ষে মত প্রকাশকারীগণ সংস্কার কিংবা নতুনরূপে নির্মাণ রূপকেই বর্ণনা করেছেন। কেননা আকিয়াবে নির্মিত বদর মোকাম সম্পর্কে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আকিয়াবের ডেপুটি কমিশনার কর্নেল নেলসন ডেভিস কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে জানা যায়, ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে পীর বদর উদ্দীন বদর-ই-আলমের সম্মানে এটি নির্মিত হয়।[৩৬] বিবরণে আরও জানা যায়, আঠার শতকের গোড়ার দিকে, আনুমানিক ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে চাঁদ সওদাগর (Chand Saudager) এবং মানিক সওদাগর (Manik Saudager) নামক চট্টগ্রামের দু'জন বণিক ভাই বেসিন থেকে আকিয়াব হয়ে 'বদর মোকাম' এর নিকট পৌঁছলে[৩৭] তাদের পানীয় শেষ হয়ে যায়। তারা জাহাজ নোঙ্গর করে সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে। ঐ রাত্রে পীর বদর স্বপ্নে মানিক সওদাগরকে আদেশ দেন, তারা যেন যেখান থেকে পানি সংগ্রহ করেছে সেখানে গুহা বা গৃহ তৈরী করে দেয়। মানিক সওদাগর তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা জানালে পীর সাহেব বলেন যে, তাদের সকল হলুদ সোনায় পরিণত হবে। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর দুই ভাই সত্যি সত্যি দেখে অবাক হয়ে যায় যে, তাদের জাহাজের সমস্ত হলুদ সোনায় পরিণত হয়েছে। অতঃপর তারা বদর মোকাম নামে ঐ দালানগুলি[৩৮] তৈরী করে দেয়। ঐ দিন থেকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সকলেই ঐ স্থানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে।[৩৯] আকিয়াবের বদর মোকাম ছাড়া আরও অনেক 'বদর মোকাম' এর অস্তিত্বের কথা জানা গেলেও একমাত্র আকিয়াবের বদর মোকামটিই অক্ষত আছে এবং আরাকানের মুসলমানরা এখনও পর্যন্ত আকিয়াবের 'বদর মোকামের' যত্ন করে আসছে।

'বদর মোকামের' নির্মাণ সময় নির্ধারণের জন্য পীর বদরের ইসলাম প্রচারের সময়কাল নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ নেই। তবে বদর নামের অনেক পীরের সন্ধান পাওয়া যায়। পীর বদর, বদর শাহ, বদর আউলিয়া, বদর-ই-আলম, পীর বদর উদ্দীন বদর-ই-আলম, শাইখ হযরত বদর-ই-আলম, শাইখ বদর-ই-আলম জাহিদী এবং শাইখ বদর-উল-ইসলাম প্রভৃতি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪০] শুধু নামই নয়, পীর বদরের সমাধিও বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়, যেমন - বর্ধমান জেলার কালনায়, দিনাজপুরের হেমতাবাদে, চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী, পটিয়া, রাউজান এবং রাঙ্গুনিয়া থানার ৪টি স্থানে বদর শাহের দরগাহ দেখা যায়। কেউ কেউ এ সকল বদর নামের পিরকে একজন মনে করেন এবং তিনি শাহ পীর বদর উদ্দীন বদর-ই আলম। ইনি ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন এবং বিহারের ছোট দরগাহে সমাহিত আছেন।[৪১] কিন্তু এ বক্তব্যের পিছনে তারা কোন যুক্তি পেশ করেননি। এর দ্বারা বদর নামের ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণকারী একজন পীরই ছিলেন তা প্রমাণ করা যায় না; বরং এ নামে বিভিন্ন সময়ে আউলিয়া কিরাম ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করাকে অসম্ভব বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

যা হোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক গ্রন্থাগারিক মরহুম সিদ্দিক খান স্বয়ং আকিয়াবের বদর মোকাম দেখে বিবরণী উল্লেখ করেন যে, ঐ বদর মোকামে প্রকৃতপক্ষে দুটি দালান আছে। একশতটি মিনার এবং গম্বুজসহ মনোরম টিলার উপরে অবস্থিত এবং দেখতে উপমহাদেশীয় মসজিদের অনুরূপ। পাশেই একটি গুহা এবং গুহাটি পাথরের তৈরী। গুহাটি পীর বদর কর্তৃক সাধনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চিল্লাখানা।[৪২] এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে পীর বদর বেঁচে থাকতেই এখানে ইবাদত খানা নির্মাণ করেছিলেন এবং নিজের জন্য আলাদা সম্প্রসারিত একটি কামরা তৈরী করে সেখানে বসে তিনি দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তিনি ইন্তেকালের পর 'বদর মোকাম'টি হয়তো বিধ্বস্ত হবার উপক্রম হলে পরবর্তীতে ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে সওদাগর দুইভাই এটিকে ঐ নকশা অনুযায়ী পুন নির্মাণ করেছিলেন। তা নাহলে পীরের জন্য আলাদা কামরার প্রয়োজনীয়তাই ছিলনা। অতএব বদর মোকাম যে অনেক প্রাচীন একটি মুসলিম ইবাদতখানা এতে কোন সন্দেহ নেই।

আকিয়াবে অবস্থিত বদর মোকামে মূলত দুটি কক্ষবিশিষ্ট দালান আছে। একটি টিলার উপরে। এটির উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুদিকে দুটি দরজা আছে। বাইরের মাপে ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা, ৯ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া এবং ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু; ভেতরের মাপে ৭ ফুট লম্বা, ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া এবং ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি উঁচু। ঘরগুলো পাথর ও ইটের তৈরী। দেয়ালে কোন পলেস্তরা নেই। অন্য গৃহটিও প্রায় একইভাবে তৈরী হয়েছে কিন্তু এটি প্রধান মসজিদ এবং এটি মঞ্চের মত উঁচু জায়গায় অবস্থিত পাথর এবং ইটের তৈরী সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। মসজিদটির উত্তর দক্ষিণে ২৮ ফুট ৬ ইঞ্চি, পূর্ব পশ্চিমে ২৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। মসজিদের ভিতরের মাপ দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১৩ ফুট।

মসজিদটি চার কোণা মিনার ও গম্বুজবিশিষ্ট। পশ্চিমের দেয়ালে বদর মোকামের মূল পরিচালকের নিয়ুক্তিপত্র ফারসি ভাষায় উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এ মসজিদটি বৌদ্ধ প্যাগোডা ও ভারতীয় মসজিদের মিশ্র নির্মাণ শৈলীতে নির্মিত।[৪৩] উল্লেখিত বদর মোকাম মসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে একটি পাথর রয়েছে যেখানে পীর বদরের পায়ের পাতার চিহ্ন ও হাঁটুর দাগ স্পষ্টভাবে দেখা যায়।[৪৪] অনুমান করা হয় যে, হযরত বদর উদ্দীন (রহ.) অনবরত ইবাদত ও সাধনা করার ফলে উক্ত পাথরে তাঁর পায়ের হাঁটুর দাগ বসে গেছে। যাহোক পীর বদর সমগ্র আরাকানবাসীর অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। বিশেষত সমুদ্রপথে চলাচলকারী বণিক ও নাবিকগণ তাঁকে বেশী স্মরণ করে থাকে। পীর বদর সমুদ্র পথে যাতায়াত করতেন বলে নাবিকরা তাকে 'দরিয়াপীর' বলে বিশেষভাবে স্মরণ করে; এমনকি তার আস্তানা, চিল্লাখানা বা দরগাহও সমুদ্রের উপকূলে। মীরাট বা পাঞ্জাব থেকে আগত সুফি বা ধর্ম প্রচারকের এত সমুদ্রপ্রীতি থাকা কিংবা সমুদ্রভ্রমণ করার কথা নয়। তাই তিনি হয়তো আরব দেশ থেকেই এসে থাকবেন। এক্ষেত্রে ড. আবদুল করিম মাহি আছোয়ার, হাজী খলিল প্রমুখ পীরদের মত এ পীরদেরকেও আরব থেকে এ অঞ্চলে আসার কথা বলেন।[৪৫] তাঁর কথাও অনুমানভিত্তিক। যদি তাই হয়ে থাকে তবে সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সকল বণিক ও নাবিক ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ 'বদর' নামে ছিলনা তা কি করে বলা যাবে? হয়তো তখন থেকে আকিয়াবে মসজিদ স্থাপিত হলেও ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীতে বদর উদ্দীন নামক কোন অলী এসে সে মসজিদে নতুনভাবে আবাদ করেন এবং ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে সওদাগর ভ্রাতৃদ্বয় উক্ত মসজিদ পুনরায় সংস্কার করেন। মসজিদের অভ্যন্তরে রক্ষিত পা ও হাঁটু চিহ্নিত পাথরটি পীর বদরের জীবদ্দশাতেই 'বদর মোকামের' অস্তিত্ব বজায় থাকার প্রমাণ বহন করে। এ ছাড়া বদর মোকামে সকল ধর্মের লোক শ্রদ্ধা করার কারণে কোন লেখক এক 'বুদ্ধের মোকাম'[৪৬] বলে চিহ্নিত করলেও এটা ঠিক বলে ধরে নেয়া যায় না। কেননা যানবাহন চালনাকারী ড্রাইভার, নাবিক, পাইলট, প্রায় সকলেই পীর, মাজার প্রভৃতিকে অতীব শ্রদ্ধা করে থাকেন। কারণ তারা মনে করেন পীরের দোয়ায় দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সেই প্রচলিত ভক্তি শ্রদ্ধা থেকেই হয়তো সকল ধর্মের নাবিক সমুদ্রে চলাচলকারী ব্যক্তিগণ বদর মোকামকে শ্রদ্ধা করে থাকে। মূলত এটি মসজিদ এবং আরাকানের মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতির বাহন ও প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পকলা।

বদর মোকামের পর ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অলিগণের ইসলাম প্রচারের তথ্য পাওয়া গেলেও এ সময়ের মধ্যে আর কোন মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহ দীর্ঘ ২৪ বছর বাংলায় নির্বাসিত জীবন কাটানোর পর সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সহযোগিতায় আরাকান পুনরুদ্ধার করলে পূর্ব রাজধানী লংগিয়েতে তিন বছর রাজত্ব করেন। অতঃপর ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে সেখান থেকে ম্রোহং নামক স্থানে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং মুসলমানদের নামাজ আদায়ের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা 'সন্ধিখান মসজিদ' নামে খ্যাত।[৪৭] মসজিদটি রাজধানী

ম্রোহং থেকে আড়াই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। মুসলমানগণ যেখানেই কিছু দিনের জন্য অবস্থান করেন সেখানেই কমপক্ষে একটি নামাজঘর তথা মসজিদ নির্মাণ করে থাকে। যেমন মহানবি (স.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালে কুবা নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন বলে সেখানেই ইসলামের প্রথম মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আরাকান থেকে বিতাড়িত মুসলমানদেরকে বর্তমান গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার বাগদা অঞ্চলে ক্যাম্পে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলে সেখানে সাতটি ক্যাম্পের জন্য সাতটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।[৪৮] সুতরাং প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, লংগিয়েতে হাজার হাজার মুসলিম সৈনিক দীর্ঘ তিন বছর ধরে অবস্থান করলেও সেখানে কি কোন মসজিদ গড়ে ওঠেনি? সেখানে অবশ্যই একাধিক মসজিদ স্থাপিত হবার কথা। হয়তো সংরক্ষণের অভাবে তা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। এমনকি রাজধানীতে এবং দক্ষিণ আরাকানের স্যান্ডোয়ে জেলায় সেনা নিবাস নির্মাণ করে গৌড়ীয় মুসলিম সৈন্যদেরকে বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। মুসলিম সেনাসদস্যদের জন্য সেখানে অবশ্যই মসজিদ নির্মাণ হবার কথা।

যা হোক, অন্যকোন মসজিদ সম্পর্কে না জানা গেলেও আরাকানের আলেঝাইওয়া (Alezeywa) গামী রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে শান বাঁধানো পাড়সহ অবস্থিত দুটি জলাশয়ের মাঝ পথে পাথরের দেয়ালে ঘেরা সুরক্ষিত স্থানে নির্মিত 'সন্ধিখান মসজিদ' সম্পর্কে কিঞ্চিত জানা যায়। মসজিদ চত্বরটি উত্তর দক্ষিণে ৬৫ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিমে ৮২ ফুট। মসজিদের আয়তাকৃতি ৪৭ × ৩৩ ফুট। সামনে একটি বারান্দা ছিল। মসজিদ চত্বরের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে মসজিদের বারান্দার সাথে সংযোগকারী চলাচলের রাস্তা রয়েছে। বারান্দা থেকে মূল মসজিদে প্রবেশ করার জন্য দুটি দরজা ছিল যা ধনুকাকৃতি ছাদযুক্ত। মূল মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণের দেয়ালে সরু জানালা আলো প্রবেশের জন্য নির্মিত ছিল। মসজিদের সামনের বারান্দাতে ধনুকাকৃতি ছাদ ছিল তবে ছাদের বাইরের দিকটা ছিল পূর্ব দিকে হেলানো; এটি মাত্র ৯ ফুট উঁচু ছিল। মূল মসজিদের ছাদ অর্ধ বৃত্তাকার বর্গাকৃতির গম্বুজবিশিষ্ট। গম্বুজটি সিত্তা ওয়াং ও ডাক্কাথয়েন প্যাগোডার গম্বুজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সম্পূর্ণ মসজিদটি সুন্দরভাবে সুখণ্ড প্রস্তর দ্বারা নির্মিত ছিল। তবে তাতে কোন প্রকার অলংকরণ কিংবা কারুকাজ ছিলনা। বৃটিশ শাসনামলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ম্রোহংয়ের মুসলমান ব্যবসায়ীরা নিজ উদ্যোগে মসজিদের মেরামত করেছিলেন। মসজিদটি তাদের তত্ত্বাবধানে চলত এবং মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন মুয়াজ্জিন ও খাদেম নিযুক্ত ছিল। স্থানীয় মুসলমানগণ নির্দিষ্ট ইমামের পিছনে এই মসজিদে নামাজ আদায় করত।[৪৯] কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর মিয়ানমারের সামরিক জান্তার আক্রোশের স্বীকার হয়ে এ মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শুধু সন্ধিখান মসজিদই নয় ১৯৯৭ সালের মার্চ/এপ্রিল মাসের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরাকানের প্রায় ২৫টি মসজিদ ধ্বংস করে সেগুলোকে সেনাক্যাম্প কিংবা ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের ঘোড়ার আস্তাবল বানানো হয়েছে।[৫০] এখন এ সকল মসজিদ শুধুই স্মৃতি। হয়তো কিছুদিন পরে তা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে।

জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় মুসলিম সংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একজন ইমাম বা নেতার পেছনে কাতারবন্দী হয়ে মুসলমানগণ নামাজ আদায় করে থাকেন; ফলে নামাজকে অবলম্বন করে গড়ে উঠে মসজিদ; যা মুসলমানদের অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন। মসজিদের খিলান, গম্বুজ, মিনার ও মেহরাবসহ মুসলিম শিল্পকলার মৌলিক উপাদানকে ঠিক রেখে এ মসজিদসমূহ স্থানীয় মাটি ও জলবায়ুর উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়েছিল। সাধারণত এ মসজিদসমূহে বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ না থাকলেও ছোট ছাদ বিশিষ্ট বারান্দা ছিল, ওজুর জন্য চৌবাচ্চা ছিল। আর্দ্র জলবায়ুতে মসজিদের জন্য নির্মল আলো বাতাসের ব্যবস্থাকরণ একান্ত অত্যাবশ্যকীয় ছিল, সে জন্য একমাত্র কিবলার দিক ছাড়া তিন দিকে দরজা ও জানালার মাধ্যমে খোলা রাখার ব্যবস্থা ছিল। বৃষ্টিবাদল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জানালা দরোজাগুলো সাধারণত ছোট আকারে তৈরী করা হতো। হিন্দু-বৌদ্ধ এবং মুসলমান স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে তাদের মন্দির-মঠ অস্পষ্ট, অন্ধকার রাখার জন্য জানালা দরজার ব্যবস্থা কম পক্ষান্তরে মসজিদ প্রাঙ্গণ আলো বাতাসে উন্মুক্ত এবং এর সকল দরোজা-জানালা খোলা রাখার ব্যবস্থা থাকতো। মন্দির-মঠ-বিভিন্ন প্রতিকৃতিতে দেয়ালগুলো আঁকা কিন্তু মসজিদে প্রাণীর ছবি ছাড়া দেশজ অলংকরণ কিংবা অলংকরণ ছাড়া নির্মিত। মূলত ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণেই এ সকল স্থাপত্য শিল্পের ভিন্ন রূপ ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

বসতবাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য পাওয়া যায়না। রাজপরিবার ছাড়া প্রায় সকল বাড়িই ছিল বাঁশ ও কাঠের তৈরী। তবে মুসলমানগণ সাধারণত সাধারণ মাটি থেকে ৩/৪ ফুট উঁচু করে ঘরভিটা প্রস্তুত করত এবং তার উপর কাঠের বা বাঁশের খুঁটি পুঁতে চারকোণে আয়াতকার ঘর তৈরী করত। খুঁটির উপর আনুভূমিক কাঠ বা বাঁশের পাইর দিয়ে তার উপর বাঁশ বা কাঠের ঢালু চালা তৈরী করে পাহাড়ী পাতা বা ছন দিয়ে চাল ছাওয়াতো। এ ধরনের চারচালা ঘরের চারপাশে বারান্দা বের করে সম্পূর্ণ ঘরকে আটচালায় পরিণত করত। বন্যা কবলিত স্থানে বাঁশ ও বন্যামুক্ত অঞ্চলে মাটির দেয়ালেরও প্রচলন ছিল। অন্যদিকে মগবৌদ্ধরা সাধারণত দ্বিতল বাড়ি নির্মাণ করে নিচে তাত এবং উপরে নিজেরা বাস করত। তারাও বাড়ি নির্মাণে বাঁশ ও কাঠের ব্যবহার করত।[৫১] বাড়িঘর নির্মাণে উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক মিল থাকলেও মুসলমান ও মগ বৌদ্ধদের বাড়িঘর সহজেই চেনা যেত।

বাড়িঘর নির্মাণকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্বাসের ভিন্নতায় ব্যক্তির পরিবর্তন হলেও বাস্তবায়নে পদ্ধতিগত তেমন কোন ভিন্নতা নেই। বাড়ি নির্মাণের জন্য ভিটা নির্বাচিত করার সময় মুসলমানগণ এস্তেখারা করে দেখত এবং হিন্দুরা গণক ডেকে শুভাশুভ গণনা করিয়ে নিত। সেইসাথে 'যক্ষের দাইর' তথা ভূতপ্রেত চলাচলের রাস্তা, শ্মশান কিংবা কবরস্থানকে বসতবাড়ির জন্য মনোনীত করা হতো না। এত সতর্কতার পরও বাড়ির ভিটেকে নির্দোষ রাখার জন্য মুসলমানগণ মাওলানা এবং হিন্দুগণ গণকের নিকট থেকে

তাবিজ করে নিত। এছাড়া উভয় সম্প্রদায়ই শিরনী-সালাত ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নের দ্বারা বসতভিটেকে পরিশুদ্ধ করে নিত। এছাড়া জ্বীন-ভূতের আছর ও মানুষের যাদুটোনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য বসতভিটের নির্ধারিত অংশটি মাটিতে ভরাট ও উঁচু করার আগেই চারকোণে চারটি বাঁশ পুঁতে তার ডগায় পুরাতন কাপড়ের পতাকা বেঁধে দেয়া হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন ভিটেতে চুন চিত্রিত কালো পাতিল, ছেড়া জুতো, পুরাতন ঝাড়ু প্রভৃতি খুঁটির মাথায় বেঁধে কাকতাড়ুয়ার মত ঝুলিয়ে রাখতো। নির্ধারিত ভিটেয় ঘর নির্মাণের পূর্বে সুতলি দিয়ে ঘরের মাপ ও পরিমাণ চিহ্নিত করে চার কোণে ৪টি খুঁটি পোতা হতো। এ সময় মুসলমানগণ পাড়ার লোকজনকে ডেকে শিরনী খাওয়াতো এবং মাওলানাদের ডেকে কুরআন পাঠ ও দোয়া দরুদের অনুষ্ঠান করতো। চার কোণে খুঁটি পোতার সময় আজান দেয়া হতো যাতে জীন পরী ভূত প্রেত বিভিন্ন অশুভ বিষয় থেকে আল্লাহ হেফাজত করেন। অন্যদিকে হিন্দু বৌদ্ধরাও গণক ডেকে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত।[৫২]

ইসলাম একটি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন বিধান। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মানুষকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই বলে মহানবি (স.) এর নিকট প্রথম অহী এসেছিল 'ইকরা' 'পড় তোমার প্রভুর নামে'। মহানবি (স.) 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষার সময়' বলে ঘোষণা দিয়ে জ্ঞানার্জনকে আমৃত্যু পর্যন্ত ফরজ করে দিয়েছেন। জ্ঞানীদের মর্যাদাকে সমুন্নত করে মহানবি (স.) মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছিলেন। আরাকানে ইসলাম সম্প্রসারণের সাথে সাথে শিক্ষারও ভীষণ গুরুত্ব দেয়া শুরু হয়। বিশেষ করে ইসলাম তথা পবিত্র কুরআন হাদিস শিক্ষাকে আরাকানের মুসলমানগণ বাধ্যতামূলক মনে করত। মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মূলত মসজিদকে ব্যবহার করা হতো। মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিনের উপর গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।[৫৩] মুয়াজ্জিনকে মিয়াজী 'মিজ্জি' বলা হতো এবং তার পাঠদানকে বলা হতো 'মিজ্জির দরস'। মসজিদভিত্তিক শিক্ষার যে পদ্ধতি ইসলামের সূচনালগ্নে সুদূর আরব থেকে আরম্ভ হয়েছিল আরাকানেও এ পদ্ধতি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা সম্প্রসারণ নিশ্চিত করার জন্য মসজিদের বারান্দা অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে রাখা হতো। সিন্ধি খান মসজিদেও ছাদযুক্ত বারান্দার কথা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইমাম কিংবা মোয়াজ্জিন শিশুদেরকে পবিত্র কুরআন হাদীস ও বিভিন্ন মাসয়ালা মাসাইল শিক্ষা দিতেন।

মুসলমান সন্তান সন্ততির জন্য মসজিদকেন্দ্রিক এ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক মনে করা হতো। সন্তানের বয়স পাঁচ বছর হলেই তাকে 'মসজিদের দরসে' পাঠানো হতো। শিশুর এ শিক্ষা কার্যক্রম বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হতো। ওস্তাদসহ অন্যান্য আলিম-উলামা ও বয়জ্যেষ্ঠ মুরুব্বীদের উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠান সম্পাদন হতো। এ অনুষ্ঠানকে বলা হতো 'বিসমিল্লাহ খানি'।[৫৪] এ অনুষ্ঠানকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হতো

তেমনি সন্তানের পিতা মাতাও নিজেকে ধন্য মনে করতেন। কেননা কোন সন্তানকে বিসমিল্লাহর সবক দিলেই তার পিতা মাতার জন্য বেহেস্ত নসীব হয়।[৫৫] বিদ্যার্জনকে মুসলিম সমাজে খুব গুরুত্ব দেয়া হতো। কবি আলাওল মন্তব্য করেন হাজার আবিদ ব্যক্তির চেয়ে একজন বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেয়, শয়তান বিদ্বান ব্যক্তির ভয়ে এতো বেশী ভীত যে, সে তার সম্মুখে আসতে সাহস পায়না। অথচ বহু অশিক্ষিত মুজাহিদকেও শয়তান বিভ্রান্ত করে ও কুপথে নিয়ে যায়।[৫৬] এ জন্য বিদ্যা অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীর পায়ের ধুলাকেও মর্যাদা দেয়া হতো এবং বলা হতো বিদ্যা অর্জনে যাত্রাকালে পায়ে ধুলা লাগলে তার জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়।[৫৭] এ ধরনের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আরাকানী মুসলমানগণ শিক্ষাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। তারা এটাকে ধর্মীয় কর্তব্যের একটি অংশ, এটাকে একটি অনুধ্যান এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার ও নিজকে মুক্তি লাভের পন্থা হিসেবে গণ্য করতো। শুধু যে আরবি বা কুরআন হাদিসই শিক্ষা করতো তা নয় বরং সকল প্রকার জ্ঞানার্জনকেই মুসলমানগণ গুরুত্ব দিতেন। তবে ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানার্জনকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেয়া হতো। কবি আলাওলের ভাষায়,

সর্বশাস্ত্র শিখ আগে পড়িয়া কোরান / সংসারে মহিমা তার স্বর্গেত পরান ॥[৫৮]

মুসলিম পরিবারে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণকেও গুরুত্ব দেয়া হতো। মেয়েদেরও পাঁচ বছর বয়স হলে শিক্ষা আরম্ভ করতে হতো। কিন্তু মসজিদকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ ছাড়া উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ মেয়েদের কম ছিল। তবে ধনবান মুসলমানগণ বাড়িতে গৃহ শিক্ষক রেখে মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। কবি আলাওল উল্লেখ করেন,

পঞ্চম বরিষ যদি হইল রাজবালা / পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছত্রশালা ॥[৫৯]

'বিসমিল্লাহ খানি' অনুষ্ঠান হবার পরে প্রথম দিনই ঐ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে খই, মুড়ি ও চালভাজা দেয়া হতো। ছাত্র-ছাত্রীরা 'চাচ' নামক এক প্রকার পাটিতে বসত আর শিক্ষক বসতেন জলচৌকী কিংবা পিড়ির উপর।[৬০] ছুটির পর নতুন পড়ুয়ার সঙ্গে আনা খই মুড়ি ও চালভাজা সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হতো।

মুদ্রণ প্রক্রিয়া, কাগজ কলম ও বইপত্র সহজলভ্য না হবার কারণে তৎকালীন সময়ে আরাকানে পাঠদান কার্যক্রম অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। বিত্তশালী মুসলমানগণ হাতের লেখা কোরআন সংগ্রহ করতে পারলেও সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরা লিখিত কুরআন শরীফ সংগ্রহ করতে পারতো না। ফলে সাধারণত মুখে মুখে পবিত্র কুরআনকে শিক্ষা দেয়া হতো। তবে যারা লেখা কুরআন মজিদ সংগ্রহ করতে সক্ষম ছিল তাদের ছেলে মেয়েরা সহজে পাঠ সমাপ্ত করতে পারতো। নির্ধারিত দারস (পাঠ) শেষ হলে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের একত্রে দলবদ্ধভাবে কিছুক্ষণ দোয়া দরূদ ও নামাজের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হতো।[৬১] দরসের পাঠ শেষ হলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক মুসলিম ছেলে মেয়েরা বড় কোন আলিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তার কাছে ফারসি ভাষাসহ বিভিন্ন জ্ঞানচর্চা করতো।

শিক্ষা বাস্তবায়নে যেমন মসজিদের বারান্দাকে ব্যবহার করা হতো ঠিক সেভাবেই তৎকালীন আরাকানে বিভিন্ন সামাজিক বিচার আচার, ওয়াজ মাহফিল ও অন্যান্য সামাজিক প্রয়োজন পূরনের জন্য মসজিদের আঙ্গিনাকে ব্যবহার করা হতো।[৬২] কাজিগণ রাষ্ট্রীয় বিচারকার্য পরিচালনা করলেও স্থানীয় উলামা ও মুরুব্বীগণ বিভিন্ন সামাজিক বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনেও উলামাদের খুব মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল।

উপর্যুক্ত বিবরণে এ কথা সুস্পষ্ট যে, ধর্মীয় বিশ্বাসই সংস্কৃতি ও শিল্পকলার মূল উৎস। আরাকানে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হবার সাথে সাথে সেখানকার মানুষের লেনদেন, জীবন ও জীবিকার পদ্ধতি, চলাফেরার আদব কায়দা, খাওয়া দাওয়া, শিক্ষাদীক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় তেমনি বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা স্থাপত্য নিদর্শনেও স্ব স্ব বিশ্বাসের শিল্পরূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনির্মাণে সফল ভূমিকা পালন করেছে। তবে এ কথাও সত্য যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ একে অপরের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া এমনকি এক হিন্দু অন্য হিন্দুর কাছে জাত ও বর্ণগত বৈষম্যের কারণে কিংবা বৌদ্ধদের মহাযান ও হীনযান ধর্মতন্ত্রের মতবিরোধে তারা নিজ ধর্মীয় লোকদের হাতে যেভাবে নির্যাতিত হয়েছিল ইসলাম আগমনের পর তার পুরো উল্টো চিত্র দেখা গেছে। শুধু মুসলমান-মুসলমানেই নয় বরং মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ সর্বোপরি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আলাদা শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লালনকারী হলেও সকলে রাজ্যের উন্নয়নে ঐক্যের পরিবেশ বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। উভয় সম্প্রদায় হাজার বছর ধরে একই রাজ্যে পাশাপাশি বসবাস করার মিতালী ইতিহাস ও মনস্তাত্ত্বিক বন্ধন সম্পর্কে না জানার কারণেই আরাকানের মুসলমানগণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অথচ মুসলমানগণই ছিলেন আরাকানে উন্নতমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনির্মাণের প্রধান কারিগর।

পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জি

১ সংস্কৃতি শব্দটি সংস্কার বা সংস্করণ বিশেষ্য পদ থেকে গঠিত। এর অর্থ শুদ্ধিকরণ, বিশোধন, সংশোধন অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনকে পবিত্রকরণ, শোধনকরণ, পরিষ্কার বা নির্মলকরণ, কিংবা উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন প্রক্রিয়াকেই সংস্কৃতি বলে। এটাকে Culture (কৃষ্টি, কর্ষণ) তমুদ্দুন (নগর আচরণ তথা পরিশীলিত দৃষ্টিভংগী) তাহযিব (সুসজ্জিতকরণ) সাকাফাহ (প্রশিক্ষিত ও সফল হওয়া) প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আর যে বাহনের মাধ্যম বিশ্বাসকে বাস্তবায়ন করা যায় তাই শিল্পকলা। এদিক থেকে মুসলমানদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত সংস্কৃতি ও শিল্পকলাই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি ও শিল্পকলা। দ্রষ্টব্যঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ৫৩৬; Dr. Fazlur Rahman, 'What is Islamic Culture'. *Islamic Culture: A Few Angles,*

(Karachi: Umma Publishing House, 1964), p. 27; আহমদ আবদুল কাদের, "বাঙ্গালী সংস্কৃতির মূলধারা" খন্দকার আব্দুল মোমেন সম্পাদিত, *প্রেক্ষণ*, প্রেক্ষণ সাহিত্য সংগঠন, ঢাকা, ঈদ সংখ্যা, ১৯৯৭, পৃ. ৫৬।]

২ এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ের 'ইসলাম পূর্ব আরাকান' অংশে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, D.G.E. Hall, *A History of South-East Asia, op.cit.*, pp. 12-24; মুসা আনসারী, *ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী), পৃ. ৭-৯।

৪ A.P. Phayre, *History of Burma, op. cit.*, pp. 43-44.

৫ ড. মযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, *ইসলাম আওর মাযাহিবে আলম*, [মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী অনূদিত, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম] (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১), পৃ. ৪।

৬ *তদেব*, পৃ. ৫।

৭ *তদেব*, পৃ. ৬।

৮ যে এলাকা থেকে বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা হয় সেটি এখন ভারতের বিহার ও পশ্চিম রাজ্যদ্বয়ের অন্তর্গত। কপিলাবস্তু অঞ্চলটি কলকাতার উত্তর পশ্চিমে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। তাই মহাত্মা বুদ্ধকে অভারতীয় জাতীয় লোক অনুমান করা হয়। [দ্রষ্টব্য: ড. মযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, *ইসলাম আওর মাযাহিবে আলম*, পৃ. ১৯]

৯ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

১০ ড. মযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, *ইসলাম আওর মাযাহিবে আলম, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১-৩২।

১১ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮।

১২ *তদেব।*

১৩ R.B. Smart, *Burma Gazetteer, Akyab District*, Vol. A., Rangoon, 1957, p. 61.

১৪ আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০।

১৫ *তদেব*, পৃ. ১১।

১৬ *তদেব*, পৃ. ১৫।

১৭ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৫৯।

১৮ ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, "আরাকানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য: মগ মুসলমান সমাজ সম্পর্ক *আরাকানের মুসলমান: ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (চট্টগ্রাম: আরাকান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ২০০০), পৃ. ২২১।

১৯ ড. অমৃতলাল বালা, "রোসাঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতি" *আরাকানের মুসলমান: ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৫।

২০ *তদেব।*

২১ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮।

২২ আলাউল বিরচিত *তোহফা*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫০।

২৩ "আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য", *মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১।

২৪ *তদেব*, পৃ. ১৩১-৩২।

২৫ কবির ভাষায় -

ভিন্ন পুরুষের মুখ যে নারী দেখাইল / আপনার সোয়ামীর দাড়িতে অগ্নি দিল॥
নারীর বচন যদি শোনে ভিন্ন জনে / আপনার সোয়ামীর মাথা মুড়াইল শানে॥
ভিন্ন পুরুষের মুখ দেখাইলে নারী / নরকের হুতাশনে যাইবেক পুড়ি॥
(নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *'শরীয়তনামা'* আবদুল করিম সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩।)

২৬ ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, "আরাকানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য: মগ-মুসলমান সমাজ সম্পর্ক, *আরাকানের মুসলমান: ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২০-২১।

২৭ আলাউল বিরচিত *তোহফা*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২।

২৮ *তদেব*, পৃ. ১৬৩।

২৯ আলাউল বিরচিত *তোহফা*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৭।

৩০ *তদেব।*

৩১ *তদেব*, কবি উল্লেখ করেন -
যন্ত্রকুল হারাম হইছে এহি রীত / তবলা বাহিতে মাত্র গাজীর উচিত।
নিঃস্বার্থে ডম্বরু ঢোল বাহন লেখে দোষ / বিবাহ উৎসবে মাত্র বাহন সন্তোষ।

৩২ মুহাম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ "আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য" *মুহাম্মদ আনামুল হক রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩।

৩৩ Dr. Mohammed Yunus, *A. History of Arakan : Past & Present, op. cit.*, p. 169.

৩৪ Dr. Abdul Karim, *The Rohingyas: A Short Account of Their History and Culture, op. cit.*, p. 9.

৩৫ R.C.T. "PIR BADAR IN BURMA" *Journal of the royal Asiatic Society,* London, January, 1894, pp. 566-576.

৩৬ Muhammed Siddiq Khan, "Badr Maqams or the Shrines of Badr Al-DIN-AULIA" *Complete Works of Muhammed Siddiq Khan*, Vol. 2 (Dhaka: Bangla Academy, 1996), p. 38.

৩৭ বদর মোকামটি আকিয়াবের দক্ষিণাংশে অবস্থিত।

৩৮ আকিয়াবের বদর মোকাম ছাড়াও মালয় দীপ থেকে আসামের সীমা পর্যন্ত এ নামে অনেক মসজিদ পাওয়া যায়। এগুলোতে এখন হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমানসহ বিভিন্ন বিশ্বাসের লোকজন শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Richard C. Temple " Buddermokam," Journal of Burma Research Society, Vol. 15. Part 1, 1925, pp. 1-33.)

৩৯ *Complete Works of Muhammed Siddiq Khan*, Vol. 2, *op. cit.*, p. 38.

৪০ *Ibid*, pp. 49-51.

৪১ *Ibid*, p. 51.

৪২ *Ibid*, pp. 36-37.

৪৩ সামরিক জান্তা শাসিত বর্তমান মিয়ানমারে গবেষকদের প্রবেশ সহজলভ্য না হওয়ায় অত্র গবেষকের পক্ষে আরাকান ভ্রমণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে এ সকল স্থাপত্য শিল্প স্বচক্ষে দেখে বিবরণ উপস্থাপন করা যায়নি। বদর মোকাম বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য: Forchammer, Report on the Antiquities of Arakan, 1892, p. 60, quoted in Akyab District Gazetteer, Vol. A, Rangoon, 1917, p. 40; Richard C. Temple "Budder Mokam" *JBRS, op. cit.*. pp. 7-8.

৪৪ *Ibid.*

৪৫ ডক্টর আবদুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮।

৪৬ Richard C. Temple, "*Buddermokam,*" *JBRS, op. cit.*, pp., 1-33.

৪৭ R.B. Smart, *Burma Gazetteer. Akyab District,* Vol. A. *op. cit.*, p. 61.

৪৮ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মো. মাহফুজুর রহমান, "রংপুরের সুবীর নগরে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির: প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, বিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০০২, পৃ. ১৪৭-১৬১।

৪৯ R.B. Smart, *Burma Gazetteer. Akyab District,* Vol. A. *op. cit.*, pp. 61-62.

৫০ *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ৯ এপ্রিল, ১৯৯৭; *New Straits Times,* 9 April 1992 [মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্যের ধ্বংস সাধনে মিয়ানমার সামরিক জান্তার কর্মকাণ্ডের সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন: মো. মাহফুজুর রহমান, "রোহিঙ্গা সমস্যা: বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী, ১৯৭৮, ১৯৯৪, অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, পৃ. ১৫৯-১৬০।]

৫১ বসতবাড়ি নির্মাণশৈলীর বিবরণটি W.W. Hunter Gi *AStatistical Account of Bengal,* Vol. 6,(Delhi : D.K. Publishing House.1993). p. 158 এবং আরাকানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য: মগ-

মুসলমান সম্পর্ক" *আরাকানের মুসলমান ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৮-২১৯, এর উপর ভিত্তি করে রচিত।

৫২ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫০৪-৫১৩।

৫৩ *তদেব*, পৃ. ৪৬৯।

৫৪ S.M. Jafar, *Education in Muslim India, 1000-1800 A.D.* (New Delhi: Idarah - 1-Adabiyati, 1972), p. 153.

৫৫ কবি আলাওলের ভাষায় -
গুরুও শিশুরে যদি বিসমিল্লাহ পড়ান / গুরু মাতা পিতা শিশু ভেহেস্তেত যান।।
[দ্রষ্টব্যঃ আলাউলের *তোহফা*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৯]

৫৬ কবি আলাওলের ভাষায় -
এক আলিমের যথ গুণের বাখান / হাজার আবেদ নহে আলিম সমান॥
ইব্লিস আলিম কাছে ডরে নাহি যাএ / বহুল যাহেদ এক শ'তানে ভুলাএ॥
[দ্রষ্টব্যঃ আলাউল বিরচিত *তোহফা*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৮।

৫৭ কবি বলেন -
পড়নে যাইতে যথ ধুলা লাগে পাএ / নরক হারাম তার করন্ত খোদাএ॥
[আলাউল বিরচিত *তোহফা*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৯।]

৫৮ *তদেব*, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

৫৯ আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮।

৬০ ড. মুহাম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৭।

৬১ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬৯-৭০।

৬২ ড. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, "আরাকানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যঃ মগ-মুসলমান সমাজ সম্পর্ক, *আরাকানের মুসলমানঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৯।

অধ্যায় ৬
আরাকানে মুসলিম-অমুসলিম সাংস্কৃতিক বিনিময়

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবন বিধান। এর ধর্মীয় নীতিমালাসমূহ পালন না করে স্ব-স্ব ধর্মের প্রতি আস্থাবান ও অনুগত থেকেও শুধুমাত্র এর অন্যান্য বিধানসমূহ মেনে যে কোন অমুসলিম কল্যাণ লাভ করতে পারে। আরাকানী অমুসলিম সমাজে এ উক্তির সত্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। অধ্যাপক আলী আহমেদের ভাষায় "বর্মী আরাকানের সর্বত্রই, কি রান্নাবান্না, শরীর চর্চা, পর্দা প্রথা, কাব্য রচনা, চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থাপত্য রীতিনীতি, মুদ্রাংকন ও মান নির্ণয় থেকে শুরু করে প্রাসাদ শিষ্টাচার পর্যন্ত গৌড়ীয় মুসলমান রীতিনীতি অনুসৃত হতো।[১] রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে মুসলিম সালতানাত কিংবা ইসলামি আইনের ভিত্তিতে রাজ্য পরিচালনার সুযোগ না পেয়েও অমাত্য সভার প্রতিনিধিত্ব ও শাসিতের অবস্থানে থেকে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া সত্যিকার অর্থেই ইসলামের উন্নত আদর্শিক ভিত্তিই প্রমাণ করে। অপরদিকে মুসলমানদের উদার সামাজিক দৃষ্টিভংগী ও ইসলামি জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে আরাকানী অমুসলিমদের প্রভাবও মুসলমানদের জীবন-সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয়েছে। অত্র অধ্যায়ে অমুসলিমদের মধ্যে মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে স্থানীয় প্রভাব কতখানি প্রতিফলিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৬.১ মুসলিম সংস্কৃতি ও আরাকানী অমুসলিম সম্প্রদায়

আরাকানে কখনো পুরোপুরিভাবে মুসলিম শাসন কিংবা ইসলামি সালতানাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রশাসনের অধীনে বসবাস করলেও মুসলিম সংস্কৃতি-সভ্যতা আরাকানীদের নিকট তাদের স্বকীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার চেয়ে উন্নততর বলে পরিগণিত হয়েছিল। ফলে তারা মুসলমানদেরকে যেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখত তেমনি নিজেদেরকে পরিশীলিত ও রুচিবান করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংস্কৃতি গ্রহণ করত। তারা নিজেরাই মুসলমানদেরকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করত। যেমন মালয়বাসী মুসলমানদেরকে 'চুলিয়া' বা নানা, সিলোনবাসী মুসলমানদেরকে 'সিলোনমুর' বাংগালী মুসলমানদেরকে কালা এবং আরাকানের মূল অধিবাসী মুসলমানদের 'রোয়াঙ্গ্যা' নামে আখ্যায়িত করত।[২] বর্তমানকালে কালা ও রোহিঙ্গা শব্দ দিয়ে বিদেশী চিহ্নিত করে আরাকান থেকে বিতাড়িত করার প্রক্রিয়া (সংস্কৃতি) চালু করলেও মধ্যযুগে মুসলমানদের এ সকল নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দেখা হতো। তারা মুসলমানদেরকে নিজেদের আত্মার আত্মীয়

মনে করেই তাদের অনুসৃত সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতিসমূহকে নিজেদের মধ্যে অনুশীলন করতো।

৬.১.১ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

আরাকান রাজ্যের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। দীর্ঘ সময়ের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সভ্যতার আলো থেকে সেখানকার জনসাধারণ অনেক দূরে অবস্থান করতো। সেকালে তারা ছিল বন্য স্বভাবের। তারা মাথার চুল ও হাতের নখের যত্ন নিতো না।[৩] তারা লম্বা চুল ও নখ রাখতো। দেখতে খানিকটা কথিত আদিম যুগের মানুষের মতো মনে হতো। পক্ষান্তরে চুলকাটা, নখ কাটাসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবার ১০টি নীতিমালাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সুন্নাত হিসেবে মুসলমানগণ পালন করে থাকে। মিসওয়াক করা তথা দাঁতের যত্ন নেয়াসহ মুসলমানদের এ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসংক্রান্ত সংস্কৃতি আরাকানী হিন্দু-বৌদ্ধরা ব্যাপকভাবে অতীব আগ্রহসহকারে গ্রহণ করে। সেখানে চুল কাটা, পরিপাটি করে আঁচড়ানো প্রভৃতি মুসলিম সংস্কৃতির ফল। অবশ্য মুসলমানগণ দাড়ি রাখলেও অমুসলিম আরাকানীরা চুলের যত্ন নেয়া শিখতে গিয়ে দাড়ি গোঁফও মুণ্ডন শুরু করে।

৬.১.২ উন্নত রান্না পদ্ধতি

'মুসলমানের হাড়ি, হিন্দুর বাড়ি এবং পশ্চিমাদের গাড়ি' তিন জাতির জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য রম্যভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। মুসলমানগণ শুধু হালাল হারামকে বাছাই করেই খানা পিনা করেনা বরং সুনিপুন রান্নার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু ও বৈচিত্রময় করতেও তারা পারদর্শী। বিশেষ করে সুলতানী ও মোগল শাসকগণ রান্নার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। পক্ষান্তরে আরাকানীরা রান্না বান্নায় ততোটা দক্ষ ছিল না। হালাল হারামের ক্ষেত্রে যেমন তাদের কোন বাধা নিষেধ ছিল না তেমনি রান্নারও একাধিক নিত্য নতুন কোন পদ্ধতি তারা জানতো না।[৪] শাকসব্জি, মাছ-মাংসও তারা কোন রকমে সিদ্ধ করে কিংবা অনেক সময় কাঁচাই ভক্ষণ করতো। আরব মুসলমানদের প্রভাবে প্রথমত তারা সুস্বাদু করে মাংস রান্না করতে শেখে। অতঃপর গৌড়ীয় প্রভাবে পোলাও, কোরমা, বিরিয়ানী রন্ধন প্রণালী এবং বিভিন্ন মসলার ব্যবহারের মাধ্যমে তরকারীকে সুস্বাদু করার প্রক্রিয়া রপ্ত করে।[৫] মসলার বিভিন্নমুখী ব্যবহারের কারণে আরাকানীরা শুটকি মাছকে ভর্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রান্নার আওতায় এনে সুস্বাদু ও উপাদেয় খাবার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের পচন থেকে 'নাফফি' তৈরী করে তা মসলা প্রয়োগের মাধ্যমে মজা করে ভক্ষণ করে। মুসলমানগণ শুটকী মাছের ভর্তা ও তরকারী খেলেও নাফফীকে হারাম বলে পরিহার করত।

৬.১.৩ সতীত্ববোধ ও পর্দা প্রথা

খ্রিস্টপূর্ব জড়বাদী সমাজে নারীরা ছিল চিত্তবিনোদন ও ভোগের সামগ্রী মাত্র। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর জ্বলন্ত চিতায় স্বামীর সাথে জীবন্ত স্ত্রীকে দাহ করা (সতীদাহ প্রথা) ছিল তাদের ধর্মীয় নিয়ম। সপ্তম শতাব্দীর দিকে এ প্রথা খুব ব্যাপক ছিল।[৬] পুরুষেরা মনে করত নারীদের কোন নিজস্ব মতামত ও ব্যক্তিত্ব বলে কিছু থাকবে না। শুধু পুরুষদের মনোরঞ্জন করাই তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। স্বামী যতই নির্যাতন করুক না কেন তবুও যে মহিলার মন, মুখের কথা এবং দেহ স্বামীর অধীনের থাকবে সেই মহিলা এ পৃথিবীতে পুরস্কৃত হবে এবং পরজগতে তার স্বামীর সাথে থাকার সুযোগ পাবে।[৭] নারী জাতি পুরুষদের বশ্যতা স্বীকার করে থাকা যেমন বাধ্যতামূলক তেমনি তাদেরকে কোন উত্তরাধিকার স্বত্বও দেয়া হতো না।[৮] এমনকি সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য থাকলেও অবৈধভাবে নারী সম্ভোগের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ এ বৈষম্য মনে রাখত না। নিম্ন বর্ণ বা শ্রেণির সুন্দরী মহিলাগণ ব্রাহ্মণদের ভোগের বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[৯] এভাবে অমুসলিম তথা হিন্দু সমাজে নারীকে দাসীতে পরিণত করা হয়েছিল।

ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ-নারীর চরিত্র ও সতীত্বের পূর্ণ হিফাযতই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পবিত্র কুরআনে যৌনাঙ্গের হেফাযতকারীকেই সফলকাম বলা হয়েছে।[১০] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল করা হল। আর ঈমানদার সতী নারী ও তোমাদের পূর্বেকার আহলে কিতাবধারী সতী নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হল। তবে শর্ত হচ্ছে তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদানের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে চুরি করে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।[১১] পবিত্র হাদিস শরিফে হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবি (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিসের (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী জিনিসের (যৌনাঙ্গ) নিশ্চয়তা দিতে পারে আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হতে পারি (বুখারী ও মুসলিম)।[১২] অন্যত্র হযরত আবু হুরায়রা (রা.) মহানবি (স.) থেকে বর্ণনা করেন, আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটা নিঃসন্দেহে সে পাবেই অর্থাৎ এ ধরনের পাপ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। দু'চোখের যিনা হচ্ছে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা, দু'কানের যিনা হলো যৌন উত্তেজক কথাবার্তা শ্রবণ করা, মুখের যিনা হলো যৌন বিষয় অশ্লীলভাবে আলোচনা করা, হাতের যিনা অন্য নারীকে স্পর্শ করা এবং পায়ের যিনা হচ্ছে ঐ সকল উদ্দেশ্যে যাতায়াত করা, অন্তরের যিনা হচ্ছে ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত ও তার আকাঙ্ক্ষা তৈরী করা এবং যৌনাঙ্গ

এমন অবস্থায় যিনাকে সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।[১৩] (বুখারী ও মুসলিম) অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যাদের চরিত্র উত্তম।[১৪] সুতরাং মুসলামানগণ অবাধ ও অনিয়মতান্ত্রিক-অবৈধ যৌনতাকে প্রশ্রয় দিতেন না বলেই ছয় মাসের জন্য বাণিজ্য করতে এসেও আরাকানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। এ সময় তারা বিধবা পর্দানশীন এবং সচ্চরিত্রবতী মহিলাদেরকে প্রাধান্য দিতেন এবং তাদেরকে ইসলামে দীক্ষা দিয়ে তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। মুসলমান কর্তৃক বিবাহিত মহিলাগণ সুন্দর পোষাক পরে পর্দা করতেন। তাদের এ সুন্দর পোষাকে পবিত্র অবয়বকে যেমন অন্য নারীদের পর্দা প্রথায় উৎসাহিত করত তেমনি সতীত্ব রক্ষার প্রেরণাও খুঁজে পেত। পর্দা প্রথার মাধ্যমে সতীত্ব রক্ষা সহজ হতো বলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মহিলারাও পর্দা প্রথার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। বিশেষ করে পর্দানশীল বিধবা মহিলাদেরকে আরব বণিকগণ বিয়ে করায় আরাকানের নির্যাতিত ভাগ্যাহত মহিলারা নিজেদেরকে পর্দায় ঢেকে সতীত্বকে বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। ক্রমশ নির্যাতিত মহিলাগণ ব্যাপক হারে ইসলামে দীক্ষা নিয়ে মুসলিম বণিকদের স্ত্রীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতেন এবং তাদের সুন্দর পর্দানশীন পোশাক অন্যান্য মহিলাদেরকেও আকর্ষণ করতো। ড. অমৃতলাল বালা উল্লেখ করেন "চট্টগ্রাম-আরাকানে যে পর্দা প্রথার প্রচলন শুরু হয় তা খাঁটি আরবীয় মুসলমানদের সংশ্রবের ফল।"[১৫] মুসলিম সমাজে ধর্মীয় চিন্তা চেতনা থেকে পর্দা প্রথার প্রচলন পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হওয়া শুরু হলেও অমুসলিম সমাজে নারীদের জন্য পর্দা বা আবরু প্রথা সমাজে আভিজাত্য ও সামাজিক শালীনতা বলে মনে করা হতো। প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট শাহ-সামন্ত অভিজাত এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ঘরের নারীরা পর্দা করত। দরিদ্র ঘরের মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে, ক্ষেতে খামারে, হাটে-ঘাটে জীবিকা অর্জনের জন্যে কিংবা স্বামী সন্তানের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করতে হতো। তাই তারা পর্দার সুযোগ না পেলেও অন্তত শালীন পোষাক পরিধান করে নিজেদের লজ্জা ও আবরু ঢাকত। এমনকি কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখাকেও তারা শালীনতা হিসেবে মনে করত। কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার বলেন -

বিনি বাসে শির যেবা রাখে অনুচিত / মগধ বিরান সেই জানিও কুৎসিত ॥[১৬]

মুসলমানদের প্রভাবে আরাকানী নারীদের মধ্যে সতীত্ববোধ নতুন রূপ লাভ করে। তারা এ ধারণা করতে সক্ষম হয় যে সতীত্বই নারীর অলংকার। নারী তার সতীত্বকে ধরে রাখতে না পারলে তার আর কোন মূল্যই থাকত না। কবি আলাওলের ভাষায় -

স্বামীর পিরীতে ভাবে নিজ প্রাণ দিব / এ জন্মে না পাই যদি জন্মান্তরে পাব ॥
এক ছাড়ি দোসর ভাঙিলে নহে সতী / সংসার কলঙ্ক পরকালে অধগতি ॥[১৭]

তবে স্বামী পরিত্যাক্তা বিধবা হলে তার পুনঃবিবাহকে তারা সমর্থন করত না। এমনকি এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে 'পরকালে অধগতি' হিসেবে মনে করা হতো। অথচ মুসলিম সমাজে নারীদেরকে একাধিকবার বিয়ে ও তালাকের অনুমতি দিয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে ক্রমশ বৌদ্ধ সমাজেও এ রীতি চালু হয়েছিল।

৬.১.৪ পোষাক পদ্ধতি

লজ্জা নিবারণ ও সৌন্দর্য সংস্কৃতির বিকাশে পোষাক পরিধান করা হয়ে থাকে। ইসলাম অত্যন্ত সহজ ও বাস্তবমুখী জীবন বিধান। এই মূলনীতি অনুযায়ী সমগ্র মানবজাতির জন্যে যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, সেখানে মুসলমানদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম মেনে স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য, সহজ চলাচল, কার্যপোযোগিতা, আবহাওয়া-জলবায়ু, পরিবেশ ও সমাজ প্রভাব ইত্যাদির নিরিখে পোষাক পরার অবকাশ ইসলামে দেয়া হয়েছে। পোষাকের প্রশ্নে ইসলাম 'লিবাসুত তাক্বওয়া' বা আল্লাহ ভীতিযুক্ত পোষাকই একমাত্র বিবেচনার বিষয় করেছে।[১৮] এ সম্পর্কে আল্লাহর বানী, 'হে বনী আদম, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকা ও বেশভূষার জন্য আমি তাদেরকে পোষাক দিয়েছি এবং তাকওয়ার পোষাক, এটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম যাতে তারা স্মরণ করে বা উপদেশ গ্রহণ করে।'[১৯] ইসলামে নির্দিষ্ট ছকে কোন পোষাক নির্ধারণ না করা হলেও তাকওয়ার পোষাক বলতে ঐ ধরনের পোষাক বুঝায় যা পরিধান করলে পেশাব-পায়খানা, ইবাদত কার্যক্রম প্রভৃতি কার্যাবলী সমাধা করতে সমস্যা হয়না। পবিত্রতা অর্জন ও বাহ্যত দেখতেও সৌন্দর্য মণ্ডিত হবে এমন পোষাকই তাকওয়ার পোষাক। এজন্য মুসলমান পুরুষগণ দেশীয় আবহাওয়ার ভিত্তিতে পোষাক পরিধান করে থাকেন। তবে আলিমগণ সাধারণত পায়জামা পাঞ্জাবী, টুপি পাগড়ী প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। মহিলাদের পোষাকের ব্যাপারে মুসলমানগণ বেশী যত্নবান ছিলেন। হাত, পায়ের পাতা ও মুখমণ্ডল ছাড়া সাধারণত অঙ্গের অন্যকোন স্থান যেন পরপুরুষে না দেখে সে সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। আরাকানী মুসলিম মহিলারা কামিজ ও পাজামা জাতীয় পোষাক পড়ত। সে অনুকরণে বৌদ্ধ মহিলারাও এ ধরনের পোষাক ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তার কাটিং পদ্ধতি খানিকটা বদলে যায়। আরাকানী মহিলারা নিম্ন ও উত্তমাঙ্গ আবরণের জন্য দু'খানা রংবেরংয়ের কাপড় ব্যবহার করত। উপরিভাগে ওড়না জাতীয় কাপড়কে 'ডোমা' এবং নিম্নভাগে পরিধেয় বস্ত্রকে থামি বলা হতো।[২০] উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এ পোষাক পদ্ধতিটি আরাকানী হলেও এর ব্যবহারবিধি ভারতীয় মুসলমানগণই শুরু করেছিল। কারণ মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলিম মহিলাগণ কামিজ, ওড়না ও পাজামা পড়তেন বলে সমসাময়িক চিত্রকলায় উল্লেখ পাওয়া যায়।[২১] সেই পোষাক ক্রমশ ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনে বর্তমানরূপে এসে পৌছেছে। তবে বর্তমান বৌদ্ধদের পোষাক মধ্যযুগের পোষাক থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

শুধু ব্যবহারিক পোষাকই নয়, বিবাহ দিনসহ বিশেষ বিশেষ দিনেও বৌদ্ধরা মুসলিম পোষাক পড়ত। বৌদ্ধ পুরুষেরা বিয়ে উপলক্ষে ইসলামি পোষাক নামে খ্যাত ইজের, আচকান ও মাথায় পাগড়ী পরিধান করে বরসজ্জা করত।[২২] এমনকি বিয়ের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা তথা ইজাব কবুল পদ্ধতি, কন্যা সমর্পণ প্রভৃতি ও অতিথি আপ্যায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথা অলিমা দেবার ক্ষেত্রে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যেত।

৬.১.৫ বর্ণবৈষম্য লাঘব

আরাকানী হিন্দু সমাজে বর্ণ বৈষম্য ছিল ব্যাপক। সুচিবাইয়ের নামে অনেক নিম্ন পেশা ও গোত্রের নিম্নশ্রেণিকে মানুষই মনে করা হতো না। ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির আদলে চট্টগ্রাম এবং সেই আদলেই আরাকানেও বর্ণবৈষম্য ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। আরাকানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সূচনাকালে তাই নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই বেশী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলেও একই চিত্র দেখা যেত। হিন্দুদের প্রভাবে বৌদ্ধদের মধ্যেও বর্ণবৈষম্য শুরু হয়। কিন্তু ইসলামের প্রসার ও প্রভাব শুরু হলে দলে দলে নিম্ন শ্রেণির হিন্দু ও বৌদ্ধরা ইসলামে দীক্ষা নিতে থাকে। মুসলিম সমাজে শ্রেণি বিভেদ ও বর্ণবৈষম্য তেমন ছিল না বললেই চলে। তারা একই পাত্রে আহার করত এবং একই সাথে উঠাবসা করত। এ প্রভাব চট্টগ্রাম আরাকানের বৌদ্ধদের মধ্যেও পড়তে শুরু করে। বিশেষত মধ্যযুগে বৌদ্ধদের মধ্যে মুসলমানদের মতো স্পর্শদোষ বা এটোর বাছবিচার এবং বর্ণ বৈষম্য অনেকাংশে দূরিভূত হয়। মুসলমানদের মত তারাও এক সাথে পাঁচ ছয়জন নিম্ন পেশার লোকসহ খেতে বসত।[২৩] এমন কি হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ একই বৈঠকে খাওয়া ও পান করাতেও কোন সমস্যা মনে করত না। বিশেষত মুসলমানগণ অমাত্য সভার সদস্য হিসেবে সফলতার সাথে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় তারা আরাকানী রাজা ও সম্ভ্রান্ত জনগণের কাছে এতটাই প্রিয় হয়েছিলেন যে, তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিয়ে কিংবা সামাজিক অন্য যে কোন আনন্দঘন অনুষ্ঠানে বৌদ্ধদের সাথে একত্রে উপস্থিত থাকতেন এবং তাদের উদার আচরণ বিশেষত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বৌদ্ধ শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

৬.১.৬ দরবারী সংস্কৃতি

সুলতানী ও মোগল আমলে পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলিম সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তার দীপ্তি আরাকানেও ছড়িয়ে গিয়েছিল। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে গৌড় দরবারে আশ্রিত নরমিখলা গৌড়ের সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের সহায়তায় রাজ্য ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে শুধু সামরিক ঋণই নয় সাংস্কৃতিক ঋণও স্বীকার করে নেন। তিনি নিজে নরমিখলা থেকে সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করেন এবং পরবর্তী স্বাধীন শাসকদের মধ্যে এ ধারা প্রচলিত করে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত করেছেন। শুধু তাই নয় বরং মুসলিম শাসন সংস্কৃতি গ্রহণ করেও কৃতার্থ বোধ করেছেন।[২৪] এ অঞ্চল বর্তমানে যেমন খানিকটা ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ নির্ভর, সে যুগে আরাকান অঞ্চলও তেমনি দক্ষ মুসলিম কর্মচারী নির্ভর ছিল। পদস্থ মুসলিম কর্মচারী এবং সচিবগণও বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতা এবং আনুগত্যের প্রয়োগে কখনো কার্পণ্য করেনি। এমনকি আরাকান রাজা শ্রী চন্দ্র সু ধর্মাকে সিংহানচ্যুত করার জন্য তারা শাহজাদা মুহাম্মদ সুজার প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকে সমর্থন না করে তা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য সকল তৎপরতায় রাজাকে সহযোগিতা করেছিল।[২৫] মুসলমান রাজকর্মচারীগণ এতটাই বিশ্বস্ত ছিলেন যে, গৌড়-মুগলদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধেও মুসলিম সমরসচিব ও সেনা সদস্যগণ নিযুক্ত

থাকতেন। আরাকানের বিচার ব্যবস্থায় মুসলিম আইন অনুযায়ী মুসলিম কাজি কর্তৃক বিচার কার্যক্রমও চলত। মুসলিম শাসন পদ্ধতি ও সংস্কৃতিতে আরাকানের রাজাগণ এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, মুদ্রায় কালিমা ও ফারসি হরফে মুসলিম নাম উৎকীর্ণ করেছিল, যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আরাকানী রাজাগণ ক্ষমতায় আরোহণ করার সময় হিন্দুয়ানী পদ্ধতিতে হিন্দু ব্রাহ্মণদের দিয়ে অভিষেক অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। কিন্তু প্রশাসনে মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধি হবার পর তারা আর হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ পৌরহিত্যের নীতিতে অভিষেক অনুষ্ঠান করতেন না। মুসলিম অমাত্যগণ অভিষেক অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দিতেন। আরাকান রাজা সান্দা থু ধম্মা (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রি.) তদীয় প্রধানমন্ত্রী নবরাজ মজলিস এর নেতৃত্বে অভিষেক অনুষ্ঠানে রাজাকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। উক্ত শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে অভিষেককালে যুবরাজ সান্দা থু ধম্মা সিংহাসনের বাইরে তথা রাজদরবারে তার আসনের বাইরে পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়ান। প্রধানমন্ত্রী নবরাজ মজলিশ যুবরাজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান। রাজাকে যে বিষয়ে শপথ দেয়া হয় তাহল "প্রজাদেরকে পুত্রের মত স্বস্নেহে লালন পালন করবেন। তাদের সাথে কোন প্রকার ছলনার আশ্রয় নিবেন না কিংবা বল প্রয়োগ করবেন না। সবলকে দুর্বলের উপর বল প্রয়োগ করতে দেবেন না। সজ্জনকে রক্ষা এবং দুজ্জনকে দমন করবেন। পূর্বকৃত অপরাধের জন্য বর্তমানে কাউকে শাস্তি দিবেন না। ধর্মীয় বিধান অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করবেন। নিজে সচ্চরিত্র ও ধর্মশীল থাকবেন। কোন সময় চঞ্চল বা অস্থির মতি না হয়ে সব সময় ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।"[২৬] শপথ বাক্য পাঠ শেষ হলে রাজা প্রথমে প্রধানমন্ত্রী নবরাজ মজলিশকে সালাম করেন এবং পরে রাজপরিবারের বয়োবৃদ্ধদের প্রণাম করেন।

আরাকানী অমুসলিমদের মধ্যে মুসলিম সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণীয় হিসেবে জীবনের বিভিন্ন স্তরে পালিত হলেও ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে বার্মার রাজা বোধাপায়া কর্তৃক আরাকান রাজ্য দখল করার পর থেকে তা ক্রমশ কমতে থাকে। এমনকি রাজ্যের প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ও সৌহার্দমূলক পরিবেশও বিঘ্নিত হতে থাকে। বর্তমানে চট্টগ্রামে বসবাসরত বৌদ্ধদের মধ্যে মুসলিম প্রভাব খানিকটা পরিলক্ষিত হলেও আরাকানী বৌদ্ধদের মধ্যে তা আর তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

৬.২ মুসলিম সমাজে অমুসলিম সংস্কৃতি

আরাকানে পূর্নাঙ্গরূপে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত না হবার কারণে আরাকানী মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের পুর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেনি। প্রাথমিক পর্যায়ে তাওহীদের দিক থেকে মজবুত থাকলেও পরিবেশগত কারণে ইসলামের পুরোপুরি অনুসরণ হয়নি। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা পেলেও তৎকালীন মুসলিম সমাজে অনেক রীতিনীতিই প্রচলিত ছিল যা মূলত তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদ থেকে মুসলমানদেরকে খানিকটা দূরে সরে নিয়ে গিয়েছিল। অথচ সে রীতিপদ্ধতি ও

আচার আচরণসমূহ হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ সমাজের প্রভাব থেকে এলেও তার অধিকাংশই মুসলমানগণ ইসলামের রীতিনীতি হিসেবেই পালন করত। সামাজিক সহাবস্থানে যুগ যুগ ধরে বসবাসের মধ্য দিয়ে কখন যে এ সকল অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড পূণ্যময় হিসেবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে তা অনেকেই অনুধাবন করতে পারেনি। 'বিদ'আত'[২৭] নামে পরিচিত এ সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি-প্রথা মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে।

৬.২.১ সামাজিক রীতিনীতি

মুসলিম সমাজে বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি অনুষ্ঠান শরিয়ত মোতাবেক সম্পন্ন হতো। তবে শরিয়তে নিষেধাজ্ঞা নেই বরং ছওয়াব হওয়া কিংবা নিছক আনন্দ করার জন্য মুসলমানগণ কিছু রীতি-প্রথা মান্য করত। বিবাহ শাদীতে শরিয়তের বিধান মোতাবেক বর কনে দেখা, মোহরানা নির্ধারণ, মাওলানা কর্তৃক বিবাহ পড়ানো, অলিমার মাধ্যমে মুখ মিষ্টি কিংবা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন সবকিছুই শরিয়ত মোতাবেক হলেও অঞ্চলভিত্তিক কিছু সামাজিক রীতি-প্রথা লক্ষ্য করা যেত। চট্টগ্রাম অঞ্চলে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলিম বিয়েতে 'মঙ্গল ঘট'[২৮] বসানো হতো। মঙ্গল ঘটে ব্যবহৃত উপাদানগুলো এক একটি শুভ ধারণার প্রতীক, যেমন কলাগাছ ও আম পাতা দীর্ঘায়ুর প্রতীক, পানি জীবনের প্রতীক, ডাব বা নারকেল প্রজনন শক্তির প্রতীক।[২৯] ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সংস্কারবাদী আন্দোলন ও ইসলাম সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা স্বচ্ছ হবার কারণে এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা তথা প্রকৃতি পূজা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও গায়ে হলুদ ও বিয়ে অনুষ্ঠানে আনন্দ স্ফূর্তির জন্য বিভিন্ন গান বাজনারও আয়োজন হতো। এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান ছিল 'মারোয়া'।[৩০] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এ প্রথা শুরু হয়। বিয়ের দিন নববধূকে বরণ করে নেয়ার পর বর বধূ উভয়কেই মারোয়ার মধ্যে বসানো হতো এবং বিয়ে বাড়িতে আগত বরের বন্ধু বান্ধব ও মহিলারা মারোয়ার মধ্যে সমবেত হয়ে হৈ হুল্লোড় করে আনন্দ উপভোগ করত। কিছু কিছু মেয়ে মারোয়ার চারদিকে ঘুরে ঘুরে বিয়ের গীত গাইত যাকে জুলুয়া বলা হতো। কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে ইবলিশের কাজ বলে অভিহিত করে বলেন-

আর পত্র ধার বহু কাঁচা বাঁশ আনি / মারওয়া নির্মান্ত ইবলিশের বাসাখানি ॥
মারওয়ার বাত্রা নাহি শাস্ত্র মাঝার / মুসলমান কর্ম নহে কাফের সবার ॥[৩১]

তবে এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা আরাকানের সবমুসলিম পরিবারেই ছিলনা। কেননা আলিমগণ এটাকে শুধু বিদআতই নয় বরং মারোয়াকে ইবলিশের বাসা এবং এ কাজকে কাফিরের কাজ বলে উল্লেখ করতেন। তাই ধর্মভীরু পরিবারের বিয়েতে এ রকম আনুষ্ঠানিকতা না হবারই কথা। এছাড়াও কোন কোন বিয়ের বাড়িতে পাশা খেলা, রং ও ফট খেলা প্রভৃতির প্রচলন ছিল।[৩২] কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার এগুলোর তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন।

সন্তান জন্মকে কেন্দ্র করেও কিছু লৌকিক আচার মানা হতো। সন্তানের জন্মের পর মাওলানা ডেকে কানে আযান দেয়া, আকিকা দিয়ে নাম নির্ধারণ করা, খাতনা বা মুসলমানী দেয়া প্রভৃতি কর্মকাণ্ড ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হলেও কিছু লৌকিক আচার অনুষ্ঠানও ছিল। এক্ষেত্রে ভূতপ্রেত থেকে বাঁচার জন্য শিশুর গলায় তাবিজ দেয়া, জীন পরীর ভয়ে আতুর ঘরে কূপ বাতি, লৌহ শলাকা, জাল প্রভৃতি রাখা, এমনকি আতুর ঘরকে অপবিত্র মনে করে সন্তান প্রসবের পর রান্না ঘরের মাটির হাড়ি পাতিল, সানকি, রান্না করা ভাত তরকারী, পিষে রাখা মরিচ মশলা সবকিছু ফেলে দিত। মাথা কামানোর দিনে নাপিত ডেকে মা ও পরিবারের স্ত্রী লোকেরা নখ কেটে এবং পুরুষেরা চুল দাড়ি কেটে গোসল করে পবিত্র হতো।[৩৩]

মুসলমানদের মৃত্যুর পর শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী গোসল দেয়া, কাফন পরানো, নামাজ আদায় এবং কবর খুঁড়ে দাফন ও দোয়ার ব্যবস্থা থাকলেও কিছু লৌকিক আচারও পালন করা হতো যা সাধারণত বৌদ্ধ সংস্কৃতি থেকে এসেছে বলে অনুমান করা হয়। কোন মুসলমান নারী-পুরুষ রোগাক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় অনেকদিন যাবৎ কষ্ট পেলে সহসা তার মৃত্যুর জন্য 'ঘাট এড়ি'[৩৪] দেয়া হতো। সেইসাথে মাওলানাদের ডেকে দোয়া দরূদ পড়ে রোগীর সারা জীবনের কৃত পাপ থেকে মুক্তির জন্য তওবা করানো হতো। এছাড়া মুমূর্ষু রোগীকে শরবত পান করানো, মৃত্যুর পর লাশের চোখ ও মুখ বন্ধ করে দেয়া এবং উত্তর শিরা করে হাত পা সোজা করে শুয়ে রাখা হতো। এ বিষয়গুলো শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হলেও মারা যাবার চতুর্থ ও চল্লিশ দিনে দোয়া অনুষ্ঠানের জন্য যে আনুষ্ঠানিকতা করা হতো তা শরিয়াহভিত্তিক নয়।

৬.২.২ ধর্মীয় বিশ্বাস ও পূজা-পার্বণ

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানের মুসলমানগণ তাওহীদ ও শিরকের সম্পর্কে সচেতন ও স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী থাকলেও ষোড়শ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে নানাবিধ কুসংস্কারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বিশেষ করে 'ফাতেহা' দেবার নামে পীরপূজা এ সময় ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ সময় হিন্দুর সত্যনারায়ন মুসলমানদের সত্যপীর, হিন্দুর বনদেবী মুসলমানদের বনবিবি, হিন্দুর কালুরায় ও মুসলমানদের কালুগাজী, হিন্দুর দক্ষিণ রায় এবং মুসলমানদের বড় গাজী খাঁ, হিন্দুর ষষ্ঠী দেবী মুসলমানদের নিমুরিয়া পীর প্রভৃতি নামে পীর পূজা শুরু হয়।[৩৫] এ ছাড়াও সাহেবানী, 'মা' নানী' প্রভৃতি নামে ম্রোহংয়ের আশে পাশে পাথরের মূর্তি তৈরী করা হয়েছিল; যাতে মুসলমানগণ মানৎ আনতো, ফাতেহা পড়ত, বাতি জ্বালাতো, সোনার পানিতে মূর্তিকে গোসল করাতো এবং ডিম ও পয়সা দান করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করত।[৩৬] এসব পীর ও মূর্তির নামে বিভিন্ন কিছু দান বা বলি দেয়াকে 'ফাতেহা' বলা হতো। এরূপ ফাতেহা পাঠের সময় মুসলমান আলিমগণ ব্রাহ্মণদের মত গলায় 'তৃণ' (পৈতা) বাঁধত।[৩৭] সন্তান জন্মিলে 'নিমুরিয়া' নামক কোন এক কাল্পনিক পীরের নামে ফাতেহা পাঠের রীতিও প্রচলিত ছিল। এরূপ ফাতেহা দেয়ার সময় ফাতেহার খাদ্যদ্রব্য ঘরের ভিতরে রান্না করা হতো এবং ঘরের বাইরে নিতে দেয়া হতো না, এমনকি

বাইরের কোন ভিক্ষুককেও দেয়া হতোনা।[৩৮] এ নিমুরিয়া পীরের তাৎপর্য পরিষ্কার বুঝা যায় না, তাই অনুমান করা যায় যে, নিমুরিয়া একজন কাল্পনিক পীর।

৬.৩ মুসলমানদের মধ্যে অমুসলিম সংস্কৃতি প্রবেশের কারণ

ইসলাম গতানুগতিক কোন ধর্মের নাম নয়। ইসলাম একটি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন বিধান হবার কারণে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে একে ধারণ করতে হয়। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের পুত্র হলেই সে ব্রাহ্মণ হতে পারে, সে তার ধর্ম সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানুক আর না জানুক। এই ভিত্তিতে চৌধুরীর ঘরে জন্ম নিয়ে চৌধুরী, শুদ্রের ঘরে জন্ম নিয়ে শুদ্র হলেও মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে শুধুমাত্র জন্মগত কারণে মুসলমান হওয়া যায় না। লেখাপড়া না করে শুধু ডাক্তার হতে চাইলে রুগীর জন্য যেমন বিপদ ঘটবে তেমনি ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না করে মুসলমান থাকতে চাইলেও দ্বীনের মধ্যে অসংখ্য বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটবে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আরাকানে ঠিক এমনটিই ঘটেছিল।

প্রথমত, আরাকানসহ পাক-ভারত ও বাংলায় ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছিল মূলত সুফি সাধকদের মাধ্যমে। স্থানীয় জনগণ যতটা শরিয়তী ইসলামের শিক্ষা-সৌন্দর্য ও কল্যাণকামিতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিল তার চেয়ে বেশী এগিয়ে এসেছিল তাদের কারামতি ও নৈতিক চরিত্রের মহৎ গুণের কারণে। ফলে শরিয়তী ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যবোধ তাদের অন্তরে দৃঢ়মূল হতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, আরাকানে মসজিদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। মসজিদের দরস থেকে কুরআন হাদিস ও ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা যেত মাত্র। একজন মুমিন হিসেবে সমাজে ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য এ শিক্ষা যথেষ্ট হলেও ইসলামি জ্ঞানে বুৎপত্তি অর্জন করে সমাজে ইসলামি জ্ঞান বিতরণে যোগ্য উলামা তৈরী এবং নেতৃত্বদানের যোগ্যতা অর্জিত হতোনা। গৃহ শিক্ষক রেখে কিংবা দূরে কোন শিক্ষকের বাড়িতে থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং অনেক মুসলমানের সাধ ও সাধ্যের বাইরে। ফলে মুসলমানদের সংখ্যার তুলনায় কুরআন হাদিসের উপর বুৎপত্তি অর্জনের মত আলিম খুব কমই গড়ে উঠত। সময়ের ধারাবাহিকতায় আলিমের সংখ্যা কমতে কমতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে আরাকানে ইমাম আর মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করা ছাড়া বড় আলিম খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল।

তৃতীয়ত, সুদূর আরব দেশ থেকে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং ইসলামের গ্রন্থাবলী ছিল আরবি ভাষায়। ফারসি ভাষায় কিছু কিতাবপত্র অনুবাদ হলেও সেগুলোও ছিল মুসলমানদের নিকট আরবি ভাষার মত বিদেশী ভাষা হিসেবে দুর্বোধ্য। অন্যদিকে আরাকানে নির্দিষ্ট কোন লিখিত ভাষা ছিল না। তারা কিছুটা বর্মী ভাষা ও বাংলা ভাষার ব্যবহার জানতো। ইসলামের অনুসারী হবার কারণে আরবি ও ফারসি ভাষার চর্চা

থাকলেও তা গবেষণা করার মত দক্ষতা ছিলনা। আঞ্চলিক রোঁয়াই কিংবা আরাকানী ভাষায় কথাবার্তা বলা হলেও এ ভাষার কোন লিখিত রূপ না থাকায় এসব ভাষায় পবিত্র কুরআন হাদিসের তাফসীর যেমন রচিত হয়নি তেমনি ইসলামের নীতি আদর্শভিত্তিক তেমন কোন বইও রচিত হয়নি। সুতরাং স্থানীয় ব্যবহারিক ভাষায় কুরআন-হাদিস ও ইসলামি বই পত্র রচিত না হবার কারণে আরবি ও ফারসি ভাষার অদক্ষ লোকজন ইসলামি জ্ঞানের গভীরে গিয়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও চেতনাকে ধারণ করতে পারেনি। ফলে ইসলামের সাথে কিছু লৌকিক আচারও যুক্ত হয়েছিল।

চতুর্থত, চট্টগ্রাম অঞ্চলটি আরাকান অঞ্চলের অধীনস্ত হলেও বিভিন্ন সময় বাংলার অধীনেও শাসিত হয়েছিল। ফলে বাংলা-চট্টগ্রাম সম্পর্ক বাংলা-আরাকানের চেয়ে সুদৃঢ় ছিল। গৌড়ীয় মুসলিম শাসকদের ছোঁয়ায় চট্টগ্রামের মুসলমানগণ তুলনামূলক আরাকানী মুসলমানদের চেয়ে ইসলামি জ্ঞানে বেশী পরিপক্ক ছিল। চট্টগ্রামের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা থাকলেও আরবি ফারসি ভাষার পাশাপাশি তারা ভালভাবে বাংলা ভাষা বুঝতো এবং লিখতেও পারত। ষোড়শ শতাব্দী থেকে সৈয়দ সুলতান, আফজল আলী, শাহ ফরিদ খান, হাজী মুহম্মদ, শেখ পরান, শেখ চাঁদ, আলাওল, দৌলত কাজী, মরদন, মাগন ঠাকুর, আবদুল করিম খোন্দকার, নসরুল্লাহ খোন্দকারসহ বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক আরাকান অমাত্য সভার পৃষ্টপোষকতা পেয়ে কিংবা অনেকে নিজস্ব উদ্যোগে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা শুরু করেন। হিন্দু কবি কর্তৃক রচিত বিভিন্ন দেবদেবী নিয়ে ধর্মীয় বিধিবিধান সম্বলিত ধর্ম সাহিত্য রচিত হলেও মুসলমানগণ সে ধারা থেকে বেরিয়ে এসে প্রণয়োপখ্যান রচনা করেছিলেন। পাশাপাশি অমুসলিম সাহিত্যিকদের ধর্মীয় বিবরণের এনকাউন্টার হিসেবে অনেক সাহিত্যিকই মুসলিম মিথলজী ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের পুঁথি রচনা করেছিলেন। এসব পুঁথি সাহিত্যে হযরত আলী (রা.) সহ অনেক সাহাবির বীরত্ব প্রকাশ করে মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছিল। অত্যন্ত ভাল নিয়তে এ সব সাহিত্য রচিত হলেও ইসলামি জ্ঞানের স্বচ্ছ ধারণার অভাবে এক পর্যায়ে এ সব পুঁথিই ধর্মীয় গ্রন্থে রূপ নেয়। ফলে হিন্দুর সত্য নারায়ন মুসলমানদের সত্যপীর হিসেবে দেখা দেয়, হিন্দুর কালু রায় মুসলমানদের হলেন কালু গাজী। আরাকানের এ ধরনের ঘটনা ঠিক যেন মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' কিংবা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী লেখকদের জবাবে রচিত সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর দুর্গেস নন্দিনীর পরিবর্তে 'রায় নন্দীনী' প্রভৃতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে কাল্পনিক পুঁথি সাহিত্যের ভিড়ে আলাওল, সৈয়দ সুলতান ও নসরুল্লাহ খোন্দকারের মত কিছু ঐতিহ্যবাহী পরিবারের পণ্ডিত মুসলিম কবির তোহফা, নবীবংশ, শরিয়তনামা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কারণে এ ধরনের বিদআতসমূহ মানবসমাজে ধরা পড়েছিল এবং সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হলে ইসলামের সঠিক চিত্র ও পূর্ণাঙ্গ রূপ অনুধাবন করা যায় না। আরাকানী প্রশাসনে ইসলাম বাস্তবায়িত হলেও তা ছিল খণ্ডিত।

ইসলামের সকল বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরাকান কখনো ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। ফলে বাস্তব অর্থে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ধারণাও আরাকানী মুসলমানদের ছিলনা। তাছাড়া আরাকানী প্রশাসন ছিল বৌদ্ধ ও মুসলমান মিশ্রিত। ফলে একই প্রশাসনিক ছত্র ছায়ায় দুই ধর্মের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিনিময় হওয়াটাই বেশী যুক্তিযুক্ত ছিল। সেইসাথে মুসলমানগণ দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে বাংলার সাথে সম্পর্কের যে নজির স্থাপন করেছে তাতে পূর্ণাঙ্গরূপে আরাকানী হতে হলে সে স্থানীয় সংস্কৃতির কিছু বিষয় নিজেদের আমলে আসাটাই স্বাভাবিক ছিল।

ষষ্ঠত, আরাকান সব সময় ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত থাকার নজির পাওয়া যায়। ইসলাম প্রচার ও প্রসার হবার পূর্ব পর্যন্ত আরাকানী প্রশাসন পুরোপুরি ভারত প্রভাবিতই ছিল। এমনকি ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে আরাকানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের বিকাশ শুরু হলেও গৌড়ীয় প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতের ধর্মীয় অস্থিরতা বিশেষত সম্রাট আকবরের ধর্মনীতি যে আরাকানীদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলেনি তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সম্রাট শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের সময়ের বর্গীদের অশুভ তৎপরতা, সুবেদারদের স্বেচ্ছাচারিতা, অমাত্যবর্গের স্বৈরাচারনীতি অবশেষে বৃটিশ বেনিয়াদের দৌরাত্ম্য নাটক পলাশীর মাধ্যমে যেমন ভারত ও বাংলায় দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশ তৈরী হয় তেমনি ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা শাহ সুজার বিফল অভ্যুত্থান ও হত্যা যজ্ঞের পর আরাকানেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নেমে আসে। এ সময় মুসলমানদের পক্ষে ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করার অনুকূল পরিবেশ না থাকায় প্রায় একশত বছরের মধ্যেই বাংলার মত আরাকানেও পীর পূজা, করব পূজা ও ইসলামের নামে বিভিন্ন কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আনুষ্ঠানিকতা পালন করা শুরু হয়। কবি আলাওল ও নসরুল্লাহ্ খোন্দকারের মত কবি সাহিত্যিকগণ বুদ্ধিজীবী মহলে এসব অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডকে লিখনীর মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন এবং বাংলার হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তীতুমীরের মত আরাকানেও মুন্সী আব্দুন নবী, শাহ মোনায়েম, হায়দার আলী শাহ প্রমুখ মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন থেকে নানাবিধ বিকৃতি ও অনৈসলামিক প্রথা রহিত করে সত্যিকারের ইসলামি মূল্যবোধে ফিরে আনার চেষ্টা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান মিয়ানমার প্রশাসন আরাকানে মুসলমানদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও একথা সত্য যে আরাকানে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত না হলেও ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই অর্থাৎ দশম শতাব্দীর মধ্যেই সেখানে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক স্তরে ইসলামের ব্যাপ্তি ঘটেছিল। অতঃপর ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহের মাধ্যমে আরাকানী প্রশাসনে ইসলামের বাস্তবায়ন শুরু হয়। ফলে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় এক হাজার বছর ধরে আরাকানী হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে মুসলিম নামক একটি সংস্কৃতি নিজস্ব বলয়ে তৈরী হয়েছিল : এ সংস্কৃতি শুধু স্বতন্ত্রবোধই টিকে রাখেনি বরং আরাকানী সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে তাদেরকে

পরিশীলিত করার গৌরবও অর্জন করেছিল। দেশপ্রেম, আঞ্চলিকতা এবং স্বাভাবিক পরিবেশের গতিপ্রবাহের নিরিখে মুসলমানরাও আরাকানী সংস্কৃতি গ্রহণ করে মগ বা বৌদ্ধ-মুসলমান একটি ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন জাতিতে পরিণত করেছিল।[৩৯] সেইসাথে উভয় ধর্মের উদারতা ও হৃদ্যতার মাধ্যমে সেখানে ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন একটি বৌদ্ধ-মুসলিম আরাকানী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জি

---

১ আলী আহমেদ, "চট্টগ্রামের সমাজ জীবনে আরাকানী সংস্কৃতির প্রভাব" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* কার্তিক-পৌষ, ১৩৯৯, পৃ. ২।

২ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত* পৃ. ১১৩।

৩ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৮; আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত* পৃ. ১৩৫।

৪ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত* পৃ. ১৩৫।

৫ *তদেব।* মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৮-৫৯।

৬ ডক্টর মযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, *ইসলাম আওর মাযাহিবে আলম, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২০৫।

৭ Devid Massy & Bhera, *Marriage East and West* (New York: Dalphin Book Daubday & Co. 1960), p. 81.

৮ *The Encyclopedia of Britanica,* Vol. 28 (England: Cambridge University Press, 1911), p. 782.

৯ অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, *চর্যাপদ* (কোলকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ. ৩৫।

১০ *আল কুরআন সূরা আল মুমিনুন,* ৩৫ নং আয়াত।

১১ *আল কুরআন সূরা আল মায়িদা,* ৫ নং আয়াত।

১২ আল্লামা ইমাম নববী (রহ.) *রিয়াদুস সালেহীন,* ৪র্থ খণ্ড, মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিয়া কুরআন মহল, ২০০১), পৃ. ২৮।

১৩ *তদেব,* পৃ. ৮৬।

১৪ *তদেব,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৫।

১৫ ড. অমৃতলাল বালা, "রোসাঙ্গে ইসলামি সংস্কৃতি" *আরাকানের মুসলমান: ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৬৭।

১৬ আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৭), পৃ. ১৬০-৬১।

১৭ *তদেব,* ৩২০।

১৮ ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *ইসলামে পোষাক প্রাথমিক সূত্র ও শর্তসমূহ,* (ঢাকা: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০৩), পৃ. ১।

১৯ *আল কুরআন সূরা আল আ'রাফ,* ২৬ নং আয়াত।

২০ আলী আহমেদ, "চট্টগ্রামের সমাজ জীবনে আরাকানী সংস্কৃতির প্রভাব" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* কার্তিক-পৌষ, ১৩৯৯, পৃ. ২।

২১ Ali Ahmed. The Muslims of Chittagong, 1858-1931: A Socio-Cultural Study," Unpublished Ph.D. thesis, University of Chittagong, 1987, p. 87.

২২ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৫৫।

২৩ *তদেব,* পৃ. ৫৮।

২৪ আলাউল বিরচিত *তোহফা,* আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ১১৪।

২৫ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, G.E. Harvey, "The Fate of Shah Shuja 1661" *JBRS*, Vol. XII, August 1922; Muhammad Siddiq Khan, The Tragedy of Mrauk-u (1660-1666) *JASP*, Vol. XI, No. 2, August, 1966; মুহাম্মদ সিদ্দিক খান 'শাহ্ সুজার জীবন সন্ধ্যা', *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী*, পৃ. ২৮৩-৩৩৬; সুলতান আহমদ ভূঁইয়া, "শাহ্ সুজার জীবন নাট্যের শেষ অংক" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক পৌষ, ১৩৭১, পৃ. ৬৩-৭৭।

২৬ আলাউল বিরচিত *সিকান্দরনামা*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৭।

২৭ শরিয়ত বর্হিভূত কোন বিষয়কে সওয়াবের নিয়তে পালন করাই বিদআত।

২৮ শুভ কাজের মঙ্গল কামনায় বাড়ির প্রবেশ পথের দুপার্শ্বে দুটি কলাগাছ পুতে তার গোড়ায় দুটি পানিভর্তি কলসী স্থাপন করে মুখে দুটি আমের পাতা রেখে তার উপর দুটি ডাব বা নারকেল দিয়ে রাখাকে মঙ্গলঘট বলে। দ্রষ্টব্যঃ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৭।

২৯ *তদেব।*

৩০ বিয়ে বাড়ি উঠানে আট হাত দৈর্ঘ ও প্রস্থের একটি স্থানের চারকোণায় চারটি কাঁচা বাঁশের খুঁটি পুতে তার ফাঁকে চারটি কলাগাছ পোতা হতো। অতঃপর খুঁটি ও কলাগাছের চারদিকে সাত রঙের সুতো পেচিয়ে বেঁধে দেয়া হতো। এর উপর দিকে একখানি চাঁদোয়া টাঙিয়ে একটি ঘরের কামরার মত বানানো হতো। উক্ত কামরার এক কোণায় আমের পাতা শোভিত পানি ভর্তি মঙ্গল কলস ও বরণকুলা স্থাপন করা হতো। অতঃপর সেখানে নবদম্পতির বসার জন্য শীতল পাটির বিছানা পেতে দেয়া হতো, এটাকেই মারোয়া বলে। দ্রষ্টব্যঃ আলাউল বিরচিত *তোহফা*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৫।

৩১ নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়তনামা*, আবদুল করিম সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০০।

৩২ *তদেব*, পৃ. ১০০-১০৩।

৩৩ *তদেব*, পৃ. ৬১; ৮৪।

৩৪ ঘাট এড়ি দেয়া হলো, নদীর নৌকা ঘাটের ইজারাদারকে তার দাবী মত পারিশ্রমিকের টাকা আদায় করে দিয়ে একদিন বা অর্ধদিনের জন্যে সে ঘাটের যাত্রীদের বিনা মাসুলে পারাপারের বন্দোবস্ত করে দেয়া, আরাকানে বিশেষত চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, এরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তির নামে 'ঘাট এড়ি' দিলে ঘাটের কড়ি অথবা যে কোন প্রকার অতীত ঋণ মুক্ত হয়ে সহসা তার মৃত্যু হয়। দ্রষ্টব্যঃ আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২২।

৩৫ আলাউল বিরচিত *তোহফা*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১।

৩৬ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫।

৩৭ নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়তনামা*, আবদুল করিম সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।

৩৮ *তদেব*, পৃ. ৪৬, ৮৮।

৩৯ একবিংশ শতাব্দীতে এসে সে ইতিহাসকে অস্বীকার করে মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা মুসলিম জাতিসত্তার বিনাশ সাধনের প্রচেষ্টা মিয়ানমার প্রশাসনের একগুঁয়েমি নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

অধ্যায় ৭
আরাকানী মুসলিম ইতিহাসের সার্বিক মূল্যায়ন

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়েই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।[১] জীবন-জীবিকার সন্ধানে ছুটে চলার সময় আল্লাহর অনুসৃত পন্থার অনুসরণের মাধ্যমেই এ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ রয়েছে। তাই সৃষ্টির আদি মানব হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ পন্থায় এ দায়িত্ব পালন শুরু হলেও সময়ের ব্যবধানে যখন মানুষ তার দায়িত্ববোধ থেকে বিচ্যুত হতো তখনি নতুনভাবে পথ নির্দেশ দেবার জন্যই নবি রাসুলগণকে 'ওহী'সহ প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেকে আবার নিজস্ব ধারণা থেকেই স্বকীয় বিশ্বাসের জন্ম দিয়ে নিজের মত করে ধর্মীয় পথ রচনা করে নিয়েছে। সৃষ্টির আদি থেকে অদ্যাবধি তাই অনেক রকম মত ও পথের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর যে ভূখণ্ড যত প্রাচীন সে ভূখণ্ডের ধর্মীয় ইতিহাসও তাই বেশী বৈচিত্রময়। আরাকান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যকার একটি অন্যতম প্রাচীন অঞ্চল[২] হিসেবে এখানকার মানব বসতির ইতিহাস যেমন পুরাতন তেমনি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বৈচিত্রময়। জড়বাদী বিশ্বাস থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্ম, অতঃপর গৌতম বুদ্ধের অনুসরণে বৌদ্ধধর্ম এবং মহানবি (স.) এর অনুসৃত পথ ধরে ইসলাম সেখানকার নতুন ধর্ম বিশ্বাসের সূচনা করে। এছাড়া সেখানে জড়বাদী ও নাস্তিক্যবাদীতাও লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামের মূলভিত্তি ও প্রধান আদর্শ হচ্ছে তাওহিদ। প্রতীকপূজা, অবতারবাদ এবং পৌত্তলিকতার পরিবর্তে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মিশন। আরবের পৌত্তলিকদের মত এ অঞ্চলেও তেত্রিশ কোটি দেবতার বিশ্বাসে বিভিন্ন ধরনের পূজা প্রচলিত ছিল।[৩] সেইসাথে গৌতম বুদ্ধের মানব ধর্মের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকমের পূজা অর্চনাও হতো। বহু দেবতার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত করে মানবমণ্ডলীকে আল্লাহর একাত্ববাদের দিকে আহ্বানের জন্য মক্কায় ইসলামের কার্যক্রম শুরুর সময়ই এমনকি মহানবি (স.) এর জীবদ্দশাতেই এ অঞ্চলেও ইসলামের আহ্বান পৌছার তথ্য পাওয়া যায়।[৪] মহানবি (স.) এর সাহাবি আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওয়াহাব (রা.)সহ অনেক ইসলাম প্রচারক, বণিক, নাবিক চট্টগ্রাম ও আরাকানে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা পালন করেন।[৫] এভাবে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই তৎকালীন আরাকানের বন্দর নগরীসমূহে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। অষ্টম শতাব্দীর সূচনায় জাহাজ ডুবি থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত আরবীয় বণিকসহ নবম শতাব্দীর মধ্যে ক্ষুদ্র সালতানাত প্রতিষ্ঠার কথাও জানা যায়। যদিও এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে তদুপরি রুহমী রাজ্যের বিবরণীর মাধ্যমে আরাকান অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সফলতার প্রমাণ মেলে।

চট্টগ্রাম-আরাকানসহ দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামি আদর্শের সম্প্রসারণে আউলিয়া কিরাম ও সুফি সাধকদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের অত্যাচার-নির্যাতন, হিন্দুদের সামাজিক বর্ণপ্রথা ও ধর্মের নামে শোষণের কারণে সাধারণ ও নিম্নশ্রেণির মানুষ মুক্তির পথ অনুসন্ধান করছিল। এ সময় আউলিয়া কিরাম ও সুফি সাধকগণ অনুপম উন্নতমানের নৈতিক চরিত্র, আর্তমানবতার প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, সর্বোপরি ইসলামের সুমহান উদারতা ও কল্যাণকামী অনুশাসন উপস্থাপনের মাধ্যমে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে দীন প্রচার করলেও বাধার মোকাবেলায় তারা সামরিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। আপোষকামিতার পরিবর্তে অনেক সময় তাদের অস্ত্র ধারণ করার কথাও জানা যায়।[৬] আকিয়াবের 'বদর মোকাম' অদ্যাবধি পীর বদরসহ আউলিয়া কিরাম ও সুফি-সাধকদের ইসলাম প্রচারের স্মৃতি বহন করে চলছে। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক লাখনৌতি বিজয়ের পর আরাকানে ইসলাম প্রচার কার্যক্রম তরান্বিত হয়। বিশেষ করে ইরান ও আফগানিস্তানের ঘোর প্রদেশের রোহার অঞ্চলের মুসলিম কাফেলা এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে আসেন।[৭] তাদের প্রচেষ্টায় আরাকানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পায়। সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত আরাকানে শিয়া প্রভাবিত ইরানী মুসলমান কর্তৃক ইসলাম প্রচারের ফল বলে ধারণা করা যায়। তাছাড়া অদ্যাবধি আরাকানে কিছু শিয়া মুসলিম পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনসহ প্রত্যেক অংগনেই ইসলামি অনুশাসনের বিধান রয়েছে। তাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হলে পূর্ণাঙ্গ রূপে জীবনের প্রত্যেক স্তরকে ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত করা সম্ভব হয়না।[৮] ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানে ইসলামের ধর্মীয় রীতিনীতি ও সামাজিক বিধান ছাড়া ইসলামের আর কোন বিধান মান্য করা সম্ভব হয়নি। এ সময় পর্যন্ত মুসলমানগণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জড়িত বিধানসমূহ পালন করার সুযোগ তো পায়ইনি বরং ব্যক্তি সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে ইসলাম মেনে চলা ও তার প্রসার ঘটানোর জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৌলিক কোন সহযোগিতাও পায়নি। ফলে এ সময় ইসলামের অনুশাসনের শুধুমাত্র ঈমান, নামাজ, রোজা, যাকাত, পর্দা মেনে চলা প্রভৃতি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম ছিল। তবে নামাজের জন্য যেমন পর্যাপ্ত মসজিদ ছিলনা, তেমনি যাকাত আদায় নিজেদের উদ্যোগেই করতে হতো এবং হজ্জব্রত পালনও করতে হতো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরাকানে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সাথে 'প্রভাব' শব্দটিও যুক্ত হবার সুযোগ পায়। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সহযোগিতায় বাংলায় আশ্রিত আরাকানরাজ নরমিখলা স্বীয় পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হলে আরাকানী প্রশাসনে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। এ সময় তিনি সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম প্রশাসক ও বিচারক নিয়োগ দিয়ে ইসলামকে প্রশাসনিক শক্তিসম্পন্ন হিসেবে উপস্থাপন করেন। ফলে

পূর্ণাঙ্গরূপে না হলেও অন্তত রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় মৌলিক কিছু ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া মুসলমানগণ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অনুকূলে যেমন স্বাচ্ছন্দ্যে ইসলামের বিধিবিধানসমূহ পালন করার সুযোগ পায় তেমনি অমুসলিমদের মধ্যেও এর উন্নত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধানসমূহ মেনে চলার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

আরাকানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, (ক) ইসলামের প্রচার ও পরিচিতিকাল, (খ) ইসলামের প্রচার প্রসার তথা সামাজিক সম্প্রসারণকাল (গ) প্রভাব বিস্তার। ইসলামের আবির্ভাবকাল থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাথমিক এবং দশম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়; যা ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। এ দু'পর্বে ইসলাম নামক বিধানের পরিচিতি, নির্যাতিত হিন্দু-বৌদ্ধগণ কর্তৃক ইসলাম গ্রহণ এবং অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম ও এর ধারক-বাহক তথা মুসলমানদের পোষাক-পরিচ্ছদ বিশেষত পর্দা পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস বা রান্না পদ্ধতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে অমুসলিমদের মধ্যে আগ্রহ তৈরী হয়। তৃতীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ইসলামি বিধিবিধানসমূহ কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৯] ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরাকানে যে সব ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা নিম্নরূপ:

প্রথমত, ১৪০৬ থেকে ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৪ বছর আরাকানের রাজা নরমিখলা নিজরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলার মুসলিম প্রশাসনের আশ্রয়ে থাকার কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশ্বাস এবং নৈতিকতা সম্পর্কে বিশাল অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পিতৃরাজ্য আরাকান পুনরুদ্ধার করে সে অভিজ্ঞতাকে বাস্তবায়নের প্রয়াস চালান। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের সহযোগিতা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। ফলে তিনি অনেকটা মুসলিম সাহায্য নির্ভর হয়ে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তিনি আরাকানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই বাংলার অনুকরণে মুদ্রা চালু করেন যার এক পৃষ্টে কালিমা ও অন্য পৃষ্টে ফারসি অক্ষরে বৌদ্ধ নামের পাশাপাশি মুসলিম নাম অংকিত করেন। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে এ ধারা শুরু হয়ে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২১৫ বছর অব্যাহত ছিল। যদিও শাসকগণ মনে-প্রাণে মুসলিম হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করেননি তদুপরি ইসলামের অনেক বিধান প্রশাসনের ক্ষেত্রে চালু করেছিলেন। বিশেষ করে দরবারের আদব কায়দা, রাজদরবারকে আল্লাহর প্রতিনিধির দরবার মনে করে অশ্লীলতা, অবৈধ নাচগান, মদ, নারী ইত্যাদিকে অবৈধ জ্ঞান করে দরবারকে পূতঃপবিত্র রাখার প্রয়াস অব্যাহত রাখতেন। প্রশাসনের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমরমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীসহ বিভিন্ন পদে মুসলমানদেরকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। সম্ভবত মুসলিম অমাত্যদের সম্মান ও ইসলামের সুমহান আদর্শকে লালন করেই তারা দরবারকে অশ্লীলতা মুক্ত রাখতেন। রাজদরবারে অশ্লীলতার পরিবর্তে জ্ঞানগর্বপূর্ণ আলোচনা, সঙ্গীত চর্চা, এমনকি আলিমদের নিয়ে শরিয়তের বিভিন্ন বিধিবিধানও আলোচনা করা হতো।[১০] দরবারের এ ধরনের কর্মকাণ্ড অনুধাবন করেই কোন কোন মুসলিম লেখক সোলায়মান শাহ প্রতিষ্ঠিত ম্রাউক-উ-রাজবংশকে 'মুসলিম সালতানাত' হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের সম্প্রসারণে প্রশাসনিকভাবে সহযোগিতা করতেন মুসলিম অমাত্যগণ। তারা ইসলাম প্রচার কাজে আলিমগণকে যেমন সহযোগিতা করতেন তেমনি ইসলামি জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও পৃষ্টপোষকতা করতেন। বদর মোকামকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচার ও জ্ঞানার্জন চালু থাকলেও 'সন্ধিখান মসজিদ' ছিল ইসলাম প্রচার ও জ্ঞানার্জনের প্রধান কেন্দ্র। ওলামায়ে কিরাম এখানে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমকে তরান্বিত করে বিভিন্ন অঞ্চলে তা ছড়িয়ে দিতেন। বিশেষকরে মুসলিম অমাত্যগণ যেখানেই মসজিদ স্থাপন করতেন সেখানেই ইসলামি শিক্ষার সুব্যবস্থা করতেন। দেশী বিদেশী কোন পার্থক্য নির্ণয় না করে তারা জ্ঞান চর্চার কাজে পৃষ্টপোষকতা করতেন।[১১] এমনকি ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে আরাকানে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছে তাও আরাকানী প্রশাসনে কর্তব্যরত মুসলিম অমাত্যগণের সরাসরি পৃষ্টপোষকতার ফসল। কবি দৌলত কাজী, আলাওল, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, নসরুল্লাহ খোন্দকারসহ মধ্যযুগের প্রধান কবিগণ আরাকান রাজসভার অমাত্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্টপোষকতার ফলেই বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

তৃতীয়ত, আরাকানে সমাজবদ্ধ জীবনের ইতিহাস অনেক প্রাচীন হলেও ইসলাম প্রচারের পূর্বে সেখানে সামাজিক বৈষম্য ও অসামাজিক রীতিনীতি ছিল খুব বেশী। বর্ণ বৈষম্যের কারণে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রদেরকে ব্রাহ্মণগণ পর্যায়ক্রমে নিম্নশ্রেণি মনে করে ঘৃণা করলেও নিচু শ্রেণির নারীদেরকে অবৈধভাবে ভোগ করা কোন জাতভেদগত অপরাধ ছিল না। তাদেরকে সমাজের উঁচু শ্রেণির ব্যক্তিরা পতিতা হিসেবে ব্যবহার করত।[১২] কিন্তু ইসলাম প্রচারিত হবার ফলে মুসলিম সমাজে যেমন বর্ণ বৈষম্য প্রথার বিলোপ সাধিত হয় তেমনি মুসলিম সমাজে পতিতাবৃত্তি হারাম বলে এ ধরনের ঘৃণ্য আচরণও বিদূরিত হয়। মুসলমান মেয়েরা অন্য পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা তো দূরের কথা তারা নিজকে পর্দার আড়ালে গোপন করে রাখত। মাথার কাপড় পড়ে গেলে কিংবা অন্য পুরুষ চুল দেখলে তারা জাহান্নামে যাওয়ার মত ভয়াবহ পাপ মনে করত।[১৩] তবে থাম্ভইক্যা, জেরবাদীসহ কিছু কিছু মুসলিম পরিবার স্থানীয় অমুসলিম আরাকানীদের সাথে ব্যাপকভাবে মিশে থাকার কারণে মুসলিম সমাজের এ ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি।

চতুর্থত, ধর্মীয় দিক থেকে আরাকানের মুসলমানগণ বেশীর ভাগই সুন্নী ও হানাফী মাজহাবের অনুসারী। কিছু পরিবার শিয়া প্রভাবিত হলেও আরাকানের অমাত্য শ্রেণি থেকে শুরু করে প্রভাবশালী ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ অধিকাংশই সুন্নী ও হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন।[১৪] নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি মৌলিক ইবাদতের ব্যাপারে তারা যত্নবান হলেও ফাতেহার নামে পীরতন্ত্র ও পীরপূজা, গুরুত্বহীন আনুষ্ঠানিকতা যেমন শবে বরাত পালন, মিলাদ, চল্লিশা, বিয়েতে মঙ্গল ঘট বসানোসহ বিভিন্ন সামাজিক পার্বণিক উৎসবের মাধ্যমে কিছুটা বিদআতের চর্চা শুরু করেছিলেন। অবশ্য অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা সংস্কারবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে খানিকটা লাঘব হয়েছিল। এসব

আনুষ্ঠানিকতা একটু রঙ্গরস মিশ্রিত হবার কারণে ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্যের ছত্র ছায়ায় বেশী দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছিল।

পঞ্চমত, ম্রাউক উ রাজবংশের (১৪৩০-১৭৮৫ খ্রি.) তিনশত পঞ্চান্ন বছরের ইতিহাসের প্রথম দুইশত পনের বছর (১৪৩০-১৬৪৫ খ্রি.) পর্যন্ত শাসকগণ মুসলমানি নাম গ্রহণ অব্যাহত রেখেছিলেন। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আরাকানরাজ সোলায়মান শাহ থেকে নরপদিগ্যীর (১৬৩৮-১৬৪৫ খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ থিরিথু ধম্মা ওরফে সেলিম শাহ দ্বিতীয় পর্যন্ত প্রায় সকলেই ইসলামের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্ত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নাম গ্রহণ, দরবারী আনুষ্ঠানিকতা, বিচারব্যবস্থায় কাজীকে স্বাধীনভাবে বিচারের ক্ষমতা দেয়া, রাজমহলে জেনানা মহল ও বিচারালয়ের জন্য জল্লাদ নিয়োগসহ সবকিছুই পুরোপুরি বাংলার অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল। আরাকানরাজ সেলিম শাহ দ্বিতীয় এর শাসনামলে কবি দৌলত কাজী কর্তৃক 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' রচিত হবার ফলে সমসাময়িক কালের অমাত্য আশরাফ খান এবং সে সময়ে তাদের ইসলাম বিস্তারে বাস্তবায়িত সুকীর্তিসমূহ কিঞ্চিত জানা যায়। অথচ ইতোপূর্বের প্রায় দু'শো বছরের ইতিহাস মুদ্রা ও স্থাপত্য নিদর্শন ছাড়া নির্ণয় করার সমসাময়িক আর কোন দলীল দস্তাবেজ নেই। নরমিখলা ওরফে সোলায়মান শাহের সময়কালের (১৪৩০-১৪৩৪ খ্রি.) আদু মায়ু ওরফে আবদুল মা'নী নামক জনৈক মুসলিম কবির সন্ধান মিললেও তার রচিত 'প্রখাইহাংমিং থেমি ঈহবং' অর্থাৎ আরাকান রাজকুমারীর প্রশংসা' শীর্ষক কাব্য গ্রন্থটির নাম ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।[১৫] সমসাময়িক রচনাবলী না পাওয়ায় এ সময়ের 'আরাকানে ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া' সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন সম্ভব হয়নি। তবে সমসাময়িক মুদ্রা ও আধুনিক লেখকগণ কর্তৃক তার বিশ্লেষণ, সমসাময়িক বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ প্রভৃতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যক তথ্য ও ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত কম হলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, ম্রাউক-উ-রাজবংশের ৩৫৫ বছরের ইতিহাসে উক্ত দু'শো বছরই ছিল আরাকানে ইসলামের প্রভাব বিস্তারের সুবর্ণ সময়।

ষষ্টত, ম্রাউক-উ-রাজবংশের শেষের দিকে বিশেষত ১৭১০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে মুসলমানদের তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিলনা। এ সময় ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে খাতেয়া (Katya) নামক একজন মুসলমান আরাকানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তিনি টিকতে পারেননি।[১৬] রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে বার্মার রাজা বোদাপায়া ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে আরাকান দখল করেন। সে থেকে অদ্যাবধি এটি মিয়ানমারে একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে রয়েছে। ম্রাউক-উ-শাসনামলের ৩৫৫ বছরের ইতিহাসেই শুধু নয় বরং আরাকানে ইসলামের প্রচার প্রসার ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে মৌলিক ও প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল 'রোহিঙ্গা' নামে খ্যাত মুসলমানগণ।[১৭]

সর্বোপরি, আরাকান রাজ্যটি বর্তমানে 'রাখাইন স্টেট' নামে মিয়ানমারের একটি অঙ্গরাজ্য হলেও এর রয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকার ঐতিহ্য। এর মধ্যে শক্তিশালী ম্রাউক-উ-শাসনের ৩৫৫ বছরের ইতিহাস দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাজ্যসমূহের মতই উজ্জ্বল। বাংলার মুসলমানদের মত আরাকানী মুসলমানগণও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। মুসলমানদের উন্নত শিক্ষা সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সামাজিক বিধিবিধান স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ তথা অমুসলিমদেরকে পরিশীলিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে উন্নত সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল।[১৮] শুধু মুসলমান-মুসলমানেই নয় বরং মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ সর্বোপরি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আলাদা শিল্প-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লালনকারী হলেও সকলেই রাজ্যের উন্নয়নে ঐক্যের পরিবেশ বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। উভয় সম্প্রদায় হাজার বছর ধরে একই রাজ্যে পাশাপাশি বসবাস করার মিতালী ইতিহাস ও মনস্তাত্ত্বিক বন্ধন সম্পর্কে না জানার কারণেই আরাকানের মুসলমানগণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অথচ মুসলমানগণই ছিলেন আরাকানে উন্নতমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনির্মাণের প্রধান কারিগর।

পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জি

---

১ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন *সুরাহ বাক্বারাহ* - ৩০ আয়াত; *আনয়াম* - ১৬৬; *রুম* - ৩০, *ফাতির* - ৩৯, *সা'দ* -২৬ *যারিয়াহ* - ৫৬ আয়াত।

২ খ্রিস্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে আরাকানের রাজ্য শাসন ও রাজবংশসমূহের ইতিহাসও পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩ বিস্তারিত দেখুন এ কে এম মহিউদ্দিন, *চট্টগ্রামে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃ. ৫-৯।

৪ বিস্তারিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫ হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) সহ ৬ জন সাহাবি ও ১২ জন তাবেয়ী কর্তৃক এ অঞ্চলসমূহে ইসলাম প্রচারের তথ্য পাওয়া যায়। বিস্তারিত দেখুন, এ কে এম মহিউদ্দিন, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫-৯।

৬ Ishtiaq Husain Qureshi, *The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent (610-1947)*, (Delhi: Renaissance Publishing House, 1985), p. 77.

৭ Jahiruddin Ahmed and Nasiruddin Ahmed, *The Maghs and the Muslims in Arakan*, op. cit., p. 5.

৮ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ১৪-২৬।

৯ অমৃতলাল বালা, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭।

১০ দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৩।

১১ আলাওল, *পদ্মাবতী*, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮।

১২ চর্যাপদের ভাষায়:
নগর বাহিরে রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িয়া
ছই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িয়া॥
[দ্রষ্টব্য: অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, *চর্যাপদ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

১৩ নসরুল্লাহ খোন্দকার, *শরীয়তনামা*, আবদুল করিম সম্পাদিত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩।

১৪ দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।

১৫ মাহবুব উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল*, *পূর্বোক্ত* পৃ. ৫৮।

১৬ A.P. Phayre, *History of Burma*, op. cit. pp. 304; G.E. Harvey, *History of Burma*, opcit., p. 372. [উল্লেখ্য, লেখকদ্বয় 'খাতেয়াকে' মুসলিম হবার কারণে বিদেশী ক্ষমতা জবরদখলকারী (usurping foreigner) বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি মুসলমান ছিলেন। দেখুন আব্দুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭].

১৭ আরাকানের পরাধীনতার পর অদ্যাবধি বার্মার শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক তারাই বেশী নির্যাতিত ও নিগৃহীত। বর্তমানে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা এমনও ঘোষণা দিয়ে থাকে যে, 'আরাকানে কোন মুসলমান জনবসতি ছিলনা' এবং তাদের পাঠ্যপুস্তকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের কোন ইতিহাস-ঐতিহ্যও রাখা হয়নি। এছাড়া ১৯৮২ সালে প্রণীত 'Burma (Myanmar) Cilizenship Law' এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে প্রকারান্তরে 'বিদেশী' চিহ্নিত করে অভিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। National Registration Card (NRC) এর মাধ্যমে নাগরিকদের বাছাই করে বিভিন্ন অজুহাতে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে এবং অদ্যাবধি বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে এবং শিবিরের বাইরে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা নিজস্ব আয়োজনে এ দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে অমানবিক জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশ এ সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেও অদ্যাবধি এর কোন সুষ্ঠ সমাধান হয়নি।

[দ্র:বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মো. মাহফুজুর রহমান "রোহিঙ্গা সমস্যঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী, এম. ফিল. থিসিস, *পূর্বোক্ত* ; *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০; Abdur Razzaq & Mahfuzul Haque, A Tale of Refugees Rohingyas in Bangladesh (Dhaka: The Centre for Hujman Rights, 1995), pp. 28-31.]

১৮ কিন্তু আজ আরাকানের সে ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং মুসলমানদের সে সভ্যতা-সংস্কৃতি ইতিহাসের পাতা থেকেও মুছে যাচ্ছে। আরাকান এখন 'রাখাইন স্টেট' নামে একটি 'মগের মুলক', মুসলমানগণ সেখানকার নির্যাতিত ও নিগৃহীত নিম্নশ্রেণির একটি অভিবাসী বা পরবাসী জনগোষ্ঠী মাত্র।

পরিশিষ্ট ১

CHRONOLOGICAL TABLE OF THE KINGS OF ARAKAN

Dhy-nyga-wa-ti Dynasty.

No.	Name of Sovereign	Date of Accession		Region. Yrs. Ms.		Relationship of each Succeeding Sovereign.
		B.C	Ar. Era.	Yrs.	Ms.	
1.	Ma-ra-yo	2666	...	62	0	
2.	Ma-ra-dzi	...	...	32	0	Son.
3.	Ma-ra-on-leng	...	...	53	0	"
4.	Ma-ra-rway-leng	...	...	48	0	"
5.	Ma-ra-benth	...	...	55	0	"
6.	Ma-ra-dzi	...	...	33	0	"
7.	Ma-ra-keng	...	...	32	0	"
8.	Nga-tshap-o	...	...	21	0	An Usurper.
9.	Dwa-ra-tsan-dra	...	...	40	0	Son of Ma-ra-keng.
10.	Tho-la-tsan-dra	...	...	33	0	Son.
11.	Tsau-da-thu-ri-ya-tsan-dra	...	...	37	0	"
12.	Ka-la-tsan-dra	...	...	40	0	"
13.	T-tsan-dra	...		31	0	Son.
14.	Ma-dhu-tha-tsan-dra	...	...	20	0	"
15.	Dze-ya-tsan-dra	...	...	40	0	"
16.	Gun-na-tsan-dra	...	...	26	0	"
17.	Gun-na-tsan dra Three nobles reigned for seven days, three months, and eight months successively	...	...	12	0	"
18.	Kan-Ra-dza-gyi	...	...	41	11	Usurpers.
19.	Kan-Ra-dza-NGAI	...	...	36	0	Grandson of Gun-na-tsan-dra.
20.	In-da-thu-ri-ya	...	...	35	0	Brother.
21.	A-thu-rin-da-thu-ri-ya	...	...	30	0	Son.
22.	Tha-ra-me-ta	...	...	28	0	"
23.	Thu-ri-ya	...	...	31	0	"

24.	Meng-thi	...	...	22	0	"
25.	Meng-ba	...	...	22	0	"
26.	Tsi-oung	...	...	28	0	"
27.	Ta-taing-theng	...	...	31	0	"
28.	Kyau-khoung-weng	...	...	31	0	Brother.
29.	Thu-ri-ya-nan-da-mit	...	...	21	0	Son.
30.	A-thu-rin-da-bha-ya	...	...	31	0	"
31.	Let-ya-tsi-thu-kyi	...	...	32	0	"
32.	Thi-ha-ka	...	...	43	0	"
33.	Meng-bhun-than	...	...	31	0	"
34.	Tha-ret-hmwe	...		49	0	"
35.	Dze-ya-nan-da-thu	...		51	0	"
36.	Tek-ka-thu	...		46	0	"
37.	Lek-ka-na	...		37	0	"
38.	Gun-na-rit	...		48	0	"
39.	Thi-wa-rit	...		41	0	"
40.	Meng-hla-hmwe	...		31	0	"
41.	Ma-rin-da	...		62	0	"
42.	Thi-dhat-kum-ma-ra	...		22	0	"
43.	Meng-hla-kyi	...		47	0	"
44.	Meng-hla-kyi	...		24	0	Brother.
45.	Nga-tsa-rit	...		38	0	Son.
46.	Myet-hna-wun	...		31	0	"
47.	Let-thut-kyi	...		27	0	"
48.	Thi-ri-kam-ma-thun-da	...		31	0	"
49.	Nan-da-ko-ta-bha-ya	...		27	0	"
50.	Meng-nan-bpyu	...		20	0	"
51.	Meng-ma-nu	...		28	0	"
52.	Meng-khoung-ngay	...		19	0	"
53.	Louk-khoung-ra-dza	...		40	0	"
54.	Meng-ngay-pyau-hla-tsi Three nobles usurp the throne	...		6 6	0 8	" "

No.	Name of Sovereign	Date of Accession		Region. Yrs. Ms.		Relationship of each Succeeding Sovereign.
		B.C	Ar. Era.	Yrs.	Ms.	
1.	Kan-Ra-dza-gyi	825	...	37	0	
2.	Thi-la-Ra-dza	...	...	48	0	Son.
3.	Wa-tsa-thu-ra	...	...	31	0	"
4.	Nan-da-wi-thu-ra	...	...	40	0	"
5.	Pu-na-thu-ri-ya	...	...	32	0	"
6.	Thu-ran-da	...	...	23	0	"
7.	Tsan-di-ma	...	...	37	0	"
8.	Thi-ri-tsan-da	...	...	40	0	"
9.	Thi-ha-ran	...	...	46	0	Brother.
10.	Thi-ha-nu	...	...	20	0	Son.
11.	Pa-ya-ka	...	...	31	0	"
12.	Ne-La-gun	...	...	41	0	"
13.	Roha-ha-gun	...	...	31	0	"
14.	Thi-ri-gun	...	...	24	0	"
15.	Tha-ma-dza	...	...	35	0	Nephew.
16.	Kum-ma-ra	...	...	20	0	Son.
17.	Thek-hteng-hypu	...	...	40	0	"
18.	Tha-bheng-u	...	...	42	0	"
19.	Te-dza-wun	...	...	36	0	"
20.	Mun-dza-ya-ba	...	...	34	0	"
21.	Kum-ma-ra-wi-thud-dhi	...	...	87	0	"
22.	Wa-thu-mun=da-la	...	...	34	0	"
23.	Thu-rin-da	A.D.	...	31	0	"
24.	Ra-la-ma-yu	15	...	22	0	Brother
25.	Na-la-ma-yu	37	...	31	0	Son
26.	Wa-dha-gun	68	...	22	0	"
27.	Wi-thu-ra-dza	90	...	21	0	"
28.	Thi-ri-ra-dza	111	...	35	0	"

পরিশিষ্ট ২

Dhi-ngya-wa-Dynasty of the Religion of Goad-a-ma.

1.	Tsan-da-thu-ri-ya	146	...	52	0	Son
2.	Thu-ri-ya-di-ti	198	...	47	0	”
3.	Thu-ri-ya-pa-ti-pat	245	...	53	0	”
4.	Thu-ri-ru-pa	298	...	15	0	”
5.	Thu-ri-ya-man-da-la	313	...	62	0	”
6.	Thu-ri-ya-wan-na	375	...	44	0	”
7.	Thu-ri-ya-na-tha	418	...	40	0	”
8.	Thu-ri-ya-weng-tha	459	...	9	0	”
9.	Thu-ri-ya-ban-da	469	...	6	0	”
10.	Thu-ri-ya-ka-lya-na	474	...	18	0	”
11.	Thu-ri-ya-muk-kha	492	...	21	0	”
12.	Thu-ri-ya-te-dza	513	...	31	0	”
13.	Thu-ri-ya-pu-nya	544	...	8	0	”
14.	Thu-ri-ya-ku-la	552	...	23	0	Son
15.	Thu-ri-ya-pa-bas	575	...	25	0	”
16.	Thu-ri-ya-tsi-tra	600	...	18	0	”
17.	Thu-ri-ya-the-tha	618	...	22	0	”
18.	Thu-ri-ya-wi-ma-la.	640	...	8	0	”
19.	Thu-ri-ya-re-nu	648	...	22	0	Brother.
20.	Thu-ri-ya-geng-tha	670	...	16	0	Son.
21.	Thu-ri-ya-thek-ya	686	...	8	0	Paternal uncle.
22.	Thu-ri-ya-thi-ri	794	...	20	0	Son.
23.	Thu-ri-ya-ke-thi	714	...	9	0	”
24.	Thu-ri-ya-kut-ta	723	...	23	0	”
25.	Thu-ri-ya-ke-tu	746	...	`42	0	”

পরিশিষ্ট ৩

আরাকানের রাজাদের মুসলমানী ও বৌদ্ধ নামের তালিকাসহ শাসনকাল

	রাজার নাম	শাসনকাল	মুসলিম নাম
১.	Min Saw Mun or Narameikhla	১৪৩০-১৪৩৪	Sulaiman Shah or Sawmun Shah
২.	Naranu or Min Khari	১৪৩৪-১৪৫৯	Ali Shah or Ali Khan
৩.	Basawpyu	১৪৫৯-১৪৮২	Kalima Shah
৪.	Min Dawlya	১৪৮২-১৪৯২	Mu-Khu Shah
৫.	Basawnyo	১৪৯২-১৪৯৪	Mahamud Shah or Mahammad Shah
৬.	Yanaung	১৪৯৪-১৪৯৪	Nuri Shah
৭.	Salingathu	১৪৯৪-১৫০১	Shiek abdullah Shah
৮.	Minyaza	১৫০১-১৫১৩	Ilyas Shah-I
৯.	Kasabadi	১৫১৩-১৫১৫	Ilyas Shah-II
১০.	Min Saw O	১৫১৫-১৫১৫	Jallal Shah
১১.	Thatasa	১৫১৫-১৫২১	Ali Shah
১২.	Min Khaung Raza	১৫২১-১৫৩১	El-Shah Azad
১৩.	Min Bin	১৫৩১-১৫৫৩	Zabuk Shah
১৪.	Min Dikha	১৫৫৩-১৫৫৫	Daud Khan
১৫.	Min Palaung	১৫৭১-১৫৯৩	Sikandar Shah
১৬.	Min Razagyi	১৫৯৩-১৬১২	Salim Shah I
১৭.	Min Khamaung	১৬১২-১৬২২	Husain Shah
১৮.	thiri thudamma	১৬২২-১৬৩৮	Salim Shah-II

[দ্র: M.S. Collis 4 San Shwe Bu "Arakans Place in the Civilization of the Bay- JBRS. Vol. XV. No. I, 1925, pp. 34-52; Harvey, *History of Burma*, 139-45; R.C. Majumdar, *Hindu Colonies in the Far East* (Calcutta: General Printers and Publication, 1944), pp. 202, 205-6; J.B. Harrison, "Arakan" *The Encyclopedia of Islam*, New Ed., Vol. 1, Leider, 1960, p. 606; Abdul Karim *The Rohingyas: A Short Account of Their History and Culture*, (Chittagong: Arakan Historical Society, 2000) p. 23. Mohammad Ali Chowdhury, "Bengal-Arakan Relations from the 15th to the 17th Centuries (1430-1666 A.D.)" Unpublished Ph.D. thesis, Chittagong University, 2000, pp. 38-39.]

পরিশিষ্ট ৪

১৬৪৫-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২৫ জন আরকানী রাজার তালিকা

ক্র. নং	রাজার নাম	শাসনকাল	
১.	থিরিথুরিয়া (thirithuriya)	১৬৮৪-১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দ	সান্দা থু ধম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র
২.	ওয়ারা ধম্মা রাজা (Waradamma Raza)	১৬৮৫-১৬৯২ খ্রিস্টাব্দ	থিরি থুরিয়ার ভাই
৩.	মুনি থু ধম্মা (Muni thudhamma)	১৬৯২-১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ	ভাই
৪.	সান্দা থুরিয়া ধম্মা (Sanda thuriya Dhamma)	১৬৯৪-১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ	ভাই
৫.	নওরাথাজৌ (Nawrahtazaw)	১৬৯৬-১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ	পুত্র
৬.	ময়ুক পিয়া (Mayokpiya)	১৬৯৬-১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দ	আরাকানী সাধারণ সর্দার
৭.	কালামনদাত (Kalamandot)	১৬৯৭-১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত
৮.	নরাধিপতি (Naradipati)	১৬৯৮-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ	ভূতপূর্ব রাজা সান্দা থুরিয়া ধম্মার পুত্র
৯.	সান্দা উইমালা (Sandawimala)	১৭০০-১৭০৬ খ্রিস্টাব্দ	ভূতপূর্ব রাজা থদোর পুত্র
১০.	সান্দা থুরিয়া (Sanda thuriya)	১৭০৬-১৭১০ খ্রিস্টাব্দ	ভূতপূর্ব রাজা সান্দা থু ধম্মার পৌত্র।
১১.	সান্দা উইজা (Sanda Wizaya)	১৭১০-১৭৩১ খ্রিস্টাব্দ	আরাকানী নেতা
১২.	সান্দা থুরিয়া (Sanda thuriya)	১৭৩১-১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ	জামাতা
১৩.	নরাধিপতি (Naradhipati)	১৭৩৪-১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ	পুত্র
১৪.	নরাপাওয়ারা (Narapawara)	১৭৩৪-১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ	আরাকানী নেতা
১৫.	সান্দা উইজ্যা (Sandawiziya)	১৭৩৭-১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ	সম্পর্কীয় ভাই (Cousin)
১৬.	খাত্তেয়া (Khatya)	১৭৩৭-১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ	আরাকানী মুসলিম নেতা
১৭.	মাদারিত (Madarit)	১৭৩৭-১৭৪২ খ্রিস্টাব্দ	সান্দা উইজ্যার ভাই
১৮.	নরাপায়া (Narapaya)	১৭৪২-১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ	মাদারিয়াতের চাচা
১৯.	থিরিথু (thirithu)	১৭৬১-১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ	পুত্র
২০.	সান্দা পায়ামা (Sanda Payama)	১৭৬১-১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ	ভাই
২১.	আপায়া (Apaya)	১৭৬৪-১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ	শ্যালক
২২.	সান্দা থুমানা (Sanda thumana)	১৭৭৩-১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ	শ্যালক
২৩.	সান্দা উইমালা (Sanda Wimala)	১৭৭৭-১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ	আরাকানী নেতা
২৪.	সান্দা থাডিয়া (Sanda thadiya)	১৭৭৭-১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ	রামব্রীর আঞ্চলিক শাসক
২৫.	থামাডা (thamada)	১৭৮২-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ	অজ্ঞাত।

দ্রঃ Harvey, *History of Burma*, 139-45;

পরিশিষ্ট ৫

Ancient Arakan Kingdom about 17th Century A.D.

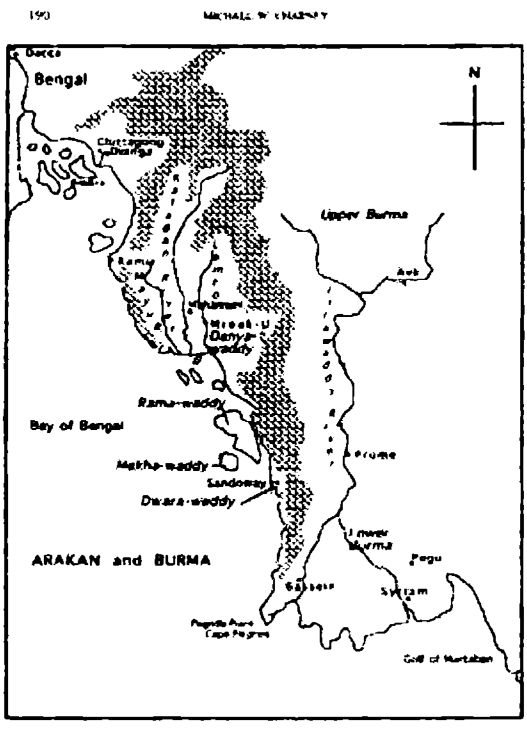

Source:
http://arakanindobhasa.wordpress.com/category/arakan-kingdom-map/

Arakan Map under British Administration

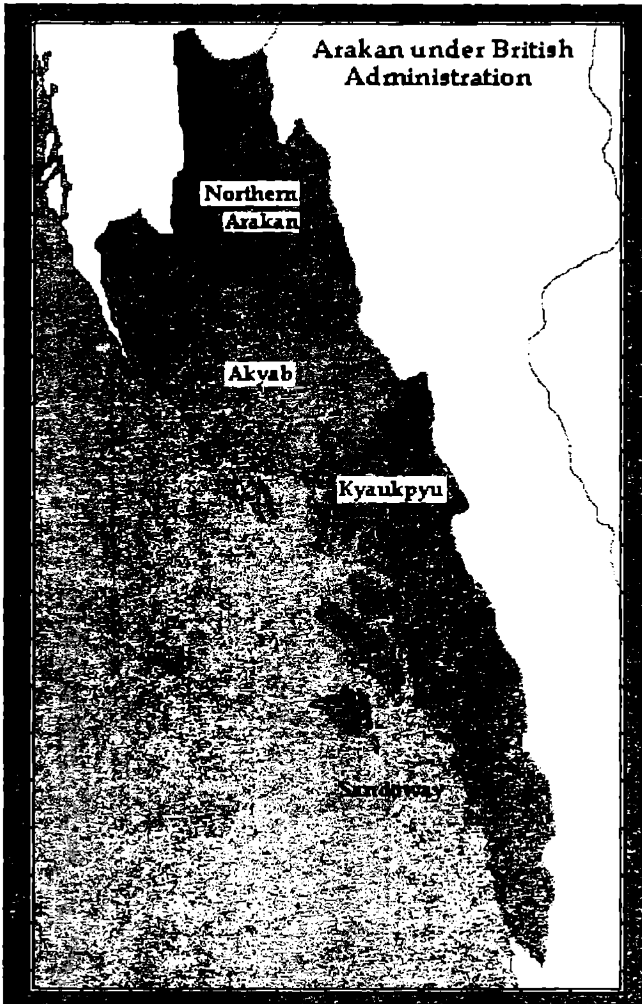

Source:
http://arakanindobhasa.wordpress.com/category/arakan-kingdom-map/

Map of northern Rakhine state (Myanmar) with locations of Sittwe, Mrauk U, Vesali, Dhanyawaddy, Kyauk taw, etc. The map is not drawn to scale.

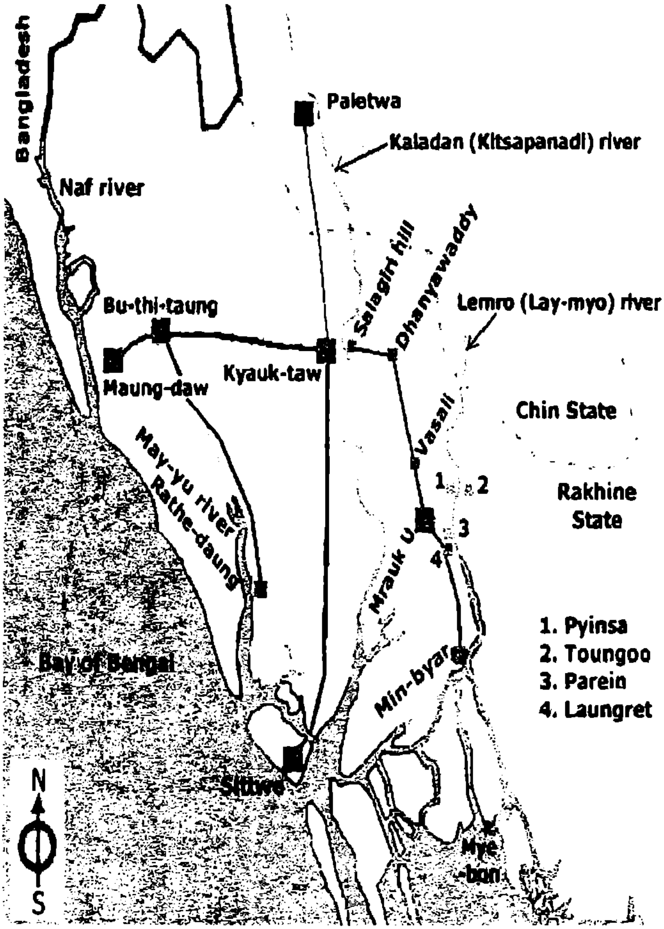

Source:
http://www.tourpagan.itgo.com/mrauk-u2.html

THE MAP OF ARAKAN

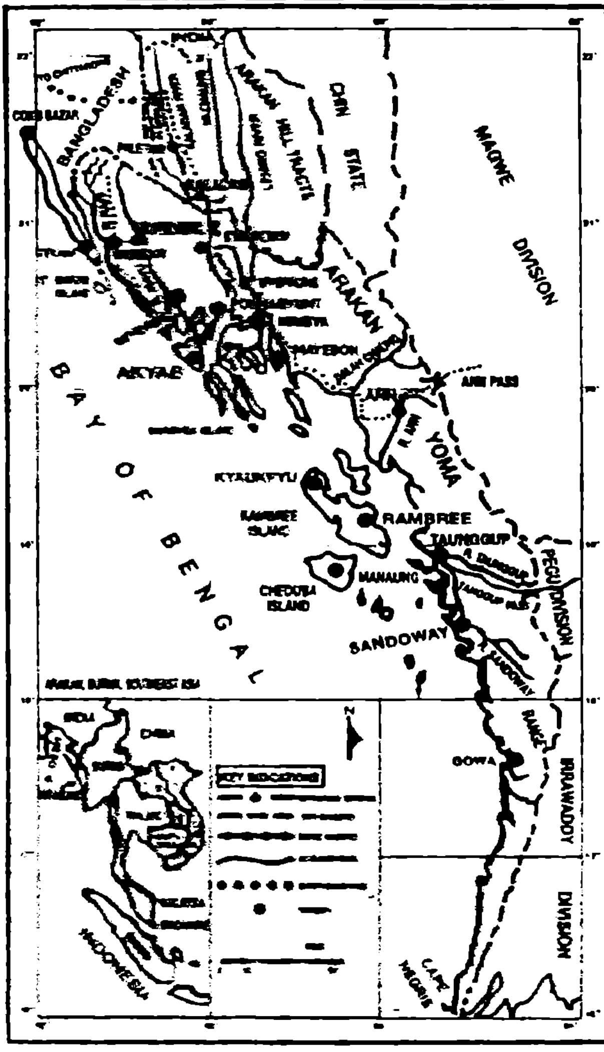

Source:
John Bartholomew (ed.), *The Times Atlas of the World*, Mid- Century Edition (London : The Times Publishing Com. Ltd., 1958) , p-24

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস (Primary Source)

মুহাম্মদ সিদ্দিক খান সংগ্রহ

মরহুম মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, ইন্ডিয়া হিস্ট্রিক্যাল রেকর্ড, বর্তমানে ন্যাশনাল আর্কাইব বা ভারতীয় জাতীয় মুহাফেজখানা থেকে আরাকান ও বার্মার উপর প্রচুর তথ্য সংগ্রহপূর্বক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দান করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর সংগৃহীত তথ্যকে Muhammad Siddiq Khan Collection শিরোনামে সংরক্ষণ করেছে। এখানে আরাকানের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত রয়েছে।

সমসাময়িক রচনাবলী

আলাওল *তোহফা,* গোলাম সামদানী কোরায়শী সম্পাদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫।

----------, *তোহফা,* আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

আলাউল, *পদ্মাবতী,* সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, ঢাকা : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮।

আলাওল, *পদ্মাবতী,* সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০০।

আলাউল, *সিকান্দরনামা,* আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

আলাউল, *সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী,* মোহম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

কোরেশী মাগন, *চন্দ্রাবতী,* আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৭।

দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী,* মযহারুল ইসলাম ও মহাম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯।

নসরুল্লাহ খোন্দকার, *মুসার সওয়াল,* আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা : *সাহিত্য পত্রিকা,* একচল্লিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন - ১৪০৪।

নসরুল্লাহ খোন্দকার, আবদুল করিম সম্পাদিত, *শরীয়তনামা,* চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫।

নসরুল্লাহ খোন্দকার, 'মুসার সওয়াল, [আহমদ শরীফ সম্পাদিত] *সাহিত্য পত্রিকা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন-১৪০৪।

মির্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী,* খালেক দাদ চৌধুরী অনূদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

মির্জা নাথান, *বাহাবিস্তান-ই-গায়বী,* খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

মরদন, *নসিবনামা,* আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা : *সাহিত্য পত্রিকা,* উনচল্লিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন - ১৪০২।

মরদন রচিত 'নসিবনামা' [আহমদ শরীফ সম্পাদিত] *সাহিত্য পত্রিকা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৪০২।

Fray Sebastian Manrique. 1929-1643, Vol. I & II. Arakan [Trans: Eckford Luard] Oxford: The Hakluyt Society, 1926.

গেজেটিয়ার, সংবিধান, আদমশুমারী ও ভৌগোলিক প্রতিবেদন

Burma Census 1911: Census Tables. Rangoon : Supdt., Govt. Printing, 1913.
Burma Census 1911: Town and Village Census Tables. Rangoon : Supdt., Govt. Printing, 1913.
Burma Census 1921: Census Tables. Rangoon : Supdt., Govt. Printing, & Sty. 1925.
Government Official Population Census of Arakan in 1931. Union of Burma.
Harrison, J.B. "Arakan" *The Encyclopedia of Islam,* New Ed., Vol. 1, Leider, 1960.
List of Ancient Monuments in Burma. Rangoon Office of the Supdt., Govt. Printing, 1910.
Report On The Progress of Arakan Under the British Rule From 1826 to 1875. Rangoon : Govt. Press, 1876.
Rizvi, S.M. Edited *East Pakistan District Gazzetteers. Chittagong,* 1970.
SLORC Announcement No. 1/90, July 27, 1990.
Smart, R.B. *Burma Gazetteer Akyab District.* Vol. A . Rangoon : Burma Government, Printing & Stay, 1959.
The Arakan Ports Manual : A Collection of Rules and Orders Specially Concerning the Port of Akyab and other Ports in the Arakan Division, 1915, Burma.
The Burma Boundaries Manual : Contacting the Burma Boundaries Act, 1880.
The Burma Sub-divisional and Township Office Manual. Rangoon, Supdt., Govt. Printing, 1903.
The Constitution of the Socialist Republic of Union of Burma. 1974, Sec. No. 30/5.
The Encyclopedia of Britanica, Vol. 28. England: Cambridge University Press, 1911).
The High School Geography of Burma (in Burmese), The Textbook Committee, Ministry of Education, The Socialist Republic of Union of Burma, Rangoon, 1975.
The Linguistic Survey of Burma, Preparatory State or Linguistic Census. Rangoon, Supdt., Govt. Printing, 1917.
West Land Rules of 1839 and 1841 (Arakan) and of 1863 to 1865(British Burma). Rangoon : Supdt., Govt. Printing, 1921.
ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬।

৫.১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন

"Burma : Entrenchment or Reform? *Human Rights Watch / Asia,* July 1995, vol. 7, No. 10.
"Burma : The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus", *Human Rights Watch / Asia,* vol. 8, No. 9 (c), September, 1996.
"Ethnicity and Nationality : Refugees in Asia." *Amnesty International,* London, U. K., 1 October, 1997.
"National Refugee Week : Report on Three Asian Refugee Trouble Spots Hong Kong–Bangladesh–Thai / Burmese Border", *AUSTCARF,* The Refugee Council of Australia, The International Commission of Jurists Australian Section, 17 June 1992, Sydney, Australia.
Operation Hope : An Operation to Provide Relief, Succour, Food and Shelter to the Myanmar Rohingya Refugees in Bangladesh, Commissioner, Chittagong Division Coordinator, Myanmar Rohingya Refugee Relief and Repatriation Operation, 7 April 1992, Chittagong, Bangladesh.
Report on the Situation for Muslim in Burma. May 1997, IMAGES ASIA.
"Return to Myanmar Repatriating Refugees from Bangladesh", *Information Bulletin,* UNHCR, June, 1995.
"The Return of the Rohingya Refugees to Burma : Voluntary Repatriation or Defaultment"? *U.S. Committee for Refugees Issue Paper,* March, 1995.

"Burma : Rape. Force Labour..." *Asia Watch.* May 1992;
Amnesty International, "Human Rights Violations Against Muslim" May 1992.
The Yale Journal of Human Rights, *Contents*, vol. 3, No. 2, Chicago.

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, ঢাকা ঃ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ১৯৯৮,

অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভসমূহ

Ahmed, Ali. The Muslims of Chittagong, 1858-1931: A Socio-Cultural Study," Unpublished Ph.D. thesis, University of Chittagong, 1987.

Ali M. Shamsher, "The Beginning of British Rule in Upper Burma : A Study of British Policy and Burmese Reaction 1885-90" (Unpublished Ph. D. Dissertation University of London, March 1976).

Bahar, A.S. "The Arakani Rohingya in Burmese Society" (Unpublished M. A. Theses, Department of Sociology and Anthropology, University of Windsor, Ontario, Canada, 1981).

Chowdhury, Mohammad Ali. "Bengal-Arakan Relations from the 15th to the 17th Centuries (1430-1666 A.D.)" Unpublished Ph.D. thesis, Chittagong University, 2000.

Nilsson Janell Ann, "The Administration of British Burma, 1852-1885 (Unpublished Ph.D. Dissertation, University of London, 1970).

Sidhu, Jagjit Singh, "British Administration in Upper Burma" (Unpublished Ph.D. Dissertation, University of London, 1963.)

Su, Khin Khin, "The Acculturation of sthe Burmese Muslim" (Unpublished Master's Thesis, Rangoon University, 1960).

মোঃ মাহফুজুর রহমান, "রোহিঙ্গা সমস্যাঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী, ১৯৭৮-১৯৯৪" (অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০)।

মুহাম্মদ রুহুল আমীন "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান," অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা রণাঙ্গন, ১৯৪১-৪৫ ঃ ইঙ্গ-চীন ও মার্কিন সহযোগিতা প্রসঙ্গ" অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

মোঃ লুৎফুল এলাহী, "রোহিঙ্গা সমস্যা ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাংলাদেশে এর প্রভাব" অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source)

ইংরেজি ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাবলী

Adas. Michael. *The Burma Delta: Economic Development and Social change on an Asia Rice Frontier. 1852-1941.* Madison: University of Wisconsin Press, 1974.

Ali. Muhammad Mohar. *History of the Muslim of Bengal.* vol. I. Ryadh : Imam Muhammad Ibn Soud Islamic University, 1985.

Anwar. M. N. & M. M. Al-Faroque. *Bangladesh and Neighbours.* Dhaka : Payra Prakashani. 1996.

Aung, Maung Htin. *A History of Burma.* New York : Columbia University Press. 1967.

Aung, San tha.*The Buddhist Art of Ancient Arakan.* Rangoon : Daw Saw Sapay. 1979.

Banerjee. Anil Chandra. *Annexation of Burma.* Calcutta: Mukherjee, 1944.

Bayfield, G.T. *Historical Review of the Political Relation Between the British Government in India and the Empire of Ava, from the Earliest Date on Record to The Present Year.* Calcutta: Government Printers, 1835.

Bennett. Paul J. *Conference under the Tamarind Tree: Three Essays in Burmese History.* New Haven: Yale University Southeast Asia Studies. 1971.

Bessaignet, P. *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts.* Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1958.

Bigandet, Paul Ambrose. *An Outline of the History of the Catholic Burmese Mission From the Year 1720 to 1887.* Rangoon : Hanthawaddy Press, 1887.

Blalock, H.M. *Toward a Theory of Minority Group Relations.* New York: John wiley and sons, Inc., 1976.

Cady. J.F. *A History of Modern Burma.* New York : Cornell University Press, 1958.

Campos, J.J. *History of Portugues in Bengal,* Patna : Janaki Prakashan. 1974.

Chakravarti, N. R. *Indian Minority in Burma.* London: Oxford University Press, 1971.

Chatterjee, Suniti Kumar. *Origin and Development of The Bengali Language.* Part 1., London: Unwine Brother Ltd., 1979.

Chaudhury, K.N. *Trade and Civilization in the Indian Ocean,* Cambridge : Cambridge University Press,1985.

Cheng Siok-Hwa. *Rice Industry of Burma* 1852-1940. Kualalumpur: University of Malaya Press, 1968.

Christian, J. L. *Burma.* London: Collins, 1945.

Cooks. S.W. *A Short History of Burma* (London : Macmellan. 1910),

Cooks, S.W., *Short History of Burma.* London : Macmellan. 1910.

Cotton, H.J.S. *Memorandum on the Revenue History of Chittagong,* Calcutta : Bengal Secretariat Press, 1880.

Cox, Hiram. *Journal of a Residence in the Burmhan Empire and more Particularly at The Court of Amarapoorah.* London: J. Warren, 1821.

Dani, Ahmad Hasan, *Muslim Architecture in Bengal.* Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1961.

Desai, Walter Sadgun. *A Pageant of Brumes history.* Bombay : Orient Longmans, 1961.

Desai, Walter Sadgun. *History of the British Residency in Burma 1826-1840.* Rangoon: University of Rangoon. 1939.

Dobbs. Richard Stewart. *Reminiscences of life in Mysore, South Africa and Burma.* Dublin: G. Herber, 1882.

Donnison, F. S. V. *Burma.* London: Ernest Benn limited. 1970.

Durber, George *A History of India from the Earliest Times to Nineteen Thirty Nine,* London : Nicholson and Watson. 1939.

Elias, New. *Introductory Sketch of the History of the Shans in upper Burma and Western Yunnan.* Calcutta : Foreign Department Press, 1876.

Eytch, Albert. *Burma past and present with personal Reminiscences of the Country.* 2 vol. London: kegan Paul, 1857.

Farnon, L. *A. Dying colonialism.* New York: Grove Press, Inc., 1965.

Fisher, C.A. *Burma: A Social Economic and Political Geography.* London: Mathvan and company limited, 1967.

Furnival, J.S. *An Introduction to the Political Economy of Burma.* Rangoon : Peoples literature Committee. 1957.

Furnival. J.S. *Colonial policy and practice: A comparative study of Burma & Netherlands India.* Cambridge: Cambridge University Press, 1957.

Ghosh, Jamini Mohan. *Magh Raider in Bengal.* Calcutta : Book land Private Ltd., 1960.

Gouger, Henry. *Personal Narrative of Two Years Imprisonment in Burmah* 1824-26. London : Murray, 1860.
Hall, D.G.E. *Burma. A History of South East Asia*. London : St. Martins Press, 1970.
Hall, D.G.E. *Burma. Early English Intercourse with Burma* 1578-1743. London : Longmans, 1928.
Hall, D.G.E. *Burma. Europe & Burma: A study of European Relations with Burma to the Annexation of Thibaw's Kingdom 1886*. London: Oxford University Press, 1945.
Hall, D.G.E. *Burma*. New York : Hutchinson University library, 1950.
Harvey, G. E. *British Rule in Burma 1824-1942*. London: Faber & Faber, 1946.
Harvey, G. E. *History of Burma : From the Earliest Times to 10 March 1824. The Beginning of the English conquest*. London : Frank Cass & Co., 1967.
Harvey, G. E. *Outline of Burmese History*. Bombay: Green & company, 1949.
Hornby, A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Fifth Ed. New York : Oxford University Press, 1995.
Hunter, W. W. *The Marques of Dollhouse and The Final Development of The Company's Rule*. Oxford : Clarendon Press. 1895.
Hunter, W.W. *A Statistical Account of Bengal*. Vol. 6. Delhi: D. K. Publishing House. 1973.
Irwin, A. *Burmese Outpost*. London: Collins, 1945.
Jafar, S.M. *Education in Muslim India, 1000-1800 A.D.* New Delhi: Idarah - 1-Adabiyati, 1972.
Jilani, A FK. *The Rohingyas of Arakan : Their quest for Justice.*Chittagong : Ahmed Jilani, 1999.
Karim, Abdul. *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*. (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1992).
Karim, Abdul. *The Rohingyas : A Short Account of their History and Culture*. Chittagong : Arakan Historical Society, 2000.
Khan, Muin-ud-Din Ahmad, *Muslim Communities of South-East Asia : A Brief Survey*. Chittagong : Islamic Cultural Centre, 1980.
Kyaw, Natmagh Bon. *History of Anglo-Burmese War*. Rangoon : Pagan Publisher, 1975.
Lach, Donaald. F. *South East Asia in the Eyes of Europe in The Sixteenth Century*. Chicago : University of Chicago Press, 1968.
Laurie, William F. B. *The Second Burmese War: A Narrative of the Operations at Rangoon in 1852. London : Smith, Elder & co., 1853.*
Leach, Edmund, R. *Political Systems of Highland Burma : A Study of Kachin Social Structure*. London: Athlone Press, 1954.
Leifer, M. *Dilemmas of Statehood in South East Asia*. Vancouver : University of British Columbia Press. 1972.
Ma, Myasein. *Administration of Burma : Sir Charles Crosthwaite and the Consolidation of Burma*. Rangoon: Zabu Meitswe Pilaka Press. 1938.
Majumder, R. C. *Hindu Colonies in the far East*. Calcutta : General Printers and Publication, 1944.
Manrique, Sebastian. *Travels of Fray...* 1629-1643: A Translation of the "Itinerario de las Missiones Orientales," Introduction and notes by Lt Col.Eckford Juard, assited by Father H. Hosten. Vol. I., 'Arakan', Oxford: Hakluyt Society, 1927.
Maring, J. M. *History & Cultural Dictionary of Burma*. New Jersey: Scarecrow Press. Inc., 1973.
Marks, J.E., *Forty years in Burma*. New York: E. P. Dutton, 1917.

Marshall. H. I. *The Karen People of Burma: A Study in Anthropology and Ethnology.* Columbus : Ohiostate University Bulletin, 1922.

Marshall. W. H. *Four Years in Burma.* London : Skeet, 1860.

Marshman, J. C. *How Wars Arise in India: Observations on Mr. Cobden's Pamphlet Entitle "The Origin of the Burmese War.* London: N. P., 1853.

Mason. F. *Burmah, Its People and Natural Productions.* Rangoon: Ranney, 1866.

Massy, Devid & Bhera. *Marriage East and West*, New York: Dalphin Book Daubday & Co. 1960).

Maung. Htin Aung. *A History of Burma.* New York: Columbia University Press. 1967.

Maung, Htin Aung. *Burmese Drama,* London : Oxford University Press, 1937.

Maung, Htin Aung. *Burmese Folk Tales,* Calcutta: Oxford University Press, 1949.

Maung. Htin Aung. *Burmese low Tales: The legal Element in Burmese Folklore.* London : Oxford University Press 1962.

Maung, Htin Aung. *Folk Elements in Burmese Buddhism.* London: Oxford University Press, 1962.

Maung, Maung. *Burma in the Family of Nations.* Amsterdam : Uitgverij Djambatan, 1956.

Maung, Tin P.E. & C.H. Luce. *The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma,* London: Humphrey, Midford, 1913.

Mi Mi Khaing. *Burmese Family.* London : Longmans, 1946.

Misra, B.B. *The Indian Middle Classes, their growth in Modern Times* London: Oxford University Press, 1961.

Moniruzzaman. Mohammad (Ed.) Complete works of Muhammad Siddiq Khan, Vol. 2, Dhaka: Bangla Academy, 1996.

Myrdal. G. *Asian Drama: An Introduction into the poverty of Nations.* New York: Pantheon Books, 1971.

Niharranjan Ray. *An Introduction to the Study to Theravada Buddhism in Burma.* Calcutta: Calcutta University Press, 1946.

O'Malley, L.S.S. *Eastern Bengal District Gazetteers.* Calcutta : Bengal Secretarial Book Depot, 1908.

Park. R.E. *Race & Culture.* Glencoe : Free Press, 1950.

Pearn. B.R. *An Introduction to the History of south East Asia,* Kualalumpur: Longmas of Malaysia, 1965.

Pheyre. Arthur P. *History of Burma Including Burma Proper, Pegu, Taungu, Tenasserim and Arakan. From the Earliest time to the End of the First war with British India.* London: Susil Gupta. 1967.

Pointon. A. C. *The Bombay Burmah Trading Corporation limited 1863-1963.* Southampton, England: Millbrook Press, 1964.

Polk. Olldver, B. *Empires in collision Anglo-Burmese Relations in the Mid-Nineteenth Century.* London: Greenwood Press, 1979.

Powell, J.C., *A History of India.* London : Jhomas Nelson. 1950.

Powell. price J.C. *A History of India.* London : Jhomas Nelson. 1950.

Purer. W. B. & Saunderds. *Modern Buddhism in Burma.* Rangoon: Christian literature Society. 1914.

Qureshi, Ishtiaq Husain. *The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent (610-1947),* Delhi: Renaissance Publishing House. 1985.

Razzaq. Abdur. and Mahfuzul Haque, *A Tale of Refugees Rohingyas in Bangladesh.* Dhaka: Centre for Human Rights. 1995.

Rex. J. *Race Relations in Sociological theory.* London: Weidenfeld and Nicholson, 1970.

Robertson, T. C. *Political Incidents of the First Burmese War.* London: Bentley, 1853.

Robinson, M. & L.A. Shaw. *The Coins and Bank notes of Burma.* Manchester, England, 1980.

Saheb, N. A. *History of Arakan.* Karachi: Department of Dawah. 1978.

Said, A. & L. R. Simons. *Ethnicity in International Contexts.* Brunswick: Transactions. 1976.

Sangermano, P. V. *A Description of the Burmese Empire.* London: Susil Gupta, 1966.

Sar Desai, D. R. *British trade and Expansion in Southeast Asia 1830-1914.* New Delhi : Allied Publisher's, 1977.

Sar Desai, D. R. *South-East Asia : Past & Present.* Dacca : Dacca University Press, 1981.

Sarkar, Dr. Jagadish Narayan. *Islam in Bengal.* Calcutta : Ratna Prakashan, 1972.

Sarkar, Jadunath. *History of Bengal, Vol. II, Muslim Period 1200-1757.* Dacca: University of Dacca, 1948.

Sarkisyanz, E. *Buddhist Backgrounds of the Burmese Revolution.* Hague : M, Nijhoff, 1965.

Scott, J.G *Burma From the Earliest times to the Present Day.* London : T. Fisher Unwin, 1924.

Sein, M. M. *Burma.* London: Oxford University Press, 1943.

Serajuddin, A. M. *The Revenue Administration of the East India Company in Chittagong.* Chittagong: Chittagong University Press, 1971.

Shakespeare, L. W. *History of Upper Assam, Upper Burma and North East Frontier.* London: 1914.

Silverstein. J. *Burma: Military Rule and Politics of Stagnation.* Ithaca : Cornell University Press, 1977.

Silverstein. J. *Burmese Politics : The Dilemma of National Unity.* New Jersey: Rutgers University Press, 1980.

Singhal, D.P. *The Annexation of Upper Burma.* Singapore : Eastern University Press. 1960.

Smith, D.E. *Religion and Politics in Burma.* Princeton : Princeton University Press, 1965.

Symes. M. *Account of an Embassy to the Kingdom of Ava in 1795.* London : Bulmer, 1800.

Tarling, Cholas. *A Concise History of Southeast Asia.* London : 1960.

Taylor. A. *Focus on South East Asia.* New York : Praeger Publishers. 1972.

Tin, P.E. Maung and C. H. Luce. *The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma.* London : Humphrey. Milford. 1913.

Tinker, H. *The Union of Burma. A Study of First Years of Independence.* London : Oxford University Press, 1967.

Trager, H.G. *Burma Through Alien Eyes : Missionary Views of the Burmese in the Nineteenth Century.* New York: Praeger. 1966.

Trager, R.N. *Burma from kingdom to Republic : A Historical and Political analysis.* New York : Praeger. 1966.

Vincent. F. *Land of the White Elephant.* London : Harper, 1873.

Woodman. D. *The Making of Burma.* London : Cresset Press. 1962.

Yegar. Moshe. *The Muslim of Burma: A study of Minority Groups.* Wiebaden : Otto Harrassowitz. 1972.

Yunus. Mohammed. *A History of Arakan : Past & Present.* Chittagong : Magenta colour, 1994.

Yunus. Mohammed. *What Fate is in Store for the Rohingyas?* (Arakan : RSO. 1995).

ইংরেজি ভাষায় প্রণীত প্রবন্ধসমূহ

Ahamed, Ali, "Some popular socio-Religious ceremonies, practices and beliefs among the muslims of Chittagong." *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. XXXIII, No. 1, June 1988.

Ahmed, Ali. Deobandis in the Chittagong Muslim society, *JASB*. Vol. 35, No. 2 Dec. 1990.

Alam, Mohammed Ashraf, "Historical Background of Arakan," *Souvenir, Welcoming the Silver Jubilee Anniversary (1975-2000)*, Arakan Historical Society. Chittagong.

Ali, S.M., ÒArakan Rule in ChittagongÓ, *JASP*, Vol. xii, No. 3, 1967.

Bhattacharya, Bisveswar, "Bengali influence in Arakan."*Bengal Past and Present*, Vol. XXXIII, January-June 1927.

Boon, Maung. "The First Burmese War," *JBRS*, Vol. 13. Part 2, 1923.

Bu, San Shwe, " The Arakan Mug Battalion," *JBRS*, Vol. 13, Part 2, 1923.

Bu, San Shwe, "A Votive Tablet Found by Treasurar Hanters at Akyab" *JBRS*, Vol. 8, 1918.

Bu, San Shwe, "The Legend of the Early Aryan Settlement of Arakan" *JBRS*, Vol. 11, Part 2, 1921.

Chacraborty. Ratan Lal, "Some Aspects of the Anglo-Arakanese Relations, 1760-1785" *JASB*, Vol. XX, No. 3.

Chakraborty, Ratan Lal, "Some aspects of the Anglo-Arakanese Relations," *JASB*, Vol. XX, No. 3, December 1975.

Chowdhury Abdul Momin, Geography of Ancient Bengal: The Pundravardhana Bhukti. *JASB*, Vol. XXII, No. 3, Dec. 1977.

Chowdhury. Mohammed Ali, "The Advent of Islam in Arakan and The Rohingyas," *Arakan Historical Society Chittagong, Annual Magazine-1995-96*, 23-32.

Chowdhury. Vasant, "The Arakani Governors of Chittagong and their coins," *JASB*, vol. 42. No. 2, December 1997.

Collis, M.S., "An Arakanese Poem of the 16th Century." *JBRS*. Vol. 13, Part 2. 1923.

Collis, M.S., "Combell Robertson in Arakan 1825 A.D.," *JBRS*, Vol. 13, Part 2, 1923.

Collis, M.S., "Fra Manrique : A Glimpse of Arakan in 1630 A.D.," *JBRS*, Vol. 13, Part 2, 1923.

Collis, M.S., "The City of Golden Mruk-U," *JBRS*, Vol. 13, Part 2, 1923.

Collis, M.S., "The Strange Murder of King Thiri Thudhamma." *JBRS*, Vol. 13, Part 2, 1923.

Collis, M.S., "Arakan's place in the civilization of the Bay" *Journal of the Burma Research Society*, 50th Anniversary publication, No. 2. Rangoon, 1960.

Collis, M.S., and San Shwe Bu."Arakans Place in The Civilization of the Bay" *JBRS*. Vol. xv, No.1. 1925.

Das, Sarat Chandra. "Antiquity of Chittagong," *JASB*. 1898.

Deyell, John. "The Trade Coins of Chittagong in 16th Century," *JASB*, December 1995.

Fatimi S. Q., "First Mslim Invasion of the N. W. Frontier of the Indo-Pakistan Sub-Continent 44 A. H. 664-5 A.D.," *Asiatic Society of Pakistan*, Vol. VIII, No. I, June 1963.

Gutman, Pamela C. Sourchese for the Early History of Arakan, (Circa 1st-10th Centuries A.D.) Journal of the Bangladesh Itihas Samiti Vol. 11. 1973.

Habibullah. A.B.M., "Two Inscriptions from Arakan." *JASB*, Vol. XI, No. 1. April 1966.

Hall, D.G.E. "English Relation With Burma." *JBRS*, Vol. 17, 1927.

Hall, D.G.E. ÒStudies in Dutch Relation with Arakan," *JBRS*, vol. XXV1,1936.

Hall, D.G.E.. R. B. Pembertons Journey from Munipur to Ava and from Thence Across the Yooma Mountins to Arakan, (14 July- 1 October 1830). *JBRS*, Vol. 43. December, 1960.

Harvey, G. E., " The First Anglo- BurmeseWar 1824-26," *JBRS*. Vol. 13, Part 2, 1923.

Harvey. G.E. "The Fate of Shah Shuja. 1661" *Journal of the Burma Research Society*, Vol. xii, August 1922.

Harvey, G.E., "The Fate of Shah Shuja. 1661" *JBRS*, Vol. xii, August 1922.

Huq. Syed Ahmadul, "Hundred years of Arakan as a feudatory State to Bangladesh" (1480 AD to 1530 AD) *Annual Magazine 1995-96, Arakan Historical Society, Chittagong.*

Hussain, Sayed Sajjad, "A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts," *JASP*, Dacca, Publication no 3.1960 281-82

Hussain, Sayed Sajjad, "On A Coin of Arakan found at Chittagong,"*Journal of the Numismatic Society of India*, Vol. XLV, Parts I and II, 1983.

Islam, Anwarul, " European Description of Burma from the Earliest Times to A.D. 1600," *JASB*, Vol. XVII, No. 3.

Islam. Kari Nurul, Influence of Buddhism on Gaudapad A Critical Estimation, *JASB*, Vol. XXVIII, No. 2, 1982.

John, R;F. St. Andrew St. "A Burmese Saint" *The Journal of the Royal Asiatic Soceity of Great Britain and Ireland*. January 1894.

Johnston, Dr. E. H. "Inscription of Arakan," *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, No. II. London, 1944.

Johnston, E.H., "Inscription of Arakan." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, No 11, London, 1944.

Kamal, Narul, "Chittagong- Arakan : A region of a people, A Chronicle Studies of medeeval period," *Annual Magazine 1995-96, Arakan Historical Society, Chittagong.*

Karim Abdul, Catalogue of Coins in the Cabenet of the Chittagong University Museum (Chittagong, C.V. 1979).

Karim. A., An Unpablished Sultanat Inscription and A Mughal Mosque of Chittagong," *JASP*, Vol. IX, No. 2, Dec. 1964.

Karim, Abdul, "Chittagong Coast as Described by SIDI ALI CHELEBI A Sixteenth Century Turkish Navigator." *JASB*, Vol. XVI., No. 3, Dec. 1971.

Karim. Abdul, "Two Persian Inscriptions from Chittagong." Journal of the Bangladesh Itihas Somiti, Vol. 11, 1973.

Karim, Abdul, "Was Chittagong ever a capital city ? A fresh study of some rare coins of Chittagong," *JASP*, Vol. XXXI (1) 1986.

Karim, Abdul. A Medieval Coin of Arakan Journal of the Numismatic Society. Vol. XXII, 1960.

Karim, Abdul, Aurangazibs FARMAN Issued To MULLA MESKIN of Chittagong. *JASB*. Vol. XXXI I2) Dec. 1986.

Karim. Abdul. Muslim Religious Movement in Bengal in the Thirteenth Century. *JASB*. Vol. XXXIV, No. 2. Dec. 1989.

Khan. M. Siddique, "Badr Maqams or the Shrines of Badar Al-Din- Auliya". *JASP*. Vol. VII, June 1962.

Khan, M. Siddique. "Muslim Intercourse with Burma" *Islamic Culture*. Vol. X. Hydrabad, July 1936.

Khan. M. Siddique, "The Tragedy of Mrauk-U-(1660-1666)", *JASP*, vol. XI, No. 2, August 1966.

Khan, Muhammed Siddiq. "Badr Maqams or the Shrines of Badr Al-DIN-AULIA" Complete Works of Muhammed Siddiq Khan, Vol. 2, Dhaka: Bangla Academy, 1996.

Khi, Khin Maung. "The Mujahid Story" *Guardian Monthly*, Rangoon, January. 1955.

Latter, Thomas. "The Coins of Arakan-The Symbolical Coins,"*JASB*, vol. XV, 1846.

Lwin, Moung Than, "Rakhin kala or Rohingya," *The Mya wadi Magazine*, Issue July 1960.

M. K. " An Arakanese Romance," *JBRS*, Vol. 18, Part 1, 1928.

Mookherjee, Kalidas. "Jaisis Padumovati and its Bengali Version by Aloal- A Comparison" *Calcutta Review*, July 1940.

Pearn. R.B., "King Bearing", *JBRS*, XXIII, Part 1, 1933.

Phayre, A.P., "The Coins of Arakan- The Historical Coins," *JASB*, Vol. XV, 1846.

Phayre, A.P., Äccount of Arakan," *JASB*, Vol. X Part II, 1941.

Pru, U. Tha Tun. "The Minbya Chin Hills of the Akyab District," *JBRS*, Vol. 24, Part 3, 1934.

Qanungo, Sunili Bhushan, Chittagong During the Afghan Rule (1538-1580). *JASB*. Vol. XXI, No. 2. August 1976.

R.C.T. "PIR BADAR IN BURMA" *Journal of the royal Asiatic Society*, London. January, 1894.

Rahman, Dr. Fazlur. 'What is Islamic Culture'. *Islamic Culture: A Few Angles*, Karachi: Umma Publishing House, 1964.

Rashid, K.A., "The First Mslim Invasion of the North West Frontier of the Indo-Pakistan Sub- Continent 44 A. H. 664-5 A.D.," *JASP*. Vol. VIII, No. 2, December 1963.

Rashid, M. Harunur. Indian Influence on the Development of Double-centry Accounting. *JASB*, Vol. 37. No. 1 June 1992.

Robinson, M. and L.A. Shaw, "The Coins and Banknotes of Burma".

Sarkar, J.N. "The Ferenghi Pirates of Chatgaon," *JASB*, vol. iii, 1907.

Serajuddin. A.M., "The Revenue Accounts of Chittagong in the A'IN-I-AKBARI" *JASB*. Vol. XVI., No. 3, Dec. 1971.

Serajuddin. A.M.. The Zamindarias of Chittagong in the late Eighleenth Century: A Study in Contrast. *JASP*, Vol. XV, No. 3. Dec. 1970.

Serajuddin. Alamgir M., "Muslim Influence in Arakan and the Muslim Names of Arakanese Kings : A Reassessment," *JASB*, Vol. XXXI(I), June 1986.

Stenbarg, David I., "Constetutional and Political Bases of Minority Insurrection in Burma." *Armd Separatisisum in South Asia*. Singapor: Institute of South East Asian Studies, 1984.

Stuart, J., "An Appeal for more light on Arakane History," *JBRS*. Vol. VIII. Part. 1, 1923.

Stuart, J., "Political History of the Extraordinary Events Which led to the Burmese war." *JBRS*, Vol. XI. Part. III, 1921.

Temple, Richard C.. "Buddermokam," *JBRS*. Vol. 15. Part 1. 1925.

Tha, Taher Ba. "Salver Raids in Bangal or Heins in Arakan," *The Guardian Manthly*. Rangoon vol. vii. October 1960.

Tun, Than, "Social Life in Burma A.D.1044-1287," *JBRS,* Vol. 41, Part 1& 2, December 1958.

U, Khin Khin, "Marriage in the Burmese Muslim Community, *JBRS,* XXXVI, December. 1854.

U, San Baw, "My Rambles : Among the Ruins of the Golden City of Mrauk-U," *JBRS,* Vol. 11, Part 3,1921.

U, San Baw, "My Rambles : Among the Ruins of the Golden City of Mrauk-U," *JBRS,* Vol. 13, Part 2,1923.

U, San Baw, "My Rambles : Among the Ruins of the Golden City of Mrauk-U," *JBRS,* Vol. 16, Part 1,1926.

Waheed, Sufi A. M. "Arakan Was free Muslin State Till Bfitish Occupation," *Annual Magazine 1995-96 Arakan Historical Society, Chittagong.*

Win, Pe lu U, "Some Aspects of Burmese Culture," *JBRS,* Vol. 41, Part 1 & 2, 1958.

Wise, James, "The Feringhees of Chittagong," *The Calcutta Review,* No. CV, July 1871.

Yusuf, Mohammad, "The Plight of the Rohingyas: A living Human Tragedy in Arakan," *Arakan*-Official Mouthpiece of ARIF, vol. 5, Issue 7, 31 July 1992.

বাংলা ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাবলী

অমৃতলাল বালা, *পদ্মাবতী সমীক্ষা,* রাজশাহী : হামিদা বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৭।

__________, *আলাওলের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

__________, *দৌলত কাজী: কবি ও কাব্য,* ঢাকা : প্রতীতি প্রকাশন, ২০০১।

অতীন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, *চর্যাপদ,* কোলকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৯৯৫।

অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* প্রথম খণ্ড, কলিকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৮২।

আকরাম ফারুক অনূদিত, *সীরাতে ইবনে হিশাম,* ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৮।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদিত *সহীহ আল বুখারী* ১ম খণ্ড, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২।

আশা দাশ, *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি,* কলিকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৯।

আবুল কাশেম চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের সামাজিক নকশা পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা,* ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০১।

আবুল আহসান চৌধুরী, (সম্পাদিত) আবদুল করিম সহিত্য বিশারদ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

আনিসুজ্জামান, *বাঙালী নারী সাহিত্যে ও সমাজে,* ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।

আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়ন,* ঢাকা : নলেজ হোম, ১৩৭৬।

আবুল কাসেম ভূঞা, *পুঁথি সাহিত্যে মহানবী (সাঃ),* ঢাকা : তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৯২।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত এবং আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *পুঁথি পরিচিতি,* ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

আবদুল হক চৌধুরী, *প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

__________, *চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ,* চট্টগ্রাম : সায়েমা আখতার চৌধুরী, ১৯৮২।

__________, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

আবদুল করিম, *মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি আলাওল,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৫।

__________, *রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য,* আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারক বক্তৃতা চট্টগ্রাম বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪।

__________, *বাংলা সাহিত্যের কালক্রম,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

__________, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

__________, *আবদুল হক চৌধুরী ও তার গবেষণাকর্ম,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

__________, *চট্টগ্রামে ইসলাম,* চট্টগ্রাম : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

__________, *রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য,* চট্টগ্রাম : বাংলা সাহিত্য সমিতি, ১৯৯৪।

__________, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জীবন ও কর্ম,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

__________, *চট্টগ্রামে ইসলাম,* চট্টগ্রাম : ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৮০।

__________, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৮৪ বাং।

__________, *বাংলার ইতিহাস মোগল আমল* (প্রথম খণ্ড) রাজশাহী : ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২।

আল্লামা ইমাম নববী রহ., *রিয়াদুস সালেহীন,* দ্বিতীয় খণ্ড, মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম অনূদিত ঢাকা : ইসলামিয়া কুরআন মহল, ২০০১।

__________, *রিয়াদুস সালেহীন,* ৪র্থ খণ্ড, মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম অনূদিত ঢাকা : ইসলামিয়া কুরআন মহল, ২০০১।

আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন, ২০০৩।

__________, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ২য় খণ্ড,* ঢাকা : বর্ণ মিছিল, ১৯৭৮।

__________, *বাংলার সূফী সাহিত্য,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।

__________, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ,* ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৭।

__________, *সৈয়দ সুলতান, তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৩৭৯ বাং। .

এ কে এম মহিউদ্দিন, *চট্টগ্রামে ইসলাম,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬।

এম এ রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

এন.এম. হাবিব উল্লাহ, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস,* ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৫।

ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস,* চট্টগ্রাম ঃ বইঘর, ১৩৯৬।

__________, *চট্টগ্রামের ইতিহাস,* চট্টগ্রাম ঃ বইঘর, ১৯৮৯।

__________, *চট্টগ্রামের ইতিহাস ঃ প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল,* চট্টগ্রাম ঃ আলমবাগ প্রকাশনী, ১৯৮২।

ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান,* ঢাকা : খান বাদার্স, ১৯৭০।

ওয়ালিদ আল আজামী, *মু'জিজাতে সরওয়ারে আলম,* [বিশ্বনবীর মোজেজা, আবদুল কাদির অনূদিত] ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২।

কাজী দীন মুহম্মদ, *পাকিস্তানী সংস্কৃতি,* ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৬৯।

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ,* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সুফি সাধক,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩।

গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ -উস- সালাতীন* [আকবর উদ্দীন অনূদিত], ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা,* প্রথম খণ্ড কলিকাতাঃ এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., ১৩৭০।

জহর সেন, *দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস,* কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৬।

তারাচাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব,* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

তামোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, *প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস,* কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।

দৌলত কাজী, *সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী,* মাযহারুল ইসলাম ও মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯।

দৌলত উজির বাহরাম খান, *লায়লী মজনু,* আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫।

দেওয়ান আবদুল হামিদ, *মুসলিম বাংলা সাহিত্যে জাতীয় চেতনা,* ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৭০।

দেবনাথ বন্দোপাধ্যায়, *রাজসভার কবি ও কাব্য,* কলিকাতা : পুস্তক বিপনী, ১৯৮৬।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *পদ্মাবতী,* কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫।

দেবেন্দ্র কুমার ঘোষ, *প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস,* কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., ১৯৭৫।

দীনেশ চন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* কলিকাতাঃ সান্যাল এন্ড কোম্পানী, ১৯৫১।

দিলওয়ার হোসেন, *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ,* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

নলিনীকান্ত ভট্টাশালী, *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম,* মোঃ রেজাউল করিম অনূদিত, ঢাকা : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার পর বেঙ্গল স্টাডিজ, ১৯৯৯।

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, *চট্টগ্রামের বৌদ্ধজাতির ইতিহাস,* চট্টগ্রাম ঃ কুসুম কুমার বড়ুয়া, ১৯৮৬।

____________, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলিকাতা* : মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৩৭৮ বাং।

বিনয় ঘোষ, *রাজশাহী আমল,* কলিকাতাঃ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

বড় চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,* অমিত্র সুদন সম্পাদিত, কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯।

ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* কলিকাতা : ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি., ১৩৭৭।

মাহবুব-উল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল,* চট্টগ্রাম ঃ নয়া লোক প্রকাশনী, ১৯৬৫।

____________, *চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল,* চট্টগ্রাম ঃ নয়া লোক প্রকাশনী, ১৯৬৫।

মাইমুল আহসান খান, *মানবাধিকার ও রোহিঙ্গা শরণার্থী* : বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে, ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৮।

মাহফুজুর রহমান, রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।

মুহম্মদ আবদুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য,* ঢাকা ঃ ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৩৭২।

মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, (সম্পাদিত) *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী* ১ম খণ্ড, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

মমতাজুর রহমান তরফদার, *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী হিন্দী পটভূমি,* ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতির কথা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮০।

মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ সম্পাদিত ছিদ্দিকী, *আরাকানের মুসলমান: ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* চট্টগ্রাম: আরাকান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ২০০০।

মনসুর মুসা সম্পাদিত, মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯০।

____________, মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

____________, মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

____________মুসা আনসারী, *ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মুহাম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, *আরাকান রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য,* মুহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

মুহাম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম,* মহাম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, *ইসলাম ও ভারতবর্ষ,* ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৬৯।

মফিজুল্লাহ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, "ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মুসলমান" *মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড,* ঢাকা : রেনেসাঁর্স প্রিন্টার্স, ১৯৬৩।

মযহার উদ্দীন সিদ্দিকী, *ইসলাম আওর মাযাহিবে আলম,* [মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী অনূদিত, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম] ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার,* ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০।

মুহাম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, *বাংলাদেশের গবেষণা পত্রিকা* (১৩৬৪-১৩৯৪), ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

মুহাম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজ,* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬।

রতন লাল চক্রবর্ত্তী, *বাংলাদেশ - বার্মা সম্পর্ক ১৭৮৫-১৮২৪,* ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৮০।

শ্রীমন্ত কুমার জানা, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* কলিকাতা ঃ ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ঢাবি।

শেখ হবিবুর রহমান, *মালবারে ইসলাম প্রচার,* কলিকাতা : আলমগীরি লাইব্রেরী, ১৩২৫।

সৈয়দ সুলতান, *রসুল চরিত,* ২য় খণ্ড, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

সৈয়দ এমদান আলী, *মুসলিম বাংলার আত্মকথা,* ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ১৯৬৯।

সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*, কলিকাতাঃ জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, ১৯৭৪।
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, *তাফহিমুল কুরআন*, ১৯ খণ্ড ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩।
সাকলায়েন, গোলাম, *বাংলাদেশের সুফী-সাধক*, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ ১৩৮৭ বাং,
____________, *মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৭৬।
সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা : ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৫।
সুকুমার সেন, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৮০।
সুকুমার সেন, *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস*, কলিকাতা : ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
সুবোধ চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি ও মধ্যযুগ)*, কলিকাতা ঃ পাবলিশিং সিন্ডিকেট, ঢাবি।
হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *ইসলামে পোষাক প্রাথমিক সূত্র ও শর্তসমূহ*, ঢাকাঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০৩।
হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭।
হরেকৃষ্ণ মুখোপধ্যায়, *গৌড় বঙ্গ সংস্কৃতি*, কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৩৫২।
শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের বিকাশধারা*, কলিকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৬৭।

বাংলা ভাষায় প্রণীত প্রবন্ধসমূহ

অমৃতলাল বালা, 'কবি দৌলত কাজীর সুফী ভাবনা' *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৯৯।
____________, 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী কাব্যের শিল্পরূপ,' *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একচল্লিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৪।
____________, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সংস্কৃতি" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ ১৩৯৭।
____________, "সতী ময়না লোর-চন্দ্রানী কাব্যে লোক-ঐতিহ্য" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবন-আশ্বিন ১৪০২।
আখতারুজ্জামান, "আরাকানী রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উৎস ও ক্রমবিকাশ : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা (১২০৪-১৭৮৫ খৃঃ)", *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, পঞ্চবিংশ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৯৮ সংখ্যা।
আলাওল, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, "রাগতালনামা ও পদাবলী" *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, গ্রীষ্ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০।
আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমউদ্দীন, "পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস" *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২।
আলী আহমদ, "আরাকানে মুসলিম জনগোষ্ঠী", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র ১৪০১।
ওয়াকিল আহমদ, "আলাওলের আত্মকথাঃ দেশ ও কাল" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্থ খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৮৬।
আবুল বাশার আলা, "আলাওলের রোসাঙ্গে যাত্রা" *মাসিক মোহাম্মদী*, ৬৭শ বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩৭৬।
আবদুল করিম, "বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ" *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষা সংখ্যা ১৩৭০।
____________, "ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে মুসলমান সমাজ বিস্তার" *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১।

__________, মোহাম্মদ, "খানের বংশ লতিকায় ইতিহাসের উপাদান" *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষা সংখ্যা ১৩৭১।
আবদুল করিম, "রোহিঙ্গাদের হাজার বছরের ইতিহাস", ঢাকা, *পাক্ষিক পালাবদল*, ১ম বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১৯৯২।

আবদুল মাবুদ খান, "চট্টগ্রাম জেলায় আরাকানী বসতির ইতিহাস ও প্রসঙ্গ কথা", *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৫শ-২০ বর্ষ সম্মিলিত সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮৮-চৈত্র ১৩৯৩।
__________, "আরাকানের মুক্তি সংগ্রাম ও তার উৎস", *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮৬।
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, " আলাওলের আত্মকাহিনী," *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৭।
__________, " আলাওলের আত্মকাহিনী," *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৭।
__________, " আলাওলের আত্মকাহিনী," *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ.........।
__________, " আলাওলের আত্মকাহিনী," *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৮।
আবদুল কাদের, "ইউরোপীয় কাব্যে মুসলিম প্রভাব" *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৮।
__________, "সিসিলিতে মোসলেম প্রভাব, *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৭।
__________, "ইউরোপীয় সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব", *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭।
আব্দুল কাদির, "আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯০।
__________, "পদ্মাবতী" *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩।
আবদুল মোমিন চৌধুরী, "বাংলায় ইসলাম-বিস্তারের পটভূমি" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্থ খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৮৬।
আবদুল হক চৌধুরী, "কবি আলাওল ও কন্যা সাহাব বিবিঃ চট্টগ্রামে প্রচলিত জনশ্রুতি বিচার" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০০।
আহমেদ আলী, "চট্টগ্রামের সমাজ জীবনে আরাকানী সংস্কৃতির প্রভাব" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক- পৌষ ১৩৯৯।
আবদুল করিম 'ইতিহাস' *কক্সবাজারের ইতিহাস*, কক্সবাজার : কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, ১৯৯০।
আহমদ আবদুল কাদের, "বাঙ্গালী সংস্কৃতির মূলধারা" খন্দকার আব্দুল মোমেন সম্পাদিত, *প্রেক্ষণ*, প্রেক্ষণ সাহিত্য সংগঠন, ঢাকা, ঈদ সংখ্যা, ১৯৯৭।
আহমদ শরীফ, "চট্টগ্রামের ইতিকথা (আদিযুগ)," *ইতিহাস*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪।

____________, বাংলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান," *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি,* অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কোলকাতা : কে. পি. বাগচী আণ্ড কোং, ১৯৯১।

____________, "দোনাগাজী বিরচিত সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল," *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা,* বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭।

____________, "কবি দৌলত কাজি ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য" *সাহিত্য পত্রিকা,* শীত সংখ্যা ১৩৬৯।

____________, "সতেরো শতকের রোসাঙ্গে বাঙলা সহিত্য" *সাহিত্য পত্রিকা,* বর্ষা সংখ্যা ১৩৯০।

____________, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা" *মাসিক মোহাম্মদী,* ১০ম সংখ্যা, শ্রাবন ১৩৫৮।

____________, "চন্দ্রাবতী" (কোরেশী মাগন বিরচিত উপাখ্যান) *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা,* নবম বর্ষ-প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭২।

____________,"আলাওল" *মুসলিম সাহিত্য সেবক,* জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, পূর্ব পাকিস্তান, তাঃ বিঃ।

____________, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা" *মাসিক মোহাম্মদী,* ২২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৫৮।

এস.এন. রায়, "ভারত বর্ষ ও ইসলাম" ইফাকা, তেইশ বর্ষঃ চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৮৪।

ওসমান গণি মনসুর, "আরাকানে স্বাধীনতার লড়াই; *নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট,* ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ১৯৯১, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ, "আলাওলের আত্মকথাঃ দেশ ও কাল" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* পৌষ ১৩৯২।

আনম রইচ উদ্দিন, "বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব" *ইফাপ,* সাতাশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৭।

কাজী দীন মুহাম্মদ, "পদ্মাবতী কাব্যে আলাওল" *সাহিত্য পত্রিকা,* বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫।

ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, "সিকান্দার নামা" *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা,* কার্তিক-পৌষ ১৩৭০।

মাহবুব-উল আলম, "প্রাচীন ফতেয়াবাদ রাজ্য" *মাসিক মোহাম্মদী,* ৬৭শ বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৬।

মাহফুজুর রহমান, "রংপুরের সুবীর নগরে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরঃ প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা,* বিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০০২।

মুফাখ্খারুল ইসলাম, "বাংলার সাহিত্যে মুসলমানী মেজাজ" *মাসিক মোহাম্মদী,* ৬শ বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩৭৬, পৃঃ ৪৫৩-৪৬১।

____________, " উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব" *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা,* তেইশ বর্ষঃ চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, "বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ" *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা,* ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, শীত-কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫।

____________, "দৌলত কাজী" *মুসলিম সহিত্য সেবক,* জাতীয় পুনগঠন সংস্থা, পূর্ব পাকিস্তান, তাঃ বিঃ।

মুহম্মদ মজির উদ্দীন, "মুহম্মদ এনামুল হকের গবেষণা" *সাহিত্য পত্রিকা,* মুহম্মদ মুনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ষড়বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বর্ষ, ১৩৯০।

মুহম্মদ সিদ্দিক খান, "ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মুসলমান" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৬৮।

মুহম্মদ সিদ্দিক খান, "শাহসুজার জীবন সন্ধ্যা (১৬৬০-১৬৬১)" *সাহিত্য পত্রিকা*, শীত সংখ্যা ১৩৭৪।

মুহিউদ্দীন খান, "বাংলাদেশে ইসলামঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র" *মাসিক মদীনা*, ২৭ বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৯৮।

মুহিউদ্দীন খান, "বাংলাদেশে ইসলামঃ কয়েকটি তথ্য সূত্র," *ইফাকা*, এপ্রিল-জুন ১৯৮৮।

সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ, "বঙ্গের প্রাচীন মুসলমান কবি দৌলত কাজী" *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫২, পৃঃ ২৩৩-২৩৪।

রমা বসু, "চর্যাপদে বাংলার সমাজ" সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪।

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, "বর্মীভাষা ও সাহিত্যে পাক-ভারতীয় প্রভাব," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৬।

মনোয়ার হোসেন, "পদ্মাবতী কাব্যের সম্পাদনা" *সাহিত্য পত্রিকা*, একত্রিত বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

মুহম্মদ এনামুল হক, "ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান" *মাসিক মোহাম্মদী*, উনবিংশ বর্ষ; সপ্তম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৩।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, "আলাওলের পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সংস্করণ" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, দ্বিতীয় বর্ষ-দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫।

মনসুর মুসা, "চট্টগ্রামের উপভাষাঃ একটি পর্যালোচনা" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, জুন ১৯৮১।

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, "চীনে মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত" ইফাকা, তেইশ বর্ষঃ চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৮৪।

মুহম্মদ আবদুল জলিল, "বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ঃ মোগল আমল," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ- পৌষ, ১৩৮৫।

__________, "বাংলা সাহিত্যে লোকাচারঃ মোগল আমল", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৫৮।

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন, "মুহম্মদ এনামুল হকের গবেষণা" *সাহিত্য পত্রিকা*, ষড়বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বর্ষা ১৩৯০।

মুস্তাফা মজিদ, "পটুয়াখালীর রাখাইন সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়" *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, প্রথম খণ্ড, নবম বর্ষ, জুন ১৯৯১।

__________, "পটুয়াখালীর রাখাইন সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত" *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৭।

রাজিয়া সুলতানা, "প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে বাঙ্গালী নারী, *সাহিত্য পত্রিকা*, সপ্তবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, বর্ষা ১৩৯১।

শামসুল আলম সাঈদ, "আলাওল ও বাংলা সহিত্যে চট্টগ্রাম ঘরানা," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯৯।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল, "বাঙ্গালীর ধর্মীয় স্থাপত্য চর্চা (পঞ্চদশ-সপ্তদশ) মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি" অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলিকাতাঃ কেপি বাগচী, অ্যান্ড কোং ১৯৯২)।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, "ইংরাজী সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব" *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫২।

সৈয়দ আলী আহসান, " আলাওল ও জায়সী" *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ষষ্ঠ বর্ষঃ প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯।

___________, "পদ্মাবতীর পাঠ বিশ্লেষণ (ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর অনুসরণে)" *মাসিক মোহাম্মদী*, ৬৭শ বর্ষঃ ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭৬।

___________, "জায়সী ও আলাওল", (পদ্মাবতী-রত্নাসেন ভেট খণ্ড) *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষা সংখ্যা ১৩৭০।

___________, "জায়সী ও আলাওল", (সিংহল দ্বীপ বর্ণনা খণ্ডের তুলনা) *সাহিত্য পত্রিকা*, ষষ্ঠ বর্ষঃ দ্বিতীয় সংখ্যা, শীত ১৩৬৯।

___________, "জায়সী ও আলাওল" (স্তুতি খণ্ডের তুলনা), *সাহিত্য পত্রিকা*, ষষ্ঠ বর্ষঃ প্রথম সংখ্যা, বর্ষা ১৩৬৯।

সৈয়দ মুর্তজা আলী, "আলাওলের তোহফা" *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮।

সুনীতি ভূষণ কানুনগো, "চট্টগ্রামে মঘ শাসন" *ইতিহাস পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৪।

সামিউল আহমদ খান, "রোহিঙ্গা মুসলমান" *ইসলামিক ফাইন্ডেশন পত্রিকা*, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, তেইশ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, "দৌলত কাজীর সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী" *সাহিত্য প্রকাশিকা*, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, শান্তি নিকেতন, ১৩৬২।

সত্যবতী গিরি, "মধ্যযুগে বাংলার ভাষা ও সাহিত্য" *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলিকাতাঃ কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯২)।

সুলতান আহমদ ভূঁইয়া, "চৌগান খেলার ইতিহাস ও পদ্মাবতী কাব্য" *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৭।

সুলতান আহমদ ভূঁইয়া, "শাহসুজার জীবন নাট্যের শেষ অংক" *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ ১৩৭১।

উর্দু ভাষায় প্রণীত গ্রন্থসমূহ

আবু আবদুল্লাহ হাকিম, (*المستدرك للحكيم*) *মুস্তাদরাক-ই-হাকিম*, ১ম খণ্ড, দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ : প্র.বি, তা.বি।

ইবনে আবদুর রাব্বী আল আন্দালছী, (*العقد الفريد*) *আল ইকদুল ফরিদ*, ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ,কায়রো : প্র.বি., ১৯৬৯।

কাজী রশিদ বিন জুবাইর, (*كتاب الذخاءر والتحف*) *কিতাবুস যাখায়ের ওয়াত তুহুফ*, কুয়েত : প্র.বি., ১৯৫৯।

কাজী আতাহার মুবারকপুরী, (*عرب و هندعهد رسالت مي*) *আরব ওয়া হিন্দ আহদে রিসালাত মে*, দিল্লীঃ নদওয়াতুল মুসান্নেফিন (তাঃ বিঃ)।

___________, (*اسلامي هند كي عظمت رفته*) *ইসলামী হিন্দ কি আজমত রফতা*, দিল্লীঃ নদওয়াতুল মুসান্নেফিন (তাঃ বিঃ)।

খালিদ সাইফুল্লাহ, (*تذكرهء شهداء جهاد اراكان*) *তাযকিরায়ে শুহাদায়ে জিহাদে আরকান*, কারাচীঃ ইত্তেহাদ পাবলিকেশন্স ইন্টারন্যাশনাল ১৯৯৭।

নুর মুহাম্মদ মানসুরী, (*كونسي وادي مي هي كونسي منزل مي هي عشق بلاخيز كا قافلهء سخت جان*) *কোন সি ওয়াদি মে হ্যায়, কোন সি মনজিল মে হ্যায়ঃ এশ্‌কে বালাখিজ কা কাফেলায়ে সখত যা*, করাচীঃ ইত্তেহাদ পাবলিকেশন্স ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৯৭।

মুহাম্মদ আমিন নদভি, (تاریخ ارکان کا ایك کمشده باب) *তারিখে আরকান কা এক গামছুদা বাব*, আরাকানঃ আরাকান হিস্ট্রি কনফারেন্স, ১৯৮৬।

মুহাম্মদ তাহের জামাল নদভি, (سرزمین ارکان کی تحریك ازادی تار یخی بس منظر می) *সারজমিন আরকান কি তাহরীকে আজাদী: তারিখি পাঁচ মানজার মে*, চট্টগ্রামঃ আরাকান হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি, ৯।

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, (کربلاء ارکان) *কারবালা-ই-আরকান*, ফটোকপি, বিশেষ সংগ্রহ, আরাকান হিস্ট্রিক্যাল সোসাইটি লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম।

____________, (تاریخ اسلام برما وارکان) *তারিখ-ই-ইসলাম: বার্মা ওয়া আরকান*, কালকাতাঃ দি ষ্টার আর্ট প্রেস, ১৯৮৬।

সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভি, (هندوستان عربون کی نظر می) *হিন্দুস্থান আরাবিঁউ কা নজর মে*, আজামগড়ঃ দারুল মুসান্নেফিন, (তা:বি:)।

আরাকানী মুসলমানদের প্রকাশনাসমূহ

A Memorandum at to his excellency General Mohammad Zia-ul-Haq| President of the Islamic Republic of Pakistan, by RPF Arakan, Burma, 7-8 December 1985.

An Ardent Appeal of the Rohingya Patriotic Front, Placed Before the 14th Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers at Dhaka, Bangladesh, 1st October 1983, RPF Arakan, Burma.

ARAKAN, News Letter of the ARIF, Arakan, Burma.

INSAF (Urdu Version) International Organ of RSO, Arakan, Burma.

INSAF, (English Version) Rohingya's Voice and Vision, Quarterly Mouthpiece of RSO (Arakan : RSO, 1992).

Islam, Narul. *The Rohingya Muslims of Arakan: Their Past and Present Political Problems*, papers of lectures, The South International Conference of World Assembly of Muslim Youth, 22-27 January, 1986.

Manifesto of ARIF, (Arakan: Committee on Press and Information, 1992)

Manifesto of ARIF, Arakan, Burma.

Manifesto of ARNO, (Arakan: ARNO, 1998).

Manifesto of the RPF (Arakan: International of Publicity Dept, APF, 1978).

Memorandum to the 18th Islamic Conference of Foreign Ministers in Riyadh, from ARIF, Arakan, Burma, 13 March, 1989.

News Letter (Bangali Version) RSO, Arakan, Burma.

Roshigyas Outcry and Demands, RPF, Arakan, Burma, 1976.

The Call of Rohimegya : Quarterly Magazine of the RPF, Rohang (Arakan), Burma.

The News Letter (English version) RSO, Arakan, Burma.

The Rohingya Problem (Arakan: ARNO, 1999).

Genocide in Burma Against The Muslim of Arakan, published by Rohingya Patriotic Front, Arakan, Burma.

Documentation, *Warld Press On Rohingya Muslim Refugees in Bangladesh,* 1978-79, compiled by N. Kama, Chittagong.

মুহাম্মদ ইউনুছ, *অধিকৃত আরাকান জনগণ দেশ ও ইতিহাস,* আরাকান ঃ আরএসও, ১৯৯০।

____________, *আরাকানের স্বাধীন ঐতিহ্য ও রোহিংগা মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রাম,* আরাকান ঃ আরএসও, ১৯৮৯।

রোহিঙ্গার আর্তনাদ, আরএসও' এর মাসিক পরিক্রমা, আরএসও, আরাকান।

আরাকান সংবাদ, *নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের মাসিক মুখপাত্র,* আরাকান : রোহিঙ্গা প্রতিষ্ঠান আরাকান।

মাহফুজুর রহমান আখন্দ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক। ১৯৭২ সালের ২৮ ডিসেম্বর গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পিতার নাম মোজাফফর রহমান আখন্দ এবং মাতার নাম মর্জিনা বেগম। নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করে স্থানীয় বোনারপাড়া মাদরাসায় ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া। অতঃপর বগুড়ার সারিয়াকান্দী এবং বগুড়া শহরে অধ্যয়ন করেছেন দীর্ঘসময়। তিনি ১৯৯৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট হয়ে এম. এ করেছেন ও একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০০ সালে 'রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী, ১৯৭৮-১৯৯৪' শিরোনামে এম.ফিল এবং ২০০5 সালে 'আরাকানে ইসলাম : প্রসার ও প্রভাব, ১৪৩০-১৭৮৫' শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ইতোমধ্যে তাঁর তত্ত্বাবধানেও পাঁচজন ফেলো এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেছেন ও পাঁচজন ফেলো গবেষণারত আছেন। আরাকান ও রোহিঙ্গা বিষয়ে তাঁর বিশটির অধিক গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক দুই শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা এবং অনলাইন ম্যাগাজিনসহ সাহিত্যের ছোট কাগজে ছাপা হয়েছে।

বাকি অংশ শেষের ফ্ল্যাপে

পেশাগতভাবে ইতিহাস নিয়ে কাজ করলেও ড. আখন্দ ছড়াকার, কবি, গীতিকার, গবেষক এবং সাহিত্য সমালোচক হিসেবে ইতোমধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। অনেকগুলো স্মরণীয় ছড়া-কবিতা ও গানের রচয়িতা তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা– ছড়াগ্রন্থ পাঁচটি, ধনচে ফুলের নাও, মামদো ভূতের ছাও, স্বপ্নফুলে আগুন, ছড়ামাইট (যৌথ), পদ্মাপাড়ের ছড়া (যৌথ); অনুকাব্য- তোমার চোখে হরিণমায়া, লিমেরিক- গুমর হলো ফাঁস, শিশুতোষ গল্প- জ্বীনের বাড়ি ভূতের হাড়ি, গানের বই- হৃদয় বাঁশির সুর, গবেষণাগ্রন্থ- রোহিঙ্গা সমস্যা : বাংলাদেশের দৃষ্টিভংগী প্রভৃতি। সমন্বয়, বিজয়ের ছড়া ও আল ইশরাক নামে সাহিত্যের ছোটকাগজ সম্পাদনা করেছেন ইতোপূর্বে। বর্তমানে তিনি শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ছোটকাগজ 'মোহনা' সম্পাদনা করছেন।

তিনি বাংলা একাডেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর সদস্য; বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ এর জীবন সদস্য এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লেখক ফোরাম এর সভাপতি। ইতোপূর্বে তিনি বগুড়ার সমন্বয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ঢাকা সাহিত্য শতদল এর পরিচালক এবং বাংলাদেশ সংস্কৃতিকেন্দ্রের সহকারী সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা শব্দশীলন একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ২০১০, বগুড়া সৃষ্টিশীল লেখকসংঘ সাহিত্য পুরস্কার ২০১১, খুলনা রংধনু সাহিত্য পুরস্কার ২০১১, বগুড়া সংস্কৃতিকেন্দ্র এ্যাওয়ার্ড ২০১২ এবং ২০১২ সালে নজরুল সাহিত্য পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের পিতা।

যোগাযোগ
২২৯, শহীদুল্লাহ্ কলা ভবন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
মোবাইল: ০১৭১৬ ২৪৫০০২
mrakhanda@gmail.com

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা